মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী

অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

আমার জ্যেষ্ঠ পিতামহ
প্রসন্ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
—যাঁর স্নেহসুধারসে আমার
বাল্য ও কৈশোর সঞ্জীবিত হয়েছে-
তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

লেখকের নিবেদন

এই বইটি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য লিখিত, পণ্ডিতদের জন্য নয়। তাই পাদটীকা এবং গ্রন্থপঞ্জীতে বইটি ভারাক্রান্ত করা হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী লেখকদের মত আলোচনা প্রসঙ্গে পাদটীকা দেওয়া হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কোথায় পাওয়া যাবে তার নির্দেশ পাদটীকায় দেওয়া হয়েছে। সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে বেশি কিছু জানতে আগ্রহী না হলে এ সকল পাদটীকা বাদ দিতে পারেন।

'মধ্য যুগ' কথাটি আমি একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি। সাধারণতঃ বখ্‌তিয়ার খলজীর আক্রমণ থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সময়কে 'মধ্য যুগ' বলে মনে করা হয়। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধে নবাবী আমলের পরিসমাপ্তিঘটেনি; মীর জাফর দুর্বল এবং অকর্মণ্য হলেও মীর কাশিম সক্রিয় এং উচ্চাভিলাষী নবাব ছিলেন। মীর কাশিমের পতনের পরেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগল শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই নতুন শাসন-ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করেছিল। লর্ড কর্নওয়ালিস যখন নিজামতের ব্যাপারে নবাবের নাম ব্যবহারের প্রচলিত রীতি বাতিল করলেন তখনই নবাবী আমল শেষ হল। কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী কালে বাংলার যে সব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি নবাবী শাসনকালের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই আমি মধ্য যুগের ইতিহাস লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় পর্যন্ত টেনে এনেছি। রামমোহন রায়ের মতে, তিনি এশীয় (Asiatic) শাসন-ব্যবস্থা ত্যাগ করে ইউরোপীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। শাসন-ব্যবস্থার এই পরিবর্তনে মধ্য যুগের অবসান সূচিত হল।

ত্রয়োদশ শতকের সূচনা থেকে অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তি—এই সুদীর্ঘ কালের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচনা করার চেষ্টা আমি করি নি। ২৫০ পৃষ্ঠার সংকীর্ণ পরিসরে সেটা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে আমি সেকালের বাংলার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি। তার মধ্যে এমন কিছু বিষয় আছে যা' সাধারণতঃ ইতিহাসের বইতে আলোচিত হয় না। আমার বিষয় নির্বাচন অবশ্যই ত্রুটিহীন নয়; কিন্তু সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা মোটামুটি সন্তুষ্ট হবেন এবং মধ্য যুগের বাংলা সম্বন্ধে আরও জানবার জন্য আগ্রহী হবেন, এমন আশা আমার আছে।

ঘটনার প্রকৃতি এবং ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রীদের চরিত্র বিশ্লেষণে ও বিচারে

অতীতের রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা ঐতিহাসিকের অপরিহার্য কর্তব্য। প্রত্যেক মানুষকে তার কালের মানদণ্ডে যাচাই করতে হবে, পরবর্তী কালের মানদণ্ড ব্যবহার করা চলবে না। ধর্মীয় গোঁড়ামি, রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং সামন্ততান্ত্রিক অবিচার ও অত্যাচার মধ্য যুগে ছিল, এখনও আছে। সাম্প্রতিক কালের কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনে অতীতের ইতিহাসকে নতুন রঙে সাজানো ঐতিহাসিকের পক্ষে অপরাধ। সে কালের মানুষ যে সব অন্যায় ও ভুল করেছে সেগুলি চাপা দেবার চেষ্টা না করে সেগুলি থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায় তাই বিচার করা উচিত।

বাংলা ভাষায় লেখা ইতিহাসের বইর সংখ্যা নগণ্য। ইতিহাস-লেখকের ভাষা সাহিত্যরসসিক্ত হলে তার রচনা সাহিত্যের সিংহাসনে স্থান লাভ করে। মমসেন জার্মান ভাষায় রোমের ইতিহাস রচনা করে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষায় গীবনের রচিত ইতিহাসের সাহিত্যিক মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। সাম্প্রতিক কালে ট্রেভেলিয়ন এবং ফিশার ইতিহাসের পাঠককে সাহিত্যের স্বাদ দিয়েছেন। ভাষার অলংকারে সুসজ্জিত না হলেও ইতিহাসের বই পরোক্ষভাবে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে, নতুন ক্ষেত্রে ভাবপ্রকাশের পথ খুলে দেয়। কেবলমাত্র কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, রম্য রচনা প্রভৃতি কোন ভাষাকে বর্তমান কালের বহুমুখী ভাব প্রকাশের পূর্ণাঙ্গ মাধ্যম রূপে বিকশিত করতে পারে না। আমার লেখায় সাহিত্যরসের কণামাত্রও নেই। আশা করি, ইতিহাসকে এবং বাংলা ভাষাকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সুপাঠ্য ইতিহাস রচনায় হাত দিয়ে বাঙালী পাঠককে তৃপ্তিলাভের সুযোগ দেবেন।

অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

১

সুলতানী আমল (১)

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হল। নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, নতুন ধর্ম, নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির পতাকা বহন করে বখ্‌তিয়ার খলজী বাংলার পুণ্যভূমি নবদ্বীপে প্রবেশ করলেন।

পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপন করতে তুর্কী আক্রমণকারীদের সময় লেগেছিল তিনশো বছর। গজনীর আমীর সবুক্তগীন (৯৭৭-৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) পাঞ্জাবের হিন্দু শাহী বংশের রাজা জয়পালকে পরাজিত করে পেশোয়ার পর্যন্ত নিজের অধিকার প্রসারিত করেন। তাঁর পুত্র সুলতান মামুদ (৯৯৯-১০৩০) পাঞ্জাব নিজের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর বংশধরেরা লাহোরে রাজধানী স্থাপন করে ১১৮৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। লাহোরের এই ইয়ামিনি বংশের সুলতানদের সেনাপতিরা বার বার উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজপুত রাজগণের প্রতিরোধে তাঁরা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তবে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ঐ অঞ্চলে নানা স্থানে কয়েকটি মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল।

হিন্দু রাজাদের মধ্যে ঐক্যের অভাবেই সুলতান মামুদ পাঞ্জাব বিজয়ে সাফল্য লাভ করেন এবং তাঁর দুর্বল বংশধরেরা দীর্ঘকাল ঐ প্রদেশে রাজত্ব করেন। 'একতা থাকিত যদি/পার হয়ে সিন্ধু নদী/আসিতে কি পারিত যবন?' রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে হিন্দু রাজারা পাঞ্জাবে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি; ইয়ামিনি সুলতানদের রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টাকে তাঁরা সাময়িক উপদ্রব রূপে গণ্য করেছেন, ভবিষ্যতে ঘোর বিপদের সংকেত রূপে বিবেচনা করে সতর্ক হন নি। বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু শাসকদের আনুকূল্যে বর্তমান উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের বিভিন্ন শহরে

'তাজিক' বা তুর্কীরা বসতিস্থাপন করে, মসজিদ নির্মাণ করে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়।

ইতিমধ্যে আফগানিস্তানের ঘুর অঞ্চলে একটি স্বাধীন তুর্কী রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই রাজ্যের যুগ্ম অধিপতি ছিলেন দুই ভাই: গিয়াসউদ্দীন (১১৬৩-১২০৩) এবং শিহাবউদ্দীন বা মৈজুদ্দীন (১১৭৩-১২০৬)। দুই ভাইর মধ্যে বিশেষ সমপ্রীতি ছিল। মৈজুদ্দীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোহাম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। তিনি ১১৮৬ সালে ইয়ামিনি বংশের শেষ সুলতানকে বন্দী করে লাহোর অধিকার করেন এবং ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন। ১২০৬ সালে আততায়ীদের দ্বারা তিনি নিহত হন। ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, সিন্ধুদেশের উত্তরাংশে, এবং রাজস্থান ও মালবের কোন কোন অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম প্রধান ক্রীতদাস ও সহযোগী কুতবউদ্দীন আইবক দিল্লীতে সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

* * *

১২০১ থেকে ১২০৪ সালের মধ্যে কোন সময়ে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজী 'নুদীয়া' (নবদ্বীপ) অধিকার করে বাংলায় মুসলমান রাজত্ব স্থাপনের সূচনা করেন। মোহাম্মদ ঘুরী এবং কুতবউদ্দীনের সামরিক সাফল্য ছাড়া বখ্‌তিয়ারের পক্ষে বাংলা আক্রমণ সম্ভব হত না, কিন্তু তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থন নিয়ে তিনি এই দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হন নি। এই অভিযানের পূর্বে বাংলার কোন অংশে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয় নি। বখ্‌তিয়ারের পূর্বে কয়েকজন সুফী সাধক বাংলায় এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন বলে নানারকম উপাখ্যান প্রচলিত আছে, কিন্তু এ বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। তবে বাংলার সঙ্গে (বিশেষতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলে) সমুদ্রপথে আরব বণিকদের যোগাযোগ হিন্দু রাজত্বকালেই স্থাপিত হয়েছিল।

বখ্‌তিয়ারের আদি নিবাস ছিল আফগানিস্তানের গরমসির অঞ্চলে। তিনি তুর্কীদের খলজী শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি উচ্চবংশীয় বা ধনী ছিলেন না। গজনীতে এবং দিল্লীতে সৈন্য বিভাগে চাকুরি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি পূর্বদিকে অগ্রসর হন। কিছুদিন বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বদায়ুনের তুর্কী শাসনকর্তার অধীনে চাকুরি করে তিনি অযোধ্যায় ('আওয়াধ') যান। সেখানকার তুর্কী শাসনকর্তা তাঁকে বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মির্জাপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে দুটি পরগণা জায়গীর দিলেন। এখানে তিনি মুসলমান ভাগ্যান্বেষী সৈনিকদের আশ্রয় দিয়ে তাদের সামরিক সহায়তায় ক্রমশঃ আঞ্চলিক হিন্দু শাসকদের শক্তি বিধ্বস্ত করেন। সম্ভবতঃ ১১৯৯-১২০০ সালে তিনি বর্তমান বিহার রাজ্যের দক্ষিণাংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। তারপর তিনি বিহার ও বাংলার সীমান্ত অঞ্চল ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে

অগ্রসর হয়ে অতর্কিতে নবদ্বীপে উপস্থিত হন। রাজা লক্ষ্মণ সেন এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তুর্কীরা প্রাসাদরক্ষীদের হত্যা করেছে, এই সংবাদ শুনে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি মধ্যাহ্ন ভোজে বসেছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি প্রাসাদের পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং নৌকায় উঠে পূর্ব বাংলায় বিক্রমপুরের দিকে যাত্রা করলেন।

এই ঘটনা থেকে লক্ষ্মণ সেনের কাপুরুষতা প্রমাণ হয় না। বখ্‌তিয়ার ১৭ বা ১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে বাংলা জয় করেন, এই গল্প সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি সামান্য কয়েকজন অশ্বারোহী নিয়ে প্রাসাদের দরজায় উপস্থিত হন। তাঁর মূল সৈন্যবাহিনী প্রায় একই সময়ে শহরে প্রবেশ করে লুণ্ঠনে ও হত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। নবদ্বীপ লক্ষ্মণ সেনের স্থায়ী রাজধানী বা সুরক্ষিত শহর ছিল না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরবর্তী এই পবিত্র স্থানে বাস করতেন। পুণ্যার্থীদের ভিড়ে এটি শহর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবতঃ এর চার দিকে বাঁশের তৈরী দেওয়াল ছিল। লক্ষ্মণ সেনের প্রকৃত রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে ; সেখান থেকেই তাঁর তাম্রশাসনগুলি জারি হয়েছিল। সম্ভবতঃ প্রাচীন শহর গৌড় সেন রাজাদের অন্যতম রাজধানী ছিল। লক্ষ্মণ সেনের নাম অনুসারে গৌড়ের নামকরণ হয় লক্ষ্মণাবতী। মুসলমান আমলে নামটির বিকৃত রূপ হল 'লখ্‌নৌতি'।

নবদ্বীপ অধিকারের পরে বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণ সেনের পশ্চাতে সৈন্যদল প্রেরণ করেন নি, কারণ নদীপ্লাবিত পূর্ব বাংলায় যুদ্ধ করা তুর্কী অশ্বারোহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাঢ় অঞ্চলে অধিকার স্থাপনের জন্যও তিনি চেষ্টা করেন নি। নবদ্বীপ থেকে তিনি উত্তর দিকে বরেন্দ্র অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন এবং লখ্‌নৌতি অধিকার করেন। কিছুদিন পরে তিনি আরও উত্তরে তিব্বত জয়ের জন্য এক দুঃসাহসিক অভিযানে সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হন। তাঁর সৈন্যদল নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিল, তিনি কয়েকজন অশ্বারোহী সহ রাজধানী দেবকোটে (আধুনিক দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুরে) পৌঁছলেন। অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয় (১২০৬)। সম্ভবতঃ তাঁর অনুচর আলী মর্দান খলজী (যিনি ১২১০ থেকে ১২১৩ সাল পর্যন্ত বাংলার তুর্কী রাজ্যের শাসক ছিলেন) তাঁকে হত্যা করেছিলেন।

বখ্‌তিয়ার 'বঙ্গবিজেতা' ছিলেন না, পশ্চিম এবং উত্তর বাংলার কিছু অংশ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল। সেকালের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁর রাজ্যকে লখ্‌নৌতি রাজ্য আখ্যা দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে তখন 'বাংলা' নামে ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক ভূখণ্ড স্বীকৃতি লাভ করে নি। ত্রয়োদশ শতকে দিল্লীর অধিবাসী ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ (যাঁর 'তবকাত-ই-নাসিরী' বইতে বখ্‌তিয়ার এবং তাঁর পরবর্তী লখ্‌নৌতির শাসকদের বিবরণ আছে) 'বাংলা' নামটি ব্যবহার করেন নি। তিনি তিনটি

অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন : বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গ। তাঁর মতে, গঙ্গা নদী বরেন্দ্র এবং রাঢ় অঞ্চলের সীমারেখা নির্দেশ করত। স্পষ্টই দেখা যায়, 'বঙ্গ' নামটি পূর্ব বাংলা সম্পর্কে ব্যবহৃত হত।

চতুর্দশ শতকে দিল্লীর অধিবাসী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী তাঁর 'তারিখ-ই-ফীরুজশাহী' বইতে 'বাংলা' নামটি ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনি লখ্নৌতি এবং বাংলাকে দুইটি পৃথক 'দিয়ার' রূপে উল্লেখ করেছেন। কিছু-কাল পরে দিল্লিবাসী ঐতিহাসিক শম্স্-ই-সিরাজ আফীফ তাঁর 'তারিখ-ই-ফীরুজ-শাহী' বইতে সুলতান শমসুউদ্দীন ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাংলা' আখ্যা দিয়াছেন। ইলিয়াস শাহ প্রায় সমগ্র বাংলার অধীশ্বর ছিলেন। সুতরাং আফীফের ব্যবহৃত 'বাংলা' নামটি সমগ্র বাংলা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পরে পর্তু-গীজেরা 'বাংলা' শব্দটি গ্রহণ করে এর পরিবর্তিত রূপ দিয়েছিল 'Bengala'—যার থেকে ইংরেজি 'Bengal' শব্দের উৎপত্তি। ষোড়শ শতকে আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' বইতে লিখেছেন, সুবা বাংলা পূর্ব-পশ্চিমে (চট্টগ্রাম থেকে বর্তমান বিহারের অন্তর্গত তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত) ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে (উত্তরের পর্বতমালা থেকে হুগলী জেলায় মন্দারণ পর্যন্ত) ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল; পূর্ব সীমান্তে ছিল কামরূপ ও আসাম (বর্তমান আসাম রাজ্যের পশ্চিমাংশকে 'কামরূপ' বলা হত), পশ্চিম সীমান্তে ছিল সুবা বিহার, দক্ষিণে ছিল সমুদ্র। 'বাংলা' শব্দটির অর্থের এই বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বর্তমানে যে ভূখণ্ড 'বাংলাদেশ' নামে পরিচিত সেটা ঐতিহাসিক বাংলার পূর্বাংশ মাত্র এবং ইতিহাসের বিচারে এই নামটি অযৌক্তিক।

* * *

বখ্তিয়ারের মৃত্যুর পরে দীর্ঘ ৭৫ বছর (১২০৬-৮২) লখ্নৌতির তুর্কী রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ছিল। এর প্রধান কারণ দুটি। বখ্তিয়ারের পুত্র বা আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী কেহ ছিল কিনা জানা যায় না। তিনি তাঁর অধিকৃত অঞ্চলকে কয়েকটি 'ইক্তা' বা প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত করেন এবং তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষদের উপর বিভিন্ন এলাকার শাসনভার অর্পণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে এই খলজী মালিকদের মধ্যে ক্ষমতালাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এই রীতি প্রচলিত হল যে, যে কোন শক্তি-শালী ব্যক্তি শাসককে হত্যা করে অথবা বিদ্রোহের মাধ্যমে সিংহাসন অধিকার করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সেই আইনসঙ্গত শাসক রূপে স্বীকৃতি লাভ করবে; বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের রীতির উদ্ভব হল না। ফলে ৭৫ বছরে মোট ১৯ জন শাসক মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী। তিনি প্রায় ১৫ বছর (১২১৩-২৭) রাজত্ব করেন, পূর্ণ রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন দিকে রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন।

লখ্‌নৌতি রাজ্যের তুর্কী শাসকদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবের একটি প্রধান কারণ ছিল দিল্লীর সুলতানদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। বখ্‌তিয়ার দিল্লীর সেনাপতি ছিলেন না, তাঁর অভিযান দিল্লীর সাহায্য ছাড়াই পরিচালিত হয়েছিল। তিনি কুতবউদ্দীনকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন নি। সুতরাং লখ্‌নৌতি রাজ্যের উপর দিল্লীর কোন ন্যায়সঙ্গত দাবি ছিল না। কিন্তু সুলতান ইল্‌তুৎমিস গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজীর বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণ করে তাঁকে বন্দী করেন এবং নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীনকে লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অল্পদিন পরে নাসিরউদ্দীনের মৃত্যু হয়। তখন ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন বল্‌কা খলজী নামক এক আমীর বিদ্রোহী হয়ে রাজ্যটি অধিকার করেন। ইলতুৎমিস স্বয়ং লখ্‌নৌতিতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে দমন করেন এবং নিজের অন্যতম ঘনিষ্ঠ অমাত্য আলাউদ্দীন জানীকে শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই আলাউদ্দীন জানী পদচ্যুত হন এবং সইফউদ্দীন আইবক নামে দিল্লীর আর এক আমীর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১২৩৬ সালে ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যু হয়। তাঁর উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কার্যতঃ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে কয়েকটি খণ্ডরাজ্য সৃষ্টি করেন। লখ্‌নৌতি রাজ্যেও এই বিশৃঙ্খলতা প্রতিফলিত হয়েছিল। নামে দিল্লীর প্রাধান্য বজায় ছিল, কিন্তু বাংলার শাসনকর্তারা শাসন-কর্তৃত্ব অধিকার এবং প্রতিবেশী রাজ্য আক্রমণ সম্বন্ধে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতেন। ১২৬৬ সালে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে গিয়াসউদ্দীন বলবন তুর্কী সাম্রাজ্যের শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর অনুগ্রহে তুগরল খাঁ লখ্‌নৌতির শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু বখ্‌তিয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করে তিনিও দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কঠোর ও শক্তিমান সুলতান বলবন নিজে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলায় উপস্থিত হয়ে দিল্লীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন। তুগরল যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়ে উচ্চাভিলাষের জন্য চরম শাস্তি ভোগ করলেন (১২৮২)। বলবন বিদ্রোহের মূল উৎপাটন করার উদ্দেশ্যে লখ্‌নৌতিতে বীভৎস হত্যা-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে বিভীষিকা সৃষ্টি করলেন। এক ক্রোশ দীর্ঘ লখ্‌নৌতির বাজারে বহু শূল পোঁতা হল। তাতে তুগরলের পুত্র, জামাতা, মন্ত্রী ও উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী, সেনানায়ক, দেহরক্ষী, পাইক এবং ক্রীতদাসদের গেথে দেওয়া হল। দিল্লীবাসী যারা তুগরলের পক্ষ সমর্থন করেছিল তাদের শাস্তি হল দিল্লীতে। নৃশংসতার সেই বীভৎস যুগেও এই ঘটনার সঙ্গে তুলনীয় অন্য কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

হত্যাকাণ্ডের পরে বলবন কিছুদিন লখ্‌নৌতিতে থেকে শাসন-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন। পরে নিজের কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খাঁকে শাসনভার

অর্পণ করে তিনি দিল্লীতে ফিরে গেলেন।

বলবনের মৃত্যুকাল (১২৮৭) পর্যন্ত বুগরা খাঁ দিল্লীর অধীনে লখ্‌নৌতি শাসন করেন। দিল্লীর আমীরদের ষড়যন্ত্রে বৃদ্ধ সুলতানের উত্তরাধিকারী রূপে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন বুগরা খাঁর পুত্র কায়কোবাদ। বুগরা খাঁ এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। ১২৯০ সালে জলালউদ্দীন খলজী কায়কোবাদকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। অল্পদিন পরে বুগরা খাঁ পদ-ত্যাগ করে নিজের দ্বিতীয় পুত্র রুকনউদ্দীন কাইকাউসকে লখ্‌নৌতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বলবনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী এবং লখ্‌নৌতির মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কাইকাউসের মৃত্যুর (১৩০১) পরে শম্‌স্‌উদ্দীন ফীরুজ শাহ লখ্‌নৌতির অধীশ্বর হন; তিনি বলবনী বংশের লোক ছিলেন না। তাঁহার পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলক কর্তৃক আক্রান্ত ও রাজ্যচ্যুত হন, কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন। দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলকের আমলে তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হন; ফল পরাজয় ও মৃত্যু।

দিল্লীর খলজী সুলতানেরা বাংলার তুর্কী রাজ্যের স্বাধীনতা মেনে নিয়ে-ছিলেন। তুগলক সুলতানেরা এই নীতি পরিত্যাগ করে দিল্লীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করায় বাংলায় আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিল। গিয়াসউদ্দীন তুগলক বাংলায় মুসলমানদের অধিকৃত অঞ্চলকে তিনটি প্রদেশে বিভক্ত করেন: লখ্‌নৌতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁও। তিনটি প্রদেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। মোহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বের শেষ দিকে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই সুযোগে বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলার সঙ্গে দিল্লীর রাজনৈতিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। শের শাহ কর্তৃক গৌড় অধিকারের সময় পর্যন্ত দুশো বছর বাংলা স্বাধীন ছিল। দিল্লীর সুলতান ফীরুজ শাহ তুগলক দু'-বার বাংলা আক্রমণ করেও এই বিদ্রোহী প্রদেশে নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে দিল্লী সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয় সুস্পষ্ট হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঐ সাম্রাজ্য কার্যতঃ একটি প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হয়ে-ছিল। দিল্লীতে যদি ইলতুৎমিস, বলবন ও আলাউদ্দীন খলজীর মত শক্তিমান সুলতান থাকতেন তবে বাংলার স্বাধীনতা খুব সম্ভব অক্ষুণ্ণ থাকত না।

বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুকালে তাঁর অধিকৃত অঞ্চলের সীমারেখা ছিল পশ্চিমে কোশী নদী, পূর্বে পুনর্ভবা নদী, উত্তরে দেবকোট (দিনাজপুর জেলা) ও দক্ষিণে গঙ্গা। পূর্ব বাংলায় দীর্ঘকাল হিন্দু অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ থেকে পলায়নের পরেও কিছুকাল জীবিত এবং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত

ছিলেন। মিনহাজ-ই-সিরাজের মতে, ১২৬০ সালেও লক্ষ্মণ সেনের বংশধরেরা পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেন। ১২৮৯ সালেও মধু সেন নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেন রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে, অথবা তাঁদের পরে, দেববংশীয় রাজারা পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করতেন। তুগরল খাঁ (১২৭৮-৮১) যখন জাজনগর (উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্য) আক্রমণ করেন তখন বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার অনেকাংশ ঐ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী (১২১৩-২৭) পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু পূর্ব বাংলার ঠিক কোন অংশ তাঁর অভিযানের লক্ষ্য ছিল তা' জানা যায় না। এই অভিযানে কোন ফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন ইউজবক (১২৫১-৫৭) জাজনগরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে হুগলীর মন্দারণ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তুগরল খাঁ (১২৭৮-৮২) পূর্ব বাংলায় সোনারগাঁও অঞ্চল অধিকার করেন এবং সোনারগাঁও-এর নিকটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ দুর্গটি বর্তমান ঢাকা শহরের ২৫ মাইল দক্ষিণে—ফিরিঙ্গীদের উল্লিখিত 'লারিকল' নামক স্থানে—অবস্থিত ছিল।

রুকনউদ্দীন কাইকাউসের রাজত্বকালে (১২৯১-১৩০১) 'বঙ্গ' (পূর্ব বাংলা) এবং সাতগাঁও অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার আরম্ভ হয়। শমসুউদ্দীন ফীরুজ শাহের সময়ে (১৩০১-২১) এই দুইটি অঞ্চলে মুসলমান অধিকার অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। দিল্লীর খলজী সুলতানেরা বাংলায় রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেন নি। আলাউদ্দীন খলজীর দিগ্বিজয় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। বলবনী আমলের যে সকল উচ্চাভিলাষী যোদ্ধা খলজী আমলে দিল্লীতে সুলতানের পৃষ্ঠ-পোষকতা থেকে বঞ্চিত হল তারা ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় উপস্থিত হল। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় গাজী, পীর, আউলিয়া, দরবেশ প্রভৃতির রাজনীতি এবং রণ-ক্ষেত্রে প্রবেশ। ধর্মপ্রচার এবং অস্ত্রচালনা দ্বারা তাঁরা তুর্কী রাজ্য বিস্তারে সহায়তা করেন। হুগলী-পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজার পতনের সঙ্গে শাহ সফীউদ্দীন নামক এক পীরের কাহিনী জড়িত আছে। আর এক প্রবাদ অনুসারে, পীর শাহ জলাল শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দকে পরাজিত করে সেখানে মুসলমানদের অধিকার এবং বসতি স্থাপন করেন। 'সন্ত'দের এই সকল সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় শাসকগণের সহানুভূতি ও সহায়তা সহজলভ্য ছিল।

সাতগাঁও বিজয়ে নেতৃত্ব করেন জাফর খাঁ নামক এক সেনাপতি। শমসুউদ্দীন ফীরুজ শাহ সোনারগাঁও-এ একটি টাকশাল স্থাপন করেন এবং ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট অধিকার করেন। তুগরল খাঁর সময় থেকে পূর্ব বাংলায় রাজ্যবিস্তারের সূচনা, শমসুউদ্দীন ফীরুজ শাহের সময়ে তার অগ্রগতি। রাঢ়ের কিছু অংশ বাদ দিলে শমসুউদ্দীন ফীরুজ শাহকে মোটামুটি ভাবে সমগ্র বাংলার অধীশ্বর রূপে গণ্য করা যায়।

*　　　*　　　*

মুসলমানদের রাজ্যবিস্তারের ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু একটি সাধারণ তথ্য মনে রাখা দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল শাসন-ব্যবস্থা শহর অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল, বিরাট গ্রামাঞ্চলে কার্যতঃ স্থানীয় হিন্দু রাজা ও জমিদারদের প্রভুত্ব বজায় থাকত। মুসলমান প্রভুদের কাছে তাঁরা 'বেতসবৃত্তি' অবলম্বন করতেন, অর্থাৎ সামরিক বল প্রয়োগের সম্মুখীন হলে বশ্যতা স্বীকার করতেন, ভূমি-রাজস্ব দিতেন, এবং পরে সুবিধামত ভূমি-রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করতেন বা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হতেন। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন অঞ্চল মুসলমানদের বার বার আক্রমণ ও অধিকার করতে হত। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, সামরিক সংগঠন এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন হিন্দু সমাজে তার একান্ত অভাব ছিল। তিব্বতে বখ্‌তিয়ারের বিপর্যয়ের পরে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাঢ় বা বরেন্দ্র অঞ্চলের কোন হিন্দু রাজা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেন নি, বিক্রমপুর থেকে সেন রাজারাও হৃত রাজ্য দখলের জন্য অগ্রসর হন নি। বরং সেন রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল জেলা) অঞ্চলে দশরথ-দনুজমাধব স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। গিয়াসউদ্দীন বলবন তুগরলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সোনারগাঁও-এর 'রায় দনুজ' নামক হিন্দু রাজার সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। মুসলমানদের প্রধান শত্রু ছিল উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্য। উত্তর-পূর্বে তাদের রাজ্য বিস্তারে বাধা দিয়েছিল কামরূপ রাজ্য এবং আহোম রাজ্য। পূর্ব-দক্ষিণে ছিল ত্রিপুরা রাজ্য। মুসলমানদের বিতাড়িত করে বাংলায় হিন্দু-প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন করা এই হিন্দু রাজ্যগুলির পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষা করাই এদের পক্ষে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিধর্মীদের দেশে মুসলমান অধিকার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজশক্তির সমর্থক একটি মুসলমান সমাজ স্থাপন করার আবশ্যকতা বখ্‌তিয়ার উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তাঁর অধিকৃত অঞ্চলে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা এবং 'খান্‌কা' (সুফীদের আস্তানা) নির্মাণ করেন। তাঁর দৃষ্টান্ত আমীরেরা অনুসরণ করেন। পরবর্তী মুসলমান শাসকদের সময়েও এই রীতি অব্যাহত ছিল। আলী মর্দান খলজী (১২১০-১৩) দিল্লীতে কুতবউদ্দীনের অনুগ্রহে লখ্‌নৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। লখ্‌নৌতির দিকে যাত্রার আগে তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করেন, কারণ তিনি জানতেন যে লখ্‌নৌতিতে তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন হবেন —বখ্‌তিয়ারের হত্যাকারীকে স্থানীয় আমীরেরা সহজে গ্রহণ করবেন না। ফলে লখ্‌নৌতিতে বহু উত্তর ভারতীয় মুসলমানের সমাগম হল। আলী মর্দানের রাজত্বকালে তারা লখ্‌নৌতির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল। বখ্‌তিয়ারের পরে এটাই বাংলায় 'দ্বিতীয় পর্যায়ে অধিক সংখ্যক বহিরাগত মুসলমানের' বসতিস্থাপন।

তৃতীয় পর্যায়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। যে সকল খাঁটি তুর্কী দিল্লীতে খলজীদের আধিপত্যে অস্বস্তি বোধ করত তারা মনে করল যে লখ্নৌতিতে বলবনের বংশের আশ্রয়ে তাদের নিরাপত্তা এবং ভাগ্যোন্নতির সুযোগ হবে। লখ্নৌতিতে তাদের আগমন শাসকদের শক্তিবৃদ্ধি এবং রাজ্যবিস্তারের সহায়ক হল। পরবর্তীকালে নানা কারণে বাংলায় বহু বহিরাগত মুসলমানের সমাবেশ ঘটল। একমাত্র রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র জলালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ এবং তাঁর পুত্র ছাড়া মুসলমান রাজারা সকলেই বহিরাগত মুসলমান অথবা বহিরাগত মুসলমানের বংশধর ছিলেন। জলালউদ্দীন ইসলামের অত্যুৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহিরাগত মুসলমানদের পক্ষে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা সহজলভ্য ছিল। সরকার তাদের আনুগত্য রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করত।

কিন্তু বাংলায় মুসলমান সমাজের সম্প্রসারণের প্রধান কারণ ছিল বহুসংখ্যক হিন্দুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ। এর ফলে মুসলমান সমাজ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, রাজশক্তি দৃঢ়মূল হল। বহিরাগত মুসলমানেরা সরকারী চাকুরি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে সাধারণতঃ শহরাঞ্চলে বাস করত, ধর্মান্তরিত হিন্দুরা গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকত। প্রধানতঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরাই ধর্মান্তরিত হত, পৈতৃক ধর্ম ত্যাগের ফলে পৈতৃক বাসভূমি এবং পৈতৃক পেশার সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটত না।

* * *

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে স্বাধীন বাংলার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন শমসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৮)। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তী সুলতানকে হত্যা করে লখ্নৌতির সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর পূর্ব ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না; সম্ভবতঃ তিনি ইরান (পারস্য) থেকে এদেশে এসেছিলেন। যাই হোক, লখ্নৌতিতে নিজের ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করে তিনি ক্রমান্বয়ে সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও অধিকার করেন। গিয়াসউদ্দীন তুগলক যে তিনটি প্রদেশ তৈরী করেছিলেন, অনেক মারামারি কাটাকাটির পর সেগুলি সম্মিলিত হল, ইলিয়াস সমগ্র বাংলার অধিপতি হলেন। তিনি বাংলার বাইরেও রাজ্যবিস্তার করেন। নেপাল এবং উড়িষ্যা আক্রমণ করে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। ত্রিহুত (উত্তর বিহার) এবং কামরূপের কতকাংশ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল। দিল্লীর সুলতান ফীরুজ শাহ তুগলক তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়ান্ত ভাবে জয়ী হয় নি, ফীরুজ শাহ ইলিয়াসের একডালা দুর্গ অধিকার করতে পারেন নি। এই যুদ্ধের ফলে ইলিয়াসের স্বাধীনতা কার্যতঃ দিল্লীর স্বীকৃতি লাভ করে।

ইলিয়াসের রাজনৈতিক কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। নবাগত বিদেশী হয়েও তিনি বাংলায় রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন, পূর্বে ও পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার

করে বাংলার সুলতানের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং দিল্লীর সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করে বাংলার স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর বংশধরেরা দীর্ঘকাল স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন; বাংলায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এই যুগের একটি বিশেষত্ব।

বাংলার হিন্দুরা যে মুসলমানদের শাসন মেনে নিয়েছিল একডালার যুদ্ধের কাহিনীতে তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধে হিন্দু পদাতিক সৈন্যেরা বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেয় এবং তাদের দলপতি সহদেব নিহত হন।

ইলিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-৯০) দীর্ঘকাল রাজত্ব করে সম্ভবতঃ তাঁর বিদ্রোহী পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৯০-১৪১০) সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সিকান্দরের সময়ে ফীরুজ শাহ তুগলক আবার বাংলা আক্রমণ করেন। আবার একডালা দুর্গকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ হয়, কিন্তু ফীরুজ শাহ জয়ী হতে পারেন নি।

গিয়াসউদ্দীন পিতা ও পিতামহের মত যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় না দিলেও 'বিদ্বান, রুচিমান, রসিক ও ন্যায়পরায়ণ নৃপতি' ছিলেন। তিনি জৌনপুরের সুলতান এবং চীনের সম্রাটের দরবারে দূত প্রেরণ করেন। চীন দেশের সঙ্গে দূত বিনিময়ের প্রথা তাঁর মৃত্যুর পরেও অব্যাহত ছিল। বাংলা দেশ থেকে চীন দেশে ১৪০৫, ১৪০৮, ১৪০৯, ১৪১২, ১৪১৪ এবং ১৪৩৮-৩৯ সালে দূত প্রেরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। চীন দেশ থেকে বাংলা দেশে ১৪০৯, ১৪১৩ এবং ১৪১৫ সালে দূত প্রেরণ করা হয়। চীনা দূতদের লিখিত বিবরণ থেকে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

অর্ধ শতাব্দী পূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন ঃ

'ইলিয়াস শাহীরা দেশবাসীর সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিতেন। এমন কি, তাঁহাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ বড়লোকদের সাহায্য না লইলে চলিত না। তাঁহাদের রাজত্বে অনেক জায়গায় বড় বড় হিন্দু ও বৌদ্ধ জায়গীরদার ছিল। একজন হিন্দু রাজা একটি টাকা রাজস্ব দিয়া ভাদুরিয়ার জমিদারী ভোগ করিতেন। সেই জমিদারীর নাম ছিল একটাকিয়া। অনেক কায়স্থ মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিস্তর জমিদারী ভোগ করিত, বিশেষতঃ উত্তররাঢ়ী কায়স্থরা। আর করিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা, কেননা তাহারা রাজধানীর অতি নিকটে থাকিত।'[১]

গিয়াসউদ্দীনের পুত্র সইফউদ্দীন হামজা শাহ অল্পদিন রাজত্ব করার পর সম্ভবতঃ তাঁর ক্রীতদাস শিহাবউদ্দীন কর্তৃক নিহত হন (১৪১২)। শিহাবউদ্দীনও সম্ভবতঃ অকালে নিহত হন। তাঁর পুত্রকে সরিয়ে দিয়ে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা গণেশ সিংহাসন অধিকার করেন (১৪১৫)। গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পরবর্তী পাঁচ বৎসরের (১৪১০-১৫) ঘটনাবলীর কোন সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে গণেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে

১। 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', দ্বিতীয় সম্ভার, সম্পাদক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮২ পৃষ্ঠা।

জড়িত ছিলেন সন্দেহ নেই।

* * *

'রাজা গণেশ বাংলার ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। তিনিই একমাত্র হিন্দু, যিনি বাংলার পাঁচ শতাধিক বর্ষব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্য ব্যতিক্রম করিয়া হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্য গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অভ্যুদয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। রাজা গণেশ খাঁটি বাঙালী ছিলেন, ইহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।'

গণেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য জানা যায় নি। অনেক ফার্সি পুঁথিতে তাঁর নাম লেখা হয়েছে 'কান্স্'; তাই অনেকে মনে করেন যে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'কংস'। অন্য মতে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'কাশী'। কয়েকটি বৈষ্ণব পুঁথির বিবরণ থেকে মনে হয় যে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'গণেশ'। সম্ভবতঃ রাজশক্তি অধিকার করে তিনি 'দনুজমর্দনদেব' নামে মুদ্রা প্রচার করেন। অপর মতে 'দনুজমর্দন' ভিন্ন ব্যক্তি, তিনি চন্দ্রদ্বীপের বা দক্ষিণ বঙ্গের রাজা ছিলেন। 'মহেন্দ্রদেব' নামক এক সমসাময়িক রাজার মুদ্রাও সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সম্ভবতঃ তিনি গণেশের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

গণেশ ভাতুরিয়া নামক বিস্তৃত পরগণার জমিদার ছিলেন। এই পরগণা বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ এই জমিদার বংশ তুর্কী আক্রমণের পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। মুসলমান সমাজে বিশেষ সম্মানের অধিকারী সমসাময়িক সন্ত নূর কুতব উল আলমের এক চিঠিতে গণেশকে '৪০০ বছরের জমিদার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলমান শাসনকালে বড় বড় হিন্দু জমিদারেরা প্রভূত ঐশ্বর্য এবং প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। হোসেন শাহের সময়ে হিরণ্য ও গোবর্ধন সপ্তগ্রাম মুলুকে বিশ লক্ষ টাকা খাজনা সংগ্রহ করে বার লক্ষ সুলতানের কোষাগারে পাঠাতেন এবং আট লক্ষ নিজেরা রাখতেন। ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষক রূপে হিন্দু জমিদারেরা হিন্দু সমাজ শাসন করতেন। তাঁরা পাইক-বরকন্দাজদের সাহায্যে অবাধ্য প্রজাদের দমন করতেন, প্রয়োজন হলে প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারদের সঙ্গে লড়াই করতেন। গণেশের শক্তিশালী পদাতিক বাহিনী ছিল; তাঁর পাইকেরা সুলতানের বেতনভোগী ছিল না।

ইলিয়াস শাহী বংশের পতন কেবলমাত্র গণেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্রের ফলে ঘটে নি। সুলতানদের দরবারে মুসলমান আমীরদের মধ্যে দলীয় কোন্দল বরাবরই ছিল; বখ্তিয়ারের সময় থেকে উচ্চাভিলাষী আমীরেরা বারবার সুলতানদের সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সম্ভবতঃ দলীয় কোন্দল প্রবল করেছিলেন। তাঁর চরিত্রে বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও দৃঢ়তার অভাব ছিল বলে মনে হয়। কামরূপ-

কামতা রাজ্যের সহিত সামরিক সংঘর্ষে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর পিতামহের সময় থেকে হিন্দুরা রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করে ইলিয়াস শাহী বংশের অনুগত সহযোগী হয়েছিল, কিন্তু বিহারের দরবেশ মুজফফর শমস্ বল্‌খীর নির্দেশে তিনি বিভিন্ন উচ্চ পদ থেকে হিন্দুদের অপসারিত করেন। চীনা দূতেরা বলেছেন যে বাংলার সুলতানদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সকলেই মুসলমান, একজনও অমুসলমান নেই। গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের অন্যতম আমীর ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি গিয়াসউদ্দীনের হিন্দু-বিতাড়ন নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ফলে গিয়াসউদ্দীন এবং তাঁর পুত্র হামজা শাহ ক্রমান্বয়ে নিহত হন এবং রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কহীন ক্রীতদাস শিহাবউদ্দীন গণেশের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করেন। গণেশ স্বভাবতঃই রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ালেন। সম্ভবতঃ তাঁর আধিপত্য সহ্য করতে স্বীকৃত না হয়ে শিহাবউদ্দীন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। গণেশ আত্মরক্ষার জন্য তাঁর হত্যার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকর হল না। তখন গণেশ নামসর্বস্ব সুলতানকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সিংহাসন অধিকার করেন।

এই রাজনৈতিক বিপ্লব কেবলমাত্র গণেশের সাহসে ও বুদ্ধিবলে সংঘটিত হয়েছিল, এমন কথা বলা যায় না। ক্ষমতাশালী মুসলমান আমীরদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত ও দলীয় কোন্দল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল তিনি সুকৌশলে তারই সুযোগ গ্রহণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে এক অংশের সহযোগিতা না থাকলে তাঁর চক্রান্ত সফল হত না। 'তিনি কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিয়াছিলেন, অর্থাৎ মুসলমানদের দ্বারা মুসলমানদের হত্যা করিয়াছিলেন এবং এই উপায়ে শেষ পর্যন্ত ইলিয়াস শাহী রাজবংশের কেহ যখন অবশিষ্ট রহিল না, তখন তিনি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং নিজেই সিংহাসনে বসেন।' তিনি যে দু'শতকব্যাপী মুসলমান রাজত্বের অবসান করে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করবেন এটা বোধহয় মুসলমান আমীরা বুঝতে পারেন নি। 'যখন তাঁহারা তাঁহার আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন তখন তাঁহাদের আর কিছুই করার ছিল না।'

হয়তো মুসলমান আমীরেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মুসলমান সমাজের ধর্মীয় নেতারা ইসলামের দেশে (দার-উল-ইসলাম) কাফেরের শাসন সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। মুজফফর শমস্ বল্‌খী গিয়াসউদ্দীন আজমকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

'মহান্ আল্লাহ্ বলিয়াছেন, বিশ্বাসীগণ! তোমাদের শ্রেণীর বাহিরের কাহারও সঙ্গে মিত্রতা করিও না। তফসীর এবং অভিধানে বলা হইয়াছে যে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসী এবং অপরিচিত লোকদিগকে বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং উজীর নিযুক্ত করিবে না। যদি তাহারা (বিশ্বাসীরা) বলে যে তাহারা অবিশ্বাসীদিগকে বন্ধু বা প্রিয়জন বানাইতেছে না, বরং সুবিধার খাতিরে এইরূপ করি-

তেছে, তাহা হইলে উত্তর এই যে, ইহাতে সুবিধা হয় না, বরং বিদ্রোহ এবং গোলযোগ হয়। আল্লাহ্ বলিয়াছেন যে, তাহারা (অবিশ্বাসীরা) তোমাকে বিপথে চালিত করিতে ব্যর্থ হইবে না এবং তাহারা তোমার কাজে গোলযোগ করিতে ইতস্তত করিবে না। অতএব আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা এবং আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিকে ত্যাগ করাই আমাদের উচিত। আল্লাহ্ বলিয়াছেন যে, তাহারা শুধু তোমার ধ্বংস কামনা করে, অর্থাৎ তুমি যদি তাহাদের সঙ্গে মিত্রতা কর তাহা হইলে তাহারা তোমাকে বিপথে চালিত করিবে। বিধর্মীদের সামান্য কাজে নিযুক্ত করা যায়, কিন্তু তাহাদের ওয়ালি (শাসনকর্তা বা গবর্নর) নিযুক্ত করা উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে তাহারা মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করিবে। আল্লাহ্ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌কে উপেক্ষা করিয়া বিধর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়, যদি কেহ তাহা করে সে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিবে না—শুধু বিধর্মীদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কবাণীই পাইবে। যাহারা মুসলমানদের উপর বিধর্মীদের কর্তৃত্ব প্রদান করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোরাণ, হাদীস এবং ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে অনেক সতর্কবাণী রহিয়াছে। আল্লাহ্ অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে সাহায্য দেন এবং তিনিই মুক্তি দেন। খাদ্য, জয় এবং অর্থ দান করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পরাজিত বিধর্মীরা নতমস্তকে তাহাদের নিজ এলাকায় কর্তৃত্ব করে এবং শাসন করে। কিন্তু তাহারা ইসলামের আয়ত্তাধীন দেশগুলিতেও উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছে এবং মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। এইরূপ হওয়া উচিত নয়।'

বাংলার 'দরবেশদের নেতা' নূর কুতব উল আলমও গিয়াসউদ্দীনকে অনুরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন। গণেশ রাজদণ্ড গ্রহণ করলে তিনি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে এক চিঠি লিখলেন: 'কানস্ নামক এই দেশের শাসনকর্তা একজন বিধর্মী। তিনি অত্যাচার করিতেছেন এবং রক্তপাত করিতেছেন। তিনি অনেক জ্ঞানী এবং পুণ্যাত্মাকে হত্যা এবং ধ্বংস করিয়াছেন। এখন তিনি অবশিষ্ট মুসলমানকে হত্যা করার এবং ইসলামকে এই দেশ হইতে ধ্বংস করার মনস্থ করিয়াছেন। যেহেতু মুসলমানদিগকে সাহায্য করা এবং রক্ষা করা মুসলমান রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য, সেহেতু আমি এই কয়েক ছত্র লিখিয়া আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করিতেছি। এই দেশের বাসিন্দাদের খাতিরে এবং আমাকে বাধিত করার জন্য আমি এখানে আপনার শুভাগমন প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে মুসলমানেরা এই অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পায়। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।'

এই প্রসঙ্গে নূর কুতব উল আলম তাঁর এক প্রিয়জনকে লিখেছিলেন: 'ভগবান

রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব একজন বিধর্মীর হাতে তুলে দিয়েছেন।...ইসলামের রাজত্ব আজ তাদের হাতে গিয়ে পড়েছে যারা অন্যদের ভগবানের সঙ্গে একাসনে বসায়। ভগবান কাফেরী দিয়ে ইসলামের স্থান অধিকার করিয়েছেন।...কাফেরী প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ইসলামের রাজ্য ধ্বংস হয়েছে।...প্রত্যেকের উচিত সারা রাত্রি ধরে প্রার্থনা করা, শোক করা এবং ভগবানের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা।'[৪]

নূর কুতব উল আলমের চিঠি পেয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম তাঁর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ দরবেশ সৈয়দ আসরফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর উপদেশ প্রার্থনা করলেন। সিমনানী তাঁকে বাংলা আক্রমণ করার উপদেশ দিলেন। তিনি এক চিঠিতে লিখলেন: 'ধার্মিক রাজাদের পক্ষে মুসলমান ধর্মের রক্ষার জন্যে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার চেয়ে আনন্দের কাজ আর কিছুই নেই।' অন্যান্য অনেক দরবেশের মত সিমনানীও ধর্মরক্ষা এবং রাজ্য বিস্তারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তিনি সুলতানকে জানালেন, 'আপনার তাড়াতাড়ি যাত্রা করা উচিত, কারণ এই অভিযানে জাগতিক এবং পারলৌকিক সুফল পাওয়া যাইবে—ইহাতে বঙ্গদেশ জয় হইবে।'[৫] সুলতান ইব্রাহিমের রাজ্য বিহারের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, সুতরাং 'জাগতিক' স্বার্থে 'বঙ্গদেশ জয়' তাঁর পক্ষে বিশেষ কাম্য ছিল।

ইব্রাহিম সসৈন্যে বাংলার দিকে অগ্রসর হয়ে পথে ত্রিহুতে শিব সিংহের বিদ্রোহ দমন করলেন। শিব সিংহ (কবি বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক) রাজা গণেশের মিত্র ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান দরবেশদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ ছিল। শিব সিংহ ইব্রাহিমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে পরাজিত করে ইব্রাহিম যখন বাংলায় উপস্থিত হলেন তখন গণেশ খুব সম্ভবতঃ যুদ্ধ না করে আত্মরক্ষার অন্য পথ অবলম্বন করলেন। তিনি নূর কুতব আলমের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে অনুরোধ করলেন সুলতান ইব্রাহিমকে বাংলা জয় করা থেকে বিরত করার জন্য। তাঁর এই দুর্বলতার কারণ অস্পষ্ট। সম্ভবতঃ তিনি জানতেন যে ইব্রাহিমের বিপুল সামরিক শক্তি প্রতিরোধ করা তাঁর পক্ষে হঠকারিতা মাত্র। হয়তো গিয়াসউদ্দীনের আমল থেকে দলীয় কোন্দলে যে সব মুসলমান আমীর তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তাঁরা ইব্রাহিমের আক্রমণের সুযোগ পেয়ে নূর কুতব উল আলমের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

গণেশ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে মুসলমানদের সহানুভূতি হারিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী নূর কুতব উল আলম। তাঁর মত 'পূত চরিত্রের লোক' ইব্রাহিমের কাছে লিখিত চিঠিতে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন, একথা সাধারণভাবে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু ঐ চিঠিতেই প্রমাণিত হয় যে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুদের উপর তাঁর প্রবল বিদ্বেষ

৪। তদেব, ২৫৭ পৃষ্ঠা।
৫। তদেব, ২৫৮ ও ২৪২ পৃষ্ঠা।

ছিল। সুতরাং তাঁর উক্তিকে নিরপেক্ষ সাক্ষ্য রূপে গণ্য করা কঠিন। আর একজন মুসলমান লেখকের বিবরণে পাওয়া যায় যে গণেশের পুত্র জলালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ তাঁর পিতা যে সকল মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন সেগুলির সংস্কার করেন। মসজিদ ধ্বংস করে গণেশ সমগ্র মুসলমান সমাজের বিরোধিতা ডেকে আনবেন, একথা মনে করা কঠিন। তাঁর মত প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিশ্চয়ই এরূপ ধর্মদ্বেষী নীতির কুফল সম্বন্ধে অবহিত দিলেন।

তৃতীয়তঃ, গণেশের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে এলাহাবাদে রচিত 'সঙ্গীত শিরোমণি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ইব্রাহিম শর্কীর এক প্রশস্তি আছে। তাতে বলা হয়েছে, 'এই প্রবীণ (ইব্রাহিম) প্রচুর গর্বসহকারে গর্জনকারী হস্তী, অশ্ব ও সেনারূপ মেঘবর্ষণে সেই অগ্নিকে নিঃশংক নির্বাপণ করেছিলেন, যে অগ্নিতে শকেরা (মুসলমানেরা) শলভের মত পুড়ে মরেছিল...।'[৬] এখানে গণেশকেই 'অগ্নি' বলা হয়েছে, তাঁর উত্তাপে 'শকেরা পুড়ে মরেছিল' এই উক্তি থেকে মুসলমানদের উপর গণেশের নির্যাতন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, হিন্দু কর্তৃক মুসলমান শাসনের উৎখাত করাকেও শকদের পোড়ানো বলে বর্ণনা করা অসম্ভব নয়। প্রশস্তির প্রধান উদ্দেশ্য ইব্রাহিমের স্তুতিঃ তিনি বিপুল পরাক্রমে 'অগ্নির' (গণেশের) 'রাজনীতিজ্ঞ পুত্রকে তুরস্ক নির্মাণ করে (মুসলমান করে) গৌড় দেশকে আবার শক রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।' এই উক্তি খুব সম্ভব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গণেশের অনুরোধে নূর কুতব উল আলম তাঁর পুত্র যদুকে 'তুরস্ক নির্মাণ' করেন এবং ঐ দরবেশের অনুরোধে ইব্রাহিম বিনা যুদ্ধে বাংলা দেশ থেকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে 'গৌড় দেশকে আবার শক রাজ্যে পরিণত' করেন নি।

এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তার একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ যদিও রাজা কান্‌স্‌ মুসলমান ছিলেন না, তা হলেও তিনি মুসলমানদের সঙ্গে এতখানি বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে কোন কোন মুসলমান তাঁকে মুসলমান বলে ঘোষণা করে ইসলামের প্রথা অনুযায়ী কবর দিতে চেয়েছিলেন।'[৭] ফিরিশ্‌তা দক্ষিণ ভারতে তাঁর বই লিখেছিলেন, এই কাহিনী সেখানেও পৌঁছেছিল। এটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মুসলমানদের সঙ্গে গণেশের 'বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক' তাঁর পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, কিন্তু ইসলামের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কাহিনী দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' বলা হয়েছে, তিনি যখন ইব্রাহিমের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নূর কুতব উল আলমের শরণাপন্ন হন তখন দরবেশ তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরামর্শ

৬। তদেব, ২৭১ পৃষ্ঠা।

৭। সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর,' ১৪৬ পৃষ্ঠা।

দেন; তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে 'বিপথগামী' করে তাঁকে ধর্মান্তরিত হতে দিলেন না।[৮]

যে কারণেই হোক, গণেশ প্রভাবশালী দরবেশদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কোন নির্দিষ্ট অত্যাচারের অভিযোগ থাকুক বা না থাকুক, দরবেশরা বিধর্মীর রাজনৈতিক অধিকার সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কেবল গণেশের ব্যাপারে নয়, তাঁর মিত্র ত্রিহুতের শিব সিংহের ব্যাপারেও দরবেশরা সক্রিয় ছিলেন। মোগল আমলের একজন মুসলমান লেখক বলেছেন: (শিব সিংহ) দারভাঙ্গার অধিকাংশ ধর্মপ্রচারক ও ইসলামের নায়কদের শহীদীর পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করালেন...।'[৯] এখানে সাধারণ মুসলমানদের উপর অত্যাচারের কথা বলা হয় নি, 'ধর্মপ্রচারক ও ইসলামের নায়কদের' কথা বলা হয়েছে। ইব্রাহিমের কাছে লেখা চিঠিতে নূর কুতব উল আলমের প্রধান অভিযোগ ছিল যে গণেশ 'অনেক জ্ঞানী এবং পুণ্যাত্মাকে হত্যা এবং ধ্বংস করিয়াছেন।' শিব সিংহ এবং গণেশ মসজিদ ধ্বংস করেছেন, মুসলমান রাজকর্মচারীদিগকে পদচ্যুত করেছেন, মুসলমান জায়গীরদারদের জায়গীর কেড়ে নিয়েছেন, বা করবৃদ্ধি করে প্রজাদের দুর্দশাগ্রস্ত করেছেন —এমন কোন অভিযোগ নেই। গণেশ এবং শিব সিংহ সম্বন্ধে যে সব ঐতিহাসিক বিবরণ আছে তাতে দরবেশরাই হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নায়ক, কোন মুসলমান আমীরের উল্লেখ নেই। দরবেশরা গোড়া ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনৈতিক সমস্যার বিচার করতেন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে তাঁরা মুসলমান রাজ্য বিস্তারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন; পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাঁরা মুসলমান রাজ্যের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। স্বভাবতঃই উচ্চাভিলাষী হিন্দু নায়কদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ উপস্থিত হল।

নূর কুতব উল আলমের আমন্ত্রণে এবং সিমনানীর উপদেশে ইব্রাহিম বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। একজন বাংলাদেশী ঐতিহাসিক বলেছেন: 'রাজনীতিতে যাহার কোন আসক্তি ছিল না, যিনি পার্থিব ভোগবিলাসে বিমুখ, সেই জ্ঞানবৃদ্ধ দরবেশ নূর কুতব আলম যখন দেখিলেন যে দেশের মুসলমান আমীর উমরাহরা হৃতবল, তখন তিনি পার্শ্ববর্তী স্বাধীন রাজ্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে বাংলা দেশ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাইলেন। গণেশ কর্তৃক মুসলমানদের উৎপীড়ন, বিশেষ করিয়া মুসলমান দরবেশদের উপর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন।'[১০] কিন্তু গিয়াসউদ্দীন আজমের রাজত্বকালেও—যখন মুসলমানদের উপর উৎপীড়ন এবং দরবেশদের উপর অত্যাচার হয় নি—তিনি 'রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ' করেছিলেন। হিন্দুদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা উচিত কিনা—এটা রাজনৈতিক প্রশ্ন, সুলতানের বিচার্য, 'জ্ঞানবৃদ্ধ,

৮। আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস', ২৫৩ পৃষ্ঠা।
৯। তদেব, ২৫৯ পৃষ্ঠা।
১০। তদেব, ২৮৫ পৃষ্ঠা।

পার্থিব ভোগবিলাসে বিমুখ' দরবেশের বিচার্য নয়। সাধারণভাবে দরবেশরা 'রাজনৈতিক ব্যাপারে' নিস্পৃহ থাকলে ইব্রাহিম বাংলা আক্রমণ সম্বন্ধে সিমনানীর উপদেশ প্রার্থনা করতেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সুফী শাহ ওয়ালিউল্লা মৃতপ্রায় মোগল সাম্রাজ্য মারাঠাদের গ্রাস থেকে উদ্ধারের জন্য বিদেশী আহম্মদ শাহ আবদালীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

বাংলায় মুসলমান শাসন অব্যাহত রাখাই নূর কুতব উল আলমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। গণেশের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁকে জানালেন, ইব্রাহিমের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। গণেশ নিজে ধর্মত্যাগ করতে রাজি না হয়ে যদুকে ধর্মান্তরিত করে তাকে সিংহাসনে স্থাপন করার প্রস্তাব দিলেন। নূর কুতব উল আলম যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তার নাম দিলেন জলালউদ্দীন : তার নামে খোত্‌বা পাঠের ব্যবস্থা করা হল। অতঃপর নূর কুতব উল আলম ইব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই : 'আমি যখন অনুরোধ জানাইয়াছিলাম তখন একজন অত্যাচারী শাসক মুসলমানদের উপর নিপীড়ন করিতেছিলেন। এখন সুলতানের শুভাগমনের ফলে সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ আবশ্যক, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়।'[১১] বিধর্মীদের দমন করা ইব্রাহিমের অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, বাংলা দেশে রাজ্যবিস্তার করাই তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু নূর কুতব উল আলমের বিরোধিতা করে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা কঠিন হত। তাই ইব্রাহিম বিরক্ত এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে জৌনপুরে ফিরে গেলেন। পরে তিনি জলালউদ্দীনের রাজত্বকালে আবার বাংলা আক্রমণ করেছিলেন।

অনুমান করা যায় যে ইব্রাহিমের বারংবার বাংলা আক্রমণের সঙ্গে চীনে দূত প্রেরণের রীতির কিছু সম্বন্ধ ছিল। গণেশ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার পর এই রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল, জলালউদ্দীনের আমলে এটা চালু ছিল, পরে এটা বন্ধ হয়ে যায়। ১৪২০ সালে চীনের সম্রাট বাংলার সঙ্গে ইব্রাহিমের বিরোধে মধ্যস্থতা করার জন্য তাঁর দূতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হয়তো গণেশ ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই চীনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু চীন কিভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারত, বাংলা এবং জৌনপুরের বিরোধে চীন হঠাৎ নিজেকে জড়িত করবে কেন, এ সব প্রশ্নের কোন সংগত উত্তর পাওয়া যায় না। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে দূত বিনিময়ের সম্বন্ধ থাকতে পারে ; কিন্তু দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে গণেশ হঠাৎ বাণিজ্য বিস্তারের জন্য এত আগ্রহী হবেন কেন? গণেশের বংশের পতনের পর চীন দূত প্রেরণ করা বন্ধ করল, কিন্তু তার কোন কারণ জানা যায় না।

১১। ঐ, ২৫০ পৃষ্ঠা। ('রিয়াজ-উস-সালাতীনের' অনুবাদ)।

আপৎকালে উপায়ান্তর না দেখে গণেশ যদুকে ধর্মান্তরিত করে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। যদু তখন নাবালক; সম্ভবতঃ তার বয়স ছিল মাত্র ১২ বৎসর। তার পক্ষে রাজ্যশাসন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'সঙ্গীত শিরোমণি' বইর একটি উক্তির উপর নির্ভর করে এই ঘটনার অন্য রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে: 'ইব্রাহিম শর্কী সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলে রাজা গণেশের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। তাঁর সুচতুর পুত্র তখন সুযোগ বুঝে পিতার বিরোধী পক্ষে যোগ দেন এবং তাঁরা তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।' একজন নাবালকের পক্ষে এরূপ চতুরতা প্রদর্শন আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব। তাই বলা হয়েছে: 'সম্ভবতঃ নূর কুতব আলমের দলই গণেশ-নন্দনকে নানারকম কৌশল করে নিজেদের দলে টেনেছিলেন।'[১২]

সত্য ঘটনা যাই হোক না কেন, 'গণেশ-নন্দন' সিংহাসনে বসে পিতার হাতে ক্রীড়নক হয়ে ছিলেন। নূর কুতব উল আলমের এক চিঠিতে আছে: 'একজন কাফেরের বাচ্চা মুসলমান হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট, অথচ রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল একজন বিধর্মীর হাতে।'[১৩] ১৪১৫-১৬ সালে জলালউদ্দীনের নামে মুদ্রা প্রচারিত হয়েছিল, অর্থাৎ এই সময়ে তাঁকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রেখে গণেশ রাজ্য শাসন করছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ের মধ্যে নূর কুতব উল আলমের মৃত্যু হয়। তখন গণেশ শুদ্ধি ক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় পুত্রকে ধর্মান্তরিত করেন। 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' বলা হয়েছে: 'তাঁহার মিথ্যা ধর্মের অনুশাসন অনুসারে (গণেশ) কয়েকটি স্বর্ণনির্মিত গাভী তৈয়ার করেন, জলালউদ্দীনকে তাহাদের সম্মুখ ভাগে ঢুকাইয়া পশ্চাৎ দিকে বাহির করিয়া আনেন এবং পরে স্বর্ণগুলি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া দেন। এই ভাবে তাঁহার ছেলেকে স্বধর্মে পুনরায় দীক্ষিত করেন। জলালউদ্দীন দরবেশ কুতব আলম কর্তৃক দীক্ষিত হওয়ায় ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিলেন না এবং বিধর্মীদের প্ররোচনা তাঁহার অন্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।'[১৪]

শুদ্ধির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এই কাহিনীটি সম্ভবতঃ সত্য। গণেশের মৃত্যুর পর পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে 'যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার শুদ্ধি অনুষ্ঠানে স্বর্ণনির্মিত গাভীর অংশ পাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে গরুর মাংস খাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।'[১৫] কিন্তু শুদ্ধিকরণের পরেও সম্ভবতঃ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি হয় নি, আবার মুসলমান সমাজে ফিরে যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই গণেশের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণের আগে

১২। সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর', ১১৮-২০ পৃষ্ঠা।
১৩। আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস', ২৭২ পৃষ্ঠা।
১৪। তদেব, ২৫৪ পৃষ্ঠা।
১৫। তদেব, ২৭৩ পৃষ্ঠা।

তাঁকে আবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়।[১৬] ফিরিশ্তা বলেছেন: "পিতার মৃত্যুর পরে জিতমল রাজ্যের আমীর এবং ওমরাহদের ডাকিয়া বলিলেন 'ইসলাম ধর্মের সত্য আমার নিকট অতি পরিষ্কার এবং ইহা গ্রহণ করা ছাড়া আমার অন্য উপায় নাই। আপনারা যদি আমাকে গ্রহণ করেন এবং আমার সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা না করেন তাহা হইলে আমি এই মহান সিংহাসনে বসিব। অন্যথায় আমার ভাইকে রাজা হইতে দিন এবং আমাকে ক্ষমা করুন।' সকল অমাত্য এক বাক্যে ঘোষণা করিলেন, 'আমরা সাংসারিক ব্যাপারে রাজাকে অনুসরণ করি, ধর্মের ব্যাপারে আমাদের কিছু করণীয় নাই।' অতঃপর জলালউদ্দীন লখনৌতির জ্ঞানী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডাকিয়া কলেমা উচ্চারণ করিলেন এবং জলালউদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।"[১৭] মুসলমানদের রাজনৈতিক সমর্থন নিশ্চিত করার জন্যই পুনরায় 'কলেমা উচ্চারণ' করা এবং নূর কুতব উল আলমের দেওয়া নাম পুনরায় গ্রহণ করা আবশ্যক হয়েছিল।

সম্ভবতঃ ১৩১৬-১৭ সালে গণেশ পুত্রকে কারাগারে বন্দী করে নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 'দনুজমর্দনদেব' নামে মুদ্রা প্রচার করেন। এই ঘটনা জলালউদ্দীনের শুদ্ধিকরণের পূর্বে অথবা পরে ঘটেছিল তা সঠিক বলা যায় না, এর কারণও অনিশ্চিত। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, তাঁর পিতার রাজত্বের অবসান পর্যন্ত হতভাগা যদুকে সামাজিক দিক থেকে একবরে হয়ে কাটাতে হয়েছিল।[১৮] সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত পুত্রকে সিংহাসনে রাখা গণেশ রাজনৈতিক দিক থেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। হয়তো যদুর ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্তি, অথবা বিরোধী মুসলমান আমীরদের সঙ্গে গুপ্ত যোগাযোগ, তাঁর ক্রোধের কারণ হয়েছিল। 'সঙ্গীত শিরোমণি' বইতে যে ইঙ্গিত আছে তার পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায় 'রিয়াজ-উস-সলাতীনের' একটি উক্তিতে: 'কোন কোন বিবরণ মতে কারাগারে বন্দী জলালউদ্দীন তাঁহার পিতার চাকরদের সাহায্যে তাঁহাকে হত্যা করেন।'[১৯] আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, গণেশ বৃদ্ধ বয়সে শান্তিতে প্রাণত্যাগ করেন, জলালউদ্দীনের দ্বারা নিহত হন নি।[২০]

গণেশ-দনুজমর্দনদেবের রাজত্বকাল ১৩১৭-১৮ সাল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি—ফিরিশ্তার মতে—সুশাসক রূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের উপর অত্যাচার করলে তাঁর এই সুখ্যাতি মুসলমান ঐতিহাসিক

১৬। যদুনাথ সরকার সম্পাদিত *History of Bengal*, Volume II, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১২৭-২৮ পৃষ্ঠা।
১৭। আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস,' ২৭৬ পৃষ্ঠা।
১৮। *History of Bengal*, Volume II, ১২৭ পৃষ্ঠা।
১৯। আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস,' ২৫৫ পৃষ্ঠা।
২০। *History of Bengal*, Volume II, ১২৮ পৃষ্ঠা।

লিখে যেতেন না। সম্ভবতঃ মুসলমানদের সন্তুষ্টির জন্যই তিনি গৌড়ের ফতে খাঁর সমাধিভবন নামে পরিচিত সৌধ এবং পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে মুসলমানদের কোন বিদ্রোহ ঘটে নি। তবে তিনি যে প্রভাবশালী দরবেশদের শত্রুতা অর্জন করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, তিনি দরবেশদের জাগতিক স্বার্থে আঘাত করেছিলেন। ধর্মভীরু গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বকালে বহু দরবেশ তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, সাতগাঁ প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলের ইজারা নিয়ে তাঁরা জমিদার হতে চলেছিলেন। রাষ্ট্রের স্বার্থে, প্রজাদের স্বার্থে গণেশ তাঁদের এই অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন।[২১] সম্ভবতঃ দরবেশদের ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত মুসলমান আমীরদের এ বিষয়ে পরোক্ষ সমর্থন ছিল এবং দরবেশদের প্রতি ভক্তিমান মুসলমান জনসাধারণও এই নীতির বিরোধিতা করে নি।

সম্ভবতঃ এই কারণেই নূর কুতব উল আলম ইব্রাহিমের প্রস্থানের পরে গণেশের বিরোধিতা না করে নীরব ছিলেন। 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' বলা হয়েছে: "(যদুর শুদ্ধিকরণের পরে) রাজা কানস্ আবার দুর্ব্যবহার শুরু করিলেন এবং মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার উৎপীড়ন সীমা ছাড়াইয়া গেলে দরবেশ কুতব আলমের ছেলে শয়খ আনোয়ার তাঁহার পিতার নিকট অত্যাচারীর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলেন, 'ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আপনার মত শ্রেষ্ঠ দরবেশ থাকা সত্ত্বেও এই বিধর্মীর হাতে মুসলমানেরা উৎপীড়িত ও নিপীড়িত হইতেছে।' এই সময়ে দরবেশ গভীর ধ্যান ও প্রার্থনায় মগ্ন ছিলেন। ছেলের কথা শুনিয়া দরবেশ রাগান্বিত হইলেন এবং উত্তর দিলেন, 'মাটিতে তোমার রক্তপাত হইলে এই অত্যাচার বন্ধ হইবে।'... রাজা কানস্ তাঁহার নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচার আরও বাড়াইয়া দিলেন এবং এমন কি দরবেশের নিজের প্রতিপাল্য ব্যক্তি এবং চাকরদের উপরও অত্যাচার চলিতে লাগিল। তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি এবং মালপত্র লুণ্ঠন করা হইল এবং শয়খ আনোয়ার ও (দরবেশের ভ্রাতুষ্পুত্র) শয়খ জাহিদকে বন্দী করা হইল।...কানস্ উভয়কেই সোনারগাঁও-এ নির্বাসন দিলেন।.. (সেখানে) শয়খ আনোয়ারকে হত্যা করা হয়...কথিত আছে যে, যেই দিনে এবং যেই মুহূর্তে সোনারগাঁও-এ শয়খ আনোয়ারকে হত্যা করা হয় এবং তাঁহার পবিত্র রক্ত মাটিতে পতিত হয় রাজা কানস্ও তাঁহার সার্বভৌমত্ব হারাইয়া নরকে গমন করেন।"[২২] লক্ষ্য করার বিষয় এই যে নূর কুতব উল আলম এবং তাঁর পুত্র সম্পূর্ণ নিঃসহায় ছিলেন, তাঁদের কোন অনুগামী অত্যাচারী হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি। কিন্তু ঈশ্বরের অভিশাপ কানস্ এড়াতে পারলেন না; যখন দরবেশের পুত্র প্রাণ হারালেন ঠিক তখনই তিনি 'সার্বভৌমত্ব হারাইয়া নরকে গমন' করলেন।

২১। তদেব, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

২২। আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস', ২৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা।

মৃত্যুকালে গণেশের বয়স কত হয়েছিল জানা যায় না। তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক হয়েছিল কিনা সেটাও সন্দেহের বিষয়। তবে তিনি আরও কয়েক বৎসর বেঁচে থাকলে সম্ভবতঃ বাংলায় নবস্থাপিত হিন্দু রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করত। একজন বাংলাদেশী ঐতিহাসিক বলেছেন, 'তিনি যেইভাবে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসার যোগ্য।'[২৩] কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু রাজ্যে দরবেশদের মধ্যে ঐশ্বর্যলোভী শ্রেণী ছাড়া অন্য মুসলমানদের অসুবিধা হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। শক্তিশালী মুসলমান আমীরেরা বিদ্রোহী হন নি, ইব্রাহিম শর্কী বাংলা আক্রমণ করেন নি। বাংলায় রাজনৈতিক সমর্থন লাভের আশা থাকলে তিনি পুনরায় বিধর্মীকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হতেন, এমন অনুমান অবাস্তব নয়। সাধারণভাবে মুসলমান সমাজের সমর্থন নিয়ে গণেশ হিন্দুর রাজনৈতিক অধিকার পুনঃস্থাপন করেছিলো। ধর্ম, রাজনীতি এবং সামরিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি হিন্দু রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার ইতিহাসে নব যুগের সূচনা হত।

মৃত্যুকালে 'উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের প্রায় সমস্তটা এবং মধ্য বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের কতকাংশ' গণেশের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইলিয়াস শাহের মত তিনিও 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' ছিলেন, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা বাংলার বিভিন্ন অংশে শাসনক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলো না। তিনি 'প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বে অধিকারী এবং কুশাগ্রবুদ্ধি কূটনীতিজ্ঞ' ছিলেন, তা' না হলে মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত আধিপত্যের যুগে তিনি সিংহাসন অধিকার করতে পারতেন না। সমগ্র মুসলমান সমাজের না হোক, তার একটি বিরাট অংশের সমর্থন ছাড়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে এতখানি সাফল্য লাভ করা সম্ভব হত না।

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মৃত্যু (১৪১০) থেকে গণেশের মৃত্যু (১৪১৮) —এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলার ইতিহাসে বহু নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল। দরবেশদের চিঠি ছাড়া এই সকল ঘটনার কোন সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে লিখিত মুসলমান ঐতিহাসিকদের বইতে নানা বিষয়ে পার্থক্য আছে। গণেশ যে এক রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রধান নায়ক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর জীবনীসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি অমীমাংসিত রয়েছে। একজন বাংলাদেশী ঐতিহাসিক বলেছেন, ইব্রাহিম শর্কীর সঙ্গে যুদ্ধ না করে পুত্রের ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা কাপুরুষতার পরিচয়। 'সাহসের অভাব থাকিলে রাজত্বের মোহ থাকা উচিত নয়।' সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহাসিক বলেছেন, 'অবশ্য মুসলমান সেনানায়কেরা তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল।'[২৪] সম্ভবতঃ মুসলমান সেনানায়কেরা প্রকৃত পক্ষে তাঁর বিরোধী না

২৩। তদেব, ২১০ পৃষ্ঠা।
২৪। তদেব, ২৮৫ পৃষ্ঠা।

হলেও নূর কুতব উল আলম কর্তৃক আমন্ত্রিত মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সংকুচিত হয়েছিলেন। পশ্চিম বঙ্গীয় একজন ঐতিহাসিক বলেছেন, '... আমরা তাঁকে আদর্শ বীর বলব না; সেদিক দিয়ে শিবসিংহকে আদর্শ বীর বলতে পারি। তিনি প্রধানতঃ গণেশের জন্যই ইব্রাহিমের মত প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজে শোচনীয় পরিণাম বরণ করেছিলেন।'[২৫] অথচ গণেশ যুদ্ধ করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন। 'ইব্রাহিমের সঙ্গে গণেশ খুব বেশী যুদ্ধ করেছিলেন বলে মনে হয় না। মোটেও না করতে পারেন।' অন্যত্র তিনি বলেছেন যে 'যদু পিতার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইব্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন' এবং তখন 'গণেশ সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন।'[২৬] ঘটনা যেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন সেখানে গণেশকে কাপুরুষ বলা সংগত মনে হয় না।

গণেশ 'চণ্ডীচরণপরায়ণ' ছিলেন। নিজের মুদ্রায় তিনি একথা ঘোষণা করেছিলেন। শাক্তের পক্ষে স্বাভাবিক ক্ষাত্র ভাব তাঁর চরিত্রে প্রবল ছিল। দুশো বছর মুসলমানের অধীন থাকার পরেও বাঙালী হিন্দু সমাজে ক্ষাত্র ভাব বিলুপ্ত হয় নি, গণেশের দুঃসাহসিক রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টার সাফল্য সংহত করার সময় তিনি পান নি। তিনি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পদ্মনাভের (জীব গোস্বামীর পূর্ব পুরুষ) চরণ পূজা করতেন। সম্ভবতঃ এটা ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণের প্রতি ধর্মনিষ্ঠ রাজার শ্রদ্ধাপ্রকাশ, 'চণ্ডীচরণ-পরায়ণ' শাক্তের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ নয়। যাই হোক, গণেশের মৃত্যুর শতবর্ষ পরে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমভিত্তিক বৈষ্ণব ধর্মের বন্যায় বাংলাদেশ ভাসিয়ে দিলেন। ধর্ম হিসাবে শাক্ত মত বেঁচে রইল তান্ত্রিক সাধনা ও আচারের মধ্যে, কিন্তু গণেশ শাক্ত ধর্মের যে ভাবের প্রতীক ছিলেন সেটা বিলুপ্ত হল। গণেশ জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও কর্মে ছিলেন ক্ষত্রিয়—সুলতানী আমলে হিন্দুদের মধ্যে তিনিই শেষ ক্ষত্রিয়।

*　　　　*　　　　*

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রদেব সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই যদু (জলালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ) তাঁকে সরিয়ে দিয়ে পাকাপাকি ভাবে ক্ষমতা হস্তগত করেন। তাঁর রাজত্বকাল প্রায় ষোল বৎসর (১৪১৮—৩৩)। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কালে (১৪১৫) তিনি নাবালক ছিলেন, সম্ভবতঃ তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১২ বৎসর। সুতরাং অতি অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ইলিয়াস শাহীরা লখনৌতি (গৌড়) ছেড়ে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। জলালউদ্দীন রাজধানী গৌড়ে

২৫। সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর', ১৬৫ পৃষ্ঠা।
২৬। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস (মধ্য যুগ)', ৪৮ পৃষ্ঠা (সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখিত চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।'

স্থানান্তরিত করেন। সম্ভবতঃ ইলিয়াস শাহী রাজধানীর পরিবেশ তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর হয়েছিল।

জলালউদ্দীনের চরিত্রের দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল তার পিতৃদ্রোহিতা এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা। গণেশ তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পরে কারারুদ্ধ করেন, তিনিও খুব সম্ভবতঃ গণেশের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে তাঁকে চরম শাস্তি দেন। হিন্দু রাজাদের ইতিহাসে এ রকম ঘটনার অন্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এই অস্বাভাবিক সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে অসম্ভব।

'রিয়াজ-উস-সলাতীনের' মতে জলালউদ্দীন শুদ্ধি পর্বের পরেও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন নি, কারণ তিনি নূর কুতব উল আলম কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন। ১২ বৎসর বয়সের নাবালকের পক্ষে আকস্মিক ভাবে গৃহীত নতুন ধর্মের প্রতি এত অনুরাগ অস্বাভাবিক। নূর কুতব উল আলমের দীক্ষার কোন বিশেষ মাহাত্ম্য ছিল বলে মনে করার কারণ নেই। সম্ভবতঃ কোন কোন মুসলমান আমীর তাঁকে পিতার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার সুযোগ দেবার প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। হয়তো এই কারণেই গণেশ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন এবং পরে তিনি বন্দী অবস্থায় ঐ আমীরদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে পিতৃহত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাঁর চরিত্রে যে প্রতিশোধস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' বলা হয়েছে: 'সিংহাসনে বসার পর জলালউদ্দীন বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার শুদ্ধি অনুষ্ঠানে স্বর্ণনির্মিত গাভীর অংশ পাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে গরুর মাংস খাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।'[২৭]

যাই হোক, জলালউদ্দীন যে নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার সুলতানদের মুদ্রায় পূর্বে 'কল্‌মা' উৎকীর্ণ হত না; জলালউদ্দীন তাঁর মুদ্রায় 'কল্‌মা' খোদাই করান। তিনি মিশরবাসী খলিফার কাছে দূত পাঠিয়ে 'সম্মান পরিচ্ছদ' (robe of honour) এবং সনদ (deed of investiture) লাভ করেন। রাজত্বকালের শেষ দিকে তিনি 'খলীফত-উল্লাহ' (ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী) উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মক্কায় মাদ্রাসা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন এবং ঐ পবিত্র তীর্থের অধিবাসী জনসাধারণকে দান করার জন্য প্রচুর অর্থ প্রেরণ করেন। বাংলার অর্থ ভারতের বাইরে প্রেরণের এটাই বোধহয় প্রথম উদাহরণ। তাঁর সময়ে চীনা দূতদের যে ভোজ দেওয়া হয় তাতে গোমাংস পরিবেশন করা হয়েছিল, কিন্তু মুসলমান ধর্মের বিধানের মর্যাদা রক্ষার জন্য সুরা দেওয়া হয় নি।

জলালউদ্দীন 'রাজনীতিচতুর' শাসক ছিলেন। মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশেষ আনুগত্য দেখিয়েছিলেন। আবার

২৭। আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস,' ২৯৩ পৃষ্ঠা।

সাধারণ হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করলেও কোন কোন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে মোটামুটি ভাবে হিন্দু সমাজের বিরোধিতা প্রশমিত করেছিলেন। 'স্মৃতিরত্নহার' নামক গ্রন্থের লেখক বৃহস্পতি মিশ্রকে তিনি পর পর সাতটি উপাধি দেন ; শেষ উপাধি ছিল 'রায় মুকুটমণি'। শেষ উপাধি প্রদান উপলক্ষে 'খুব জাঁক করা হইয়াছিল। তাঁহাকে একগাছি হার দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে অনেক হীরামাণিক লাগান ছিল—তাহাতে যেন ঝলমল করিতেছিল। তাঁহাকে যে কুণ্ডল দেওয়া হইয়াছিল তাহাও ঝক্‌ঝক্‌ করিত। দুই হাতে রতনচূড় (ঊর্মিকা) দেওয়া হইয়াছিল ; তাহাতে দশ আঙ্গুলে দশটী আঙ্‌টী এবং তাহাতে হীরা লাগান ছিল। দুইটী ছাতা দেওয়া হইয়াছিল, অনেকগুলি ঘোড়া দেওয়া হইয়াছিল।'[২৮] কয়েকজন ব্রাহ্মণকে গোমাংস খাওয়ানো এবং একজন ব্রাহ্মণকে এরূপ সম্মান প্রদর্শন পরস্পরবিরোধী কাজ। যাই হোক, কৃতজ্ঞ রায়মুকুটমণি উপকারীর স্তুতিগানে পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে জলালউদ্দীন ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে অশ্ব, শকট, ভূমি, গাভী ইত্যাদি দান করে তাদের দারিদ্র্য দূরীভূত করে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আখ্যা পেয়েছিলেন।[২৯] এই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অত্যাচারের ভয়ে বহু হিন্দু তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে কামরূপে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু এ বিষয় রাজানুগ্রহে দারিদ্র্যমুক্ত ব্রাহ্মণেরা উল্লেখ করেন নি। রাজপ্রশস্তি রচনায় ব্রাহ্মণদের কোন কালেই উৎসাহের অভাব ছিল না।

বৃহস্পতি মিশ্র লিখেছেন, 'জলালউদ্দীন মূর্ধাভিষিক্ত কুলোৎপন্ন জগদত্তের পুত্র রায় রাজ্যধরের গুণরাশিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিয়োগ উপলক্ষে বিরাট আড়ম্বর অনুষ্ঠান করে তাঁকে হাতী, ঘোড়া, সোনা, রূপো, ছাতার সারি প্রভৃতি প্রদান করে তূর্য ও শঙ্খের ধ্বনিতে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন।' সম্ভবতঃ 'এই রকম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে হিন্দুর নিয়োগ আসলে বাস্তব অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ।'[৩০]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জলালউদ্দীনের দুটি কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, ইব্রাহিম শর্কী আবার বাংলা আক্রমণ করেন। তখন জলালউদ্দীন তৈমুরলঙের পুত্র শাহ রুখ এবং চীন সম্রাট য়ুং-লোর কাছে দূত পাঠান। তাঁরা ইব্রাহিমকে ভর্ৎসনা করায় আক্রমণকারী নিজ রাজ্যে ফিরে যান। এভাবে বাংলা দেশ উত্তর ভারতের প্রভুত্ব থেকে আত্মরক্ষা করে এবং বাংলার সুলতানের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মদেশের রাজা এবং আরাকানের রাজার মধ্যে সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে জলালউদ্দীন আরাকানকে সামন্ত রাজ্যে পরিণত করেন।

২৮। 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', দ্বিতীয় সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৮৪ পৃষ্ঠা।
২৯। আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস', ২৯৩ পৃষ্ঠা।
৩০। সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর', ১৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

অপরিণত বয়সে জলালউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র শমসুউদ্দীন আহম্মদ শাহ সিংহাসন লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুই ক্রীতদাসের ষড়যন্ত্রে নিহত হন (১৪৩৬)। তাঁর মৃত্যুতে রাজা গণেশের বংশের রাজনৈতিক প্রভুত্বের অবসান হল। সম্ভবতঃ জলালউদ্দীনের রাজত্বকালেই এই বংশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছিল।

পরবর্তী সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের সঙ্গে ইলিয়াস শাহী বংশের রক্তের সম্বন্ধ ছিল বলে মনে করার কারণ আছে। যাই হোক, তিনি ও তাঁর বংশধরগণ অর্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করেন।

নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকালে (১৪৩৬-৫৯) যশোহর-খুলনা অঞ্চলে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে ভাগলপুর-মুঙ্গের অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ উড়িষ্যা এবং ত্রিহুতের হিন্দু রাজাদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ঘটেছিল। তিনি চীন সম্রাটের কাছে দু'বার দূত পাঠিয়েছিলেন।

নাসিরউদ্দীনের পুত্র রুকনউদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৫-৭৬) 'বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান।' সম্ভবতঃ তিনি প্রথমে কয়েক বৎসর (১৪৫৫-৫৯) পিতার সঙ্গে এবং পরে কয়েক বৎসর (১৪৭৪-৭৬) শমসুউদ্দীন ইউসুফ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজ্যশাসন করেন। তিনি দক্ষিণে উড়িষ্যা, উত্তর-পূর্বে কামরূপ এবং পশ্চিমে ত্রিহুতে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করেন। পূর্ব বাংলায় বাখরগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর অধিকার প্রসারিত হয়।

বারবক শাহ নিজে পণ্ডিত ('ফাজিল', 'কামিল') এবং পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর অধীনে কয়েকজন উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ছিলেন। অনন্ত সেন ছিলেন তাঁর 'অন্তরঙ্গ' (চিকিৎসক), বিশ্বাস রায় ছিলেন তাঁর মন্ত্রী, কেদার রায় ছিলেন ত্রিহুতে তাঁর প্রতিনিধি, ভান্দসী রায় ছিলেন সীমান্তে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে একটি দুর্গের অধ্যক্ষ, নারায়ণ দাস ছিলেন অন্যতম চিকিৎসক। কিন্তু আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলমান।

কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তাতে এক 'রাজা গৌড়েশ্বরের' সভার বর্ণনা আছে। তিনি ঐ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং রাজা তাঁকে 'রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ।' রাজার সভায় তিনি কয়েকজন সভাসদ দেখেছিলেনঃ রাজার দক্ষিণে উপবিষ্ট জগদানন্দ, তাঁর পাশে উপবিষ্ট 'ব্রাহ্মণ সুনন্দ', 'বামেতে কেদার খাঁ ডাইনে নারায়ণ', 'রাজসভা-পূজিত' গন্ধর্ব রায়, 'সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্মাধিকারিণী' (বিচার বিভাগীয় কর্মচারী), 'মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর', 'জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর।' কোন মুসলমান সভাসদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ কৃত্তিবাসের বিবরণীতে নেই, 'গৌড়েশ্বরের' নামও নেই। কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধেও মতৈক্য নেই। সুতরাং এই 'গৌড়েশ্বর' কে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে তিনি বারবক শাহ; আবদুল করিমের মতে তিনি

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০)। সুকুমার সেনের মতে, কৃত্তিবাস হাজির হয়েছিলেন 'পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিকালে উত্তর বঙ্গের কোন রাজা-জমিদারের' দরবারে। রাজসভার বর্ণনা এবং সদস্যদের নামের তালিকা কোন মুসলমান সুলতানের দরবার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না। কোন হিন্দু রাজা বা জমিদার সম্বন্ধে অবশ্য 'গৌড়েশ্বর' উপাধি প্রযোজ্য হয় না, কিন্তু কবিরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের স্তুতিগানে অতিশয়োক্তি করতে দ্বিধা করতেন না। সুবুদ্ধি রায়কে 'গৌড় অধিকারী' বলা হয়েছে।

বারবক শাহ বহু আফগান সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং ৮,০০০ হাবশীকে আমদানি করে তাদের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে উচ্চ পদে নিয়োগ করেন। একজন বাংলাদেশী ঐতিহাসিক বলেছেন, 'হয়ত দুর্ধর্ষ হাবশীদের সাহায্যে তাঁহার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করিয়া রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।' কিন্তু কোন আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে বা সীমান্তবর্তী রাজার আক্রমণে তাঁর 'রাজ্যের স্থায়িত্ব' বিপন্ন হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। কাজটি বারবক শাহের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়; যাদের বাংলার সঙ্গে কোন যোগা-যোগ ছিল না এমন বিদেশীদের হাতে সামরিক ক্ষমতার বড় অংশ ছেড়ে দেওয়া রাজ্যের পক্ষে অমঙ্গলজনক হবে, এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাঁর মৃত্যুর এক দশক পরেই বিপদ এসেছিল।

বারবক শাহের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা, আমীরদের কোন্দল এবং হাবশী-দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাংলার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দিল। সুলতান জলালউদ্দীন ফতে শাহ প্রাসাদরক্ষীদের হাতে নিহত হন এবং তাদের হাবশী নেতা বারবক শাহজাদা (বা সুলতান শাহজাদা) সিংহাসন অধিকার করেন (১৪৮৭)। চার জন হাবশী সুলতান ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। হোসেন শাহ শেষ হাবশী সুলতানের উজীর ছিলেন। তাঁকে হত্যা করে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন (১৪৯৩)।

* * *

হোসেন শাহী বংশের রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫৩৮) মধ্য যুগের বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) নাম নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর রাজ্যের আয়তন বিশাল ছিল। 'বাংলা দেশের প্রায় সমস্তটা এবং বিহারের এক বৃহদংশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ভিন্ন কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ অন্ততঃ সাময়িকভাবে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।' হাবশী শাসনের অবসান করে তিনি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। হাবশীরা বাংলা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ ভারতে ও গুজরাটে চলে গেল; বাংলায় তাদের অত্যাচারের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দূর হল। হোসেন শাহ তুর্কী ও আফগানদের সৈন্য দলে নিয়োগ করে শক্তিশালী বাহিনী গঠন করলেন। দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী বিহার

আক্রমণ করেন ; কিন্তু যুদ্ধ হল না, সন্ধি স্থাপিত হল। কামতাপুর ও কামরূপ জয় করা হল। কামরূপে 'হোসেন শাহী পরগণা' নামে পরিচিত একটি অঞ্চল আছে। তার পূর্ব দিকে অহোম রাজ্য জয়ের চেষ্টা করে হোসেন শাহ ব্যর্থ হন। ত্রিপুরা এবং উড়িষ্যার হিন্দু রাজাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তিনি কতখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন তা' বলা কঠিন। সম্ভবতঃ আরাকান-রাজের সঙ্গেও তাঁর সংঘর্ষ ঘটেছিল। তাঁর মুদ্রায় তাঁকে 'কামরূপ-কামতা-জাজনগর-উড়িষ্যা-বিজয়ী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সামরিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই ; কিন্তু সাময়িক রাজ্যবিস্তারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুবই কম। যুদ্ধের ফলে প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' যে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ দেখা যায় তার সঙ্গে হয়তো দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের কিছু সম্বন্ধ ছিল।

হোসেন শাহের আমলের অনেক মুদ্রা ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবু তাঁর জীবনের ঘটনাবলী এবং তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সহজ নয়। সম্ভবতঃ তিনি সৈয়দবংশীয় ছিলেন এবং তাঁর পিতা তুর্কীস্তান থেকে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাংলায় এসে রাঢ় এলাকায় চাঁদপুরে (বা চাঁদপাড়ায়) বসতি স্থাপন করেন। তিনি জন্মসূত্রে বাঙালী ছিলেন, একথা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃতে' দেখা যায়, তিনি 'গৌড় অধিকারী' সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরি করতেন। তাঁর 'কাজে ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল।' সিংহাসনে আরোহণের পর হোসেন শাহের স্ত্রী তাঁকে অনুরোধ করলেন সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করার জন্য। তিনি বললেন, তাঁর 'পোষ্টা রায়' তাঁর 'পিতা', অতএব 'তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা।' 'স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।' শেষ পর্যন্ত সুলতান 'সংকটে' পড়লেন ; স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য 'করোয়ার পানি তার (সুবুদ্ধি রায়ের) মুখে দেয়াইলা।' সুবুদ্ধি রায়ের জাত গেল ; তিনি প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য কাশীতে গেলেন।

আর একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে হোসেন বাল্যকালে চাঁদপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের অধীনে রাখালের কাজ করতেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে মাত্র এক আনা খাজনায় গ্রামটির জমিদারী স্বত্ব দেন ; তাই গ্রামটি 'একানি চাঁদপাড়া' নামে পরিচিত হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তিনি ব্রাহ্মণকে গোমাংস খেতে বাধ্য করে তাঁর জাত নষ্ট করেন। দুটি কাহিনীতেই হোসেনের চরিত্রের একটি বিশেষ দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছে : স্ত্রীর অন্যায় আবদার অগ্রাহ্য করার মত মনের বল তাঁর ছিল না।

যাই হোক, হোসেন সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে বুদ্ধিবলে উচ্চতম স্তরে উঠেছিলেন এবং উজীরের পদ লাভ করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বিবরণে দেখা যায়, তিনি সিংহাসন অধিকারের জন্য 'নানা ধরনের ক্রূর কূটনীতি ও হীন

চাতুরীর আশ্রয়' নিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা দখলের পরে তিনি শাসন-দক্ষতার পরিচয় দেন এবং সামরিক ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি গৌড় থেকে একডালায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

হোসেন শাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন; সৈয়দ বংশীয় সুলতানের পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজকার্যে তিনি হিন্দুদের সহায়তা গ্রহণ করতেন। তাঁর সময়ে অনেক হিন্দু উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সকল উচ্চপদাধিকারীর মধ্যে প্রধান ছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত সনাতন ও তাঁর ছোট ভাই রূপ। সনাতন ছিলেন 'সাকর মল্লিক' ('সাকর মালিক' বা ছোট রাজা) এবং রূপ ছিলেন 'দবীর খাস' (প্রধান সেক্রেটারী)। উচ্চ পদ সনাতনকে রাজরোষ থেকে রক্ষা করতে পারে নি। তিনি উড়িষ্যা অভিযানে সুলতানের সংগে যেতে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি জানতেন যে সেখানে আক্রমণকারী সৈন্য দল হিন্দু মন্দির ধ্বংস করবে। এই অপরাধে হোসেন শাহ তাঁকে কারারুদ্ধ করে উড়িষ্যায় চলে যান। তার অনুপস্থিতিতে সনাতন কারারক্ষককে উৎকোচ দানে বশীভূত করে মুক্তিলাভ করেন এবং বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। রূপও মহাপ্রভুর উপদেশে সংসারবিরাগী হয়ে বৃন্দাবনে চলে যান। তাঁদের অবশিষ্ট জীবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আলোচনা ও ভাষ্য রচনায় অতিবাহিত হয়েছিল।

সনাতনের বড় ভাই রঘুনন্দন ও ছোট ভাই বল্লভ ('অনুপম মল্লিক') এবং তাঁদের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। কেশব বসু (খাঁ, ছত্রী) সুলতানের দেহরক্ষীদের নায়ক ছিলেন। উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত অন্যান্য হিন্দুর মধ্যে ছিলেন রামচন্দ্র খাঁ, যশোরাজ খাঁ, চিরঞ্জীব সেন, দামোদর, হিরণ্য দাস, কবিরঞ্জন বা কবিশেখর, গোবর্ধন দাস, গোপাল চক্রবর্তী প্রভৃতি। মুকুন্দ দাস ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। 'ইঁহারা সকলেই উচ্চপদধারী ছিলেন, সেইজন্য ইঁহাদের নাম বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়, ইহাতে বুঝা যায় যে নিম্নপদেও অনেক হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত ছিল, যাহাদের নাম পাওয়া যায় না।' মোটামুটি বলা যায়, হোসেন শাহ শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য ইলিয়াস শাহী আমলের রীতি অনুসরণ করেছিলেন। এতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যক্তিগত উদারতা এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শিতা প্রমাণিত হয় না। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' তাঁকে 'পরম দুর্বার যবন রাজা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুবুদ্ধি রায় এবং চাঁদপাড়ার ব্রাহ্মণের দুর্গতি ভুলে যাওয়া যায় না।

হোসেন শাহ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এই বহুলপ্রচলিত ধারণাটি ভিত্তিহীন। 'চৈতন্যভাগবতে' বলা হয়েছে, 'না করে পাণ্ডিত্য চর্চা রাজা সে যবন।' এখানে 'পাণ্ডিত্য চর্চা' অর্থে আরবী ও ফার্সী ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলা হয় নি, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলা হয়েছে। বাংলা দেশী ঐতিহাসিকেরা বৈষ্ণব সাহিত্যিকের এই সুস্পষ্ট

উক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন।[৩১] আবদুল করিম বলেছেন, 'হোসেন শাহী আমলকে বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁর যুগ বলা হয়, এই আমলের ৪৫ বৎসর সময়ে বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়।' তিনি বাংলাদেশী ঐতিহাসিক হাবিবুল্লাহর মত উধৃত করেছেন: 'It was a period in which the vernacular found its due recognition as the literary medium through which the repressed intellect of Bengal was to find its release'. কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর 'repressed intellect' হোসেন শাহী আমলের বহু পূর্বেই মুক্তি পেয়েছিল—কৃত্তিবাস এবং চণ্ডীদাস হোসেন শাহের সিংহাসন লাভের বহু পূর্বেই তাঁদের অমর কাব্য রচনা করেছিলেন।

হোসেন শাহের হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন সুকবি ছিলেন, কিন্তু 'এদের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণ বা অনুপ্রেরণা ছিল, এমন কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।' সুখময় মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তির বিরোধিতা করেছেন আবদুল করিম। তাঁর প্রথম বক্তব্য এই যে হোসেন শাহ তাঁর অমাত্যদের মধ্যে যাঁরা কবি ছিলেন তাঁদের 'অনেককেই উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন'—যেমন, সাকর মল্লিক, দবীর খাস, খাঁ ইত্যাদি। কিন্তু এই সব উপাধি শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সাহিত্যের সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ নেই। দ্বিতীয়তঃ, যশোরাজ খাঁ তাঁর এক ভণিতায় বলেছেন, 'শ্রীযুক্ত হুসায়ন। জগৎভূষণ। সেহ ইহ রস জান।' আবদুল করিমের মতে, এই উক্তিতে 'হোসেন শাহ কর্তৃক কাব্য রস আস্বাদনের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া এখানে যেই ভাবে হোসেন শাহের প্রশস্তি গাওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে যশোরাজ খান হোসেন শাহ কর্তৃক উৎসাহিত হইয়াছিলেন…।' যশোরাজের রচিত কোন কাব্য পাওয়া যায় নি, সুতরাং হোসেন শাহ কোন কাব্যের 'রস আস্বাদন' করতেন তা জানা যায় না। অমাত্যদের পক্ষে রাজার 'প্রশস্তি গাওয়া' সুপ্রচলিত রীতি। জগৎভূষণ রাজার কাছে কবি কাব্য রচনার পূর্বেই 'উৎসাহ' পেয়েছিলেন, কিংবা ভবিষ্যতে কাব্য রচনায় বা অপর কোন ক্ষেত্রে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন, সেটাও অনিশ্চিত।

বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে হোসেন শাহকে 'নৃপতি তিলক' বলা হয়েছে। এই কাব্যের যে রূপ এখন পাওয়া যায় তার রচনাকাল সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কাব্যটি হোসেন শাহের আমলে রচিত হয়েছিল, এমন কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। তাছাড়া আবদুল করিমই বলেছেন, 'বিজয় গুপ্ত হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।' বিপ্রদাস পিপিলাই খুব সম্ভবতঃ হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁর 'মনসা বিজয়' কাব্য রচনা করেন। তিনি লিখেছেন, 'নৃপতি হোসেন শাহ গৌড়ের প্রধান।' কিন্তু

৩১। আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস', [illegible] পৃষ্ঠা।

আবদুল করিমের মতে, 'সুলতান তাঁহাকে উৎসাহিত বা' সম্মানিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।'

হোসেন শাহের দুই সেনাপতি—পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ (নসরৎ খাঁ) - বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দু'জনেরই কর্মক্ষেত্র ছিল চট্টগ্রাম। পরাগল খাঁ 'পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি।' তাঁর 'আদেশ মালা মস্তকে' গ্রহণ করে 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পাঁচালী রচিল।' এই পাঁচালীই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাভারত। শ্রীকর নন্দী ছুটি খাঁর 'আদেশ মালা মাথে আরোপিয়া' নতুন 'পাঞ্চালী' রচনা করেন। দুটি কাব্যেই হোসেন শাহের 'প্রশস্তি গাওয়া' হয়েছে, কিন্তু কবিরা তাঁর কাছে উৎসাহ বা পুরস্কার পেয়েছিলেন এমন কোন ইঙ্গিত নেই।

*   *   *

হোসেন শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২)। 'প্রায় সমগ্র বাংলা দেশ, ত্রিহুত ও বিহারের অধিকাংশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ' তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। ত্রিহুত, ত্রিপুরা এবং আসামের রাজাদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ঘটেছিল।

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা করেন। মোগলদের সঙ্গে আফগানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত উত্তর ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাবর পূর্ব ভারতে আফগান-দের আধিপত্য ধ্বংস করার জন্য বিহার আক্রমণ করেন। এই উপলক্ষে নসরৎ শাহের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে বাংলার সৈন্যদল পরাজিত হয়। বাবর বাংলার দিকে অগ্রসর না হয়ে নসরৎ শাহের সঙ্গে সন্ধি করলেন, কারণ আফগানদিগকে দমন করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নসরৎ শাহ পশ্চিমে কিছু কিছু অঞ্চল হারালেন; ভবিষ্যতে বাংলাদেশ মোগল আক্রমণের লক্ষ্য-স্থল হবে, এই সম্ভাবনার উদ্ভব হল। মোগল শক্তির অভ্যুদয়ে ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হল।

হোসেন শাহের রাজত্বকালের শেষ দিকে পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামে উপস্থিত হয়ে বাংলায় বাণিজ্য শুরু করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। নসরৎ শাহের আমলে তারা আবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোন পাকাপাকি ব্যবস্থা হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হল।

নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফীরুজ শাহ অল্পদিন রাজত্ব করেন। তাঁকে হত্যা করে তাঁর কাকা (নসরৎ শাহের ছোট ভাই) গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি পর্তুগীজদিগকে তাঁর রাজ্যে ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দিয়ে বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্য, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের পথ উন্মুক্ত করেন। ফীরুজ শাহের হত্যার ফলে রাজ্যে অন্ত-র্বিরোধ সুরু হয়েছিল। আসাম আক্রমণের ব্যর্থতায় রাজ্যের সামরিক দুর্বলতা

প্রকাশিত হল। শেষে শের খাঁর আক্রমণে গিয়াসউদ্দীন পর্তুগীজদের সাহায্য নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তিনি পরাজিত হয়ে পরলোকগমন করলেন (১৫৩৮)। হোসেন শাহী বংশের অবসান হল।

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভাগ্যান্বেষী আফগান বীর শের খাঁ বিহারে আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁকে দমন করার জন্য বাবরের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী হুমায়ুন বিহার আক্রমণ করেন। গিয়াসউদ্দীনের পতনের পর বাংলা এই মোগল-আফগান সংঘর্ষে জড়িত হয়ে প্রথমে শের খাঁর, পরে হুমায়ুনের হস্তগত হল (১৫৩৮)। কিন্তু উত্তর ভারতে দুটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে (১৫৩৯-৪০) হুমায়ুন সাম্রাজ্য হারালেন এবং পারস্যের দিকে যাত্রা করলেন, শের খাঁ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন। তাঁর নতুন নাম হল শের শাহ। বাংলা নবস্থাপিত আফগান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশে পরিণত হল। ইলিয়াস শাহের আমল থেকে বাংলা যে স্বাধীনতা ভোগ করছিল তার অবসান হল।

* * *

শের খাঁর গৌড় অধিকার (১৫৩৮) থেকে আকবরের বাংলা জয় (১৫৭৬) পর্যন্ত বাংলার আফগান শাসনের স্থায়িত্বকাল ৩৮ বৎসর।

শের শাহ বাংলাকে কয়েকটি প্রশাসনিক এলাকায় ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন আমীরের হাতে তাদের শাসনভার দিয়েছিলেন। একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকলে তাঁর পক্ষে বিদ্রোহী হওয়া সহজ হবে—এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই দূরদর্শী সম্রাট এই ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি পূর্ব বাংলার সোনারগাঁও থেকে পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করান। ইংরেজ আমলে এই রাজপথের নাম ছিল 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।'

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ দিল্লীর সম্রাট হন (১৫৪৫-৫৩)। বাংলা তাঁর অধিকারে ছিল। তিনি পিতার ব্যবস্থা বাতিল করে বাংলায় একজন এবং বিহারে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর রাজত্বকালে কালিদাস গজদানী নামে উত্তর ভারতীয় এক রাজপুত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পূর্ব বাংলার এক অংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর আফগান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। দিল্লীতে বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বাংলায় পর পর তিন জন আফগান শাসক কয়েক বৎসর প্রভুত্ব করেন। ১৫৬৩ সালে তাজ খাঁ কররানী নামক আফগান জায়গীরদার নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হল; তখন তাঁর ভাই সুলেমান কররানী গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করলেন।

সুলেমান কররানীর রাজত্ব (১৫৬৫-৭২) দীর্ঘকাল স্থায়ী না হলেও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পররাষ্ট্র নীতি তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সামরিক শক্তির পরিচয় দেয়। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করতেন,

কারণ তিনি জানতেন যে মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে সাফল্য লাভ করা বাংলার আফগানদের পক্ষে অসম্ভব। 'শোন নদ ছিল মোগল অধিকার ও সুলেমানের অধিকারের সীমারেখা।' সুলেমান কার্যতঃ বাংলা ও বিহারের সার্বভৌম শাসক ছিলেন, উড়িষ্যাও তিনি জয় করেছিলেন। উত্তর ভারত থেকে মোগলদের ভয়ে অনেক আফগান বাংলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল, ফলে সুলেমানের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু আকবরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তিনি 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ না করে আফগান নায়কদের মত 'হজরত আলা' উপাধি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি কোচবিহার আক্রমণ করে মোটামুটি সাফল্য লাভ করেও রাজ্যটি অধিকার করার চেষ্টা করেন নি, সম্ভাব্য মোগল আক্রমণকালে হিন্দু রাজার সাহায্য পাবার আশায় তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন।

বাংলার সুলতানেরা এবং দিল্লীর সুলতান ফীরুজ শাহ তুগলক বারবার উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু হিন্দু রাজারা স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। সুলেমান সমগ্র উড়িষ্যা জয় করে বাংলা-বিহারের সঙ্গে যুক্ত করলেন (১৫৬৭-৬৮)। নানাবিধ রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও এই তিনটি প্রদেশের মধ্যে বার বার শাসনভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উড়িষ্যাবিজয়ী সেনাপতি কালাপাহাড় জগন্নাথের মন্দির ধ্বংস করেন এবং লুণ্ঠনের মাধ্যমে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়েছিলেন, এই কিংবদন্তী ভিত্তিহীন।

অস্বাস্থ্যকর গৌড় শহর পরিত্যাগ করে সুলেমান তাণ্ডায় নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

সুলেমানের মৃত্যুর (১৫৭২) পর তাঁর রাজ্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদ কররানী নিজের ভগ্নীপতি কর্তৃক নিহত হলেন। আমীরেরা এই ভগ্নীপতিকে হত্যা করে সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদ কররানীকে রাজ্যভার দিলেন। এই নির্বোধ, বদরাগী, মদ্যপায়ী যুবক পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে নিজ নামে খোত্‌বা পাঠ করেন এবং মুদ্রা জারি করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিহারে মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করে তিনি রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। আকবর সেনাপতি মুনিম খাঁকে বাংলা আক্রমণের আদেশ দিলেন। হয়তো দায়ুদ প্রকাশ্যে আকবরের বিরক্তি উৎপাদন না করলেও তাঁর পতন হত, কারণ (আবুল ফজলের মতে) সারা ভারতের অধীশ্বর হওয়াই আকবরের লক্ষ্য ছিল এবং সুলেমানের মৃত্যু সংবাদ জানার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পূর্ব দিকে রাজ্য বিস্তারের কথা ভেবেছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের বিপুল সামরিক শক্তির সম্মুখীন হয়ে আত্মরক্ষা করা দায়ুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বয়ং আকবর বিহারে মোগল বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিহার থেকে বিতাড়িত হয়ে দায়ুদ উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মুনিম খাঁ ও তোডরমলের নেতৃত্বে শেষ যুদ্ধ হল বাংলা এবং উড়িষ্যার সীমান্তে, সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থেকে ৯ মাইল

দূরে তুকরোই গ্রামে (৩ মার্চ ১৫৭৫)। সেখানে পরাজিত হয়ে দায়ূদ কটকের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তোড়রমল তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। শেষে জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নেই দেখে দায়ূদ আত্মসমর্পণ করলেন। মুনিম খাঁ তাঁকে আকবরের অধীন সামন্ত হিসাবে উড়িষ্যার শাসনভার দিলেন।

এই ব্যবস্থা অন্যান্য আফগান দলপতিরা মেনে নিল না। তাদের নেতৃত্বে আফগানেরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল; বিচ্ছিন্নভাবে মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলতে লাগল। কয়েক মাস পরে মহামারীতে মুনিম খাঁর মৃত্যু হল (অক্টোবর ১৫৭৫)। আকবর সেনাপতি খান-ই-জহানকে বাংলায় পাঠালেন, তাঁর সংগে থাকলেন তোড়রমল। ইতিমধ্যে দায়ূদ খাঁ উড়িষ্যায় মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি রাজমহলে গিয়ে অন্যান্য আফগান দলপতিদের সংগে মিলিত হয়ে খান-ই-জহানের অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টা করলেন। রাজমহলের যুদ্ধে (১২ জুলাই ১৫৭৬) তিনি পরাজিত ও বন্দী হলেন। তাঁর মাথা কেটে আকবরের কাছে পাঠানো হল।

দায়ূদ কররানীর পতনের ফলে বাংলায় সুলতানী আমলের অবসান হল, বাংলার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হল, বাংলা পাকাপাকি ভাবে দিল্লীর সার্বভৌম শক্তির অধীন একটি প্রদেশে পরিণত হল। ১৯৪৭ সালে বাংলার মুসলমান-প্রধান অংশ দিল্লীর কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে করাচীর কর্তৃত্বাধীন হল। তার ২৪ বৎসর পরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হল। মুসলমান সুলতানেরা বাংলায় রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেছিলেন; তাঁদের উত্তরসূরী মুসলমান নেতৃবৃন্দ সেই ঐক্যসূত্র বিচ্ছিন্ন করলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আজও আসে নি।

ইতিহাসের গতি অতি বিচিত্র, কিন্তু বহু শতকের ঘটনাবলী সতর্কভাবে পর্যালোচনা করলে কোন কোন ক্ষেত্রে অতীতে বর্তমানের বীজরোপণ লক্ষ্য করা যায়। পৌনে চারশো বৎসরব্যাপী সুলতানী আমলে রাজা গণেশের দুই বংশধর বাদে বাঙালী মুসলমান কখনও সিংহাসনে বসেন নি, সব সুলতানই ছিলেন বহিরাগত অথবা বহিরাগতের বংশধর। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে কতজন প্রকৃত বাঙালী মুসলমান ছিলেন তা বলা যায় না। অভিজাত মুসলমান সমাজে এবং সম্মানিত পীর ও দরবেশদের মধ্যে বহিরাগতদের একাধিপত্য ছিল। হিন্দু সমাজের যে বিরাট অংশ নানাকারণে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছিল তার পক্ষে সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা সম্ভব হয় নি। দিল্লীর রাজনৈতিক আধিপত্য স্বীকার না করলেও সুলতানী আমলের বাংলা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের (যাদের মধ্যে অনেকেই তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান, ইরান এবং আরব থেকে এসেছিল) প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। মোগল আমলেও এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটে নি, ইংরেজ আমলেও নয়। যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম সেই রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্ব অবাঙালী মুসলমানদের হাতেই ছিল।

তার পূর্বেও মুসলমান নেতারা—স্যার সৈয়দ অাহম্মদ, সৈয়দ আমীর আলি প্রভৃতি—অবাঙালী মুসলমান ছিলেন। স্যার নাজিমউদ্দীন এবং সুরাবর্দী মূলতঃ উর্দুভাষী অবাঙালী মুসলমান ছিলেন। কেবলমাত্র ফজলুল হক ছিলেন বাঙালী মুসলমান, কিন্তু চাল্লিশের দশকে পূর্ব বঙ্গের মুসলমান সমাজ তাঁকে নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত করেছিল।

পাঞ্জাবী মুসলমানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিলাভের সাফল্যমণ্ডিত প্রয়াস পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানের পক্ষে একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং অনৈতিহাসিক পদক্ষেপ। এখানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে নি, ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশী ঐতিহাসিক হাবিবুল্লাহ বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলেছেন যে এটি হোসেন শাহের আমলে ছিল 'the literary medium through which the repressed intellect of Bengal was to find its release.'[১২] 'Repressed' শব্দটি খুবই অর্থবহ। সমগ্র সুলতানী আমল সম্বন্ধে, এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে, এটি প্রযোজ্য। কেবল যে 'intellect'ই 'repressed' ছিল তা' নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সুযোগ এবং প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগের অভাব ছিল। মুসলমান সমাজের বহিরাগত অংশ এই সুযোগের ক্ষেত্রে একাধিপত্য করত; হিন্দু সমাজ এই সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। সুলতানদের ব্যক্তিগত খেয়াল বা রাজনৈতিক প্রয়োজনে কয়েকজন হিন্দু উচ্চ পদ লাভ করেছিল বটে, কিন্তু তাতে সামগ্রিক ভাবে হিন্দু সমাজের 'repressed' শক্তি 'released' হয় নি। এখন বাংলাদেশে বাঙালী মুসলমান সমাজ সামগ্রিক ভাবে আত্মশক্তি বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার হলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

হিন্দুদের প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ না দিয়ে মুসলমান শাসকেরা নিজেদের দুর্বল করে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' এই ঋষি-বাক্য শুধু হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে নয়, মুসলমান রাজার সঙ্গে হিন্দু প্রজার সম্পর্ক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুদের সম্বন্ধেও কবির এই বাণী শাসক মুসলমানদের স্মরণ রাখা উচিত।

সংখ্যার দিক থেকে যারা প্রধান, যাদের বিরাট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল, যাদের সামরিক শক্তি স্বাধীনতা হারাবার পরেও নিঃশেষ হয়ে যায় নি, তাদের দূরে সরিয়ে রেখে মুসলমান রাষ্ট্র শক্তি সঞ্চয়ের একটি প্রধান উৎস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছিল। দিল্লীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার সময় ইলিয়াস শাহ হিন্দু পাইকদের এবং সেনানায়ক সহদেবের অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছিলেন। রাজমহলের যুদ্ধে সেনানায়ক শ্রীহরি দায়ুদ কররানীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে-

১২। যদুনাথ সরকার সম্পাদিত *History of Bengal*, Vol. II, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

ছিলেন, কিন্তু আফগান দলপতি কতলু খাঁও এই হিন্দু বিশ্বাসঘাতকের সহযোগী ছিলেন। বাংলার সুলতানেরা বিহারে, আসামে এবং উড়িষ্যায় বহু যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও কোন হিন্দু তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে বলে জানা যায় না।

সুলতানী আমলে হিন্দুদের দূরে সরিয়ে রাখার দুটি প্রধান কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ, বিজিতের উপর বিজেতার বিশ্বাসের অভাব স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে, হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করার ফলে, এই অবিশ্বাস দূর হতে পারত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কোন কোন হিন্দু উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাদের অবস্থা কতখানি অনিশ্চিত ছিল সেটা হোসেন শাহের আমলের দুটি ঘটনা থেকে খানিকটা অনুমান করা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন যে সুবুদ্ধি রায় 'পূর্বে গৌড় অধিকারী' ছিলেন, কিন্তু হোসেন শাহ এরূপ সম্মানিত হিন্দুর জাতি নষ্ট করেন। তাঁর বিশ্বাসভাজন সনাতনকে সামান্য অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ করেন। দণ্ডিত অমাত্যের নিকট আত্মীয়েরা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সাহস পান নি। তিনশো বৎসর মুসলমান শাসনের পরেও যদি হিন্দু সমাজের পদস্থ ব্যক্তিদের এমন অসহায় অবস্থায় থাকতে হয় তবে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, 'মুসলমান সুফীরা মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের উচ্চ পদে নিযুক্তির বিরোধী ছিলেন।'[৩৩] সমগ্র মুসলমান সমাজের উপর সুফীদের প্রবল প্রভাব ছিল। কেবল সুফীরা নয়, মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও আইনের ব্যাখ্যাকারগণ (ulama, theologians) হিন্দুদের সম্বন্ধে বহিষ্কার নীতির প্রবক্তা ছিলেন। যে জিয়াউদ্দীন বরনীর 'তারিখ-ই-ফীরুজশাহী' বইটি বাংলার সুলতানী আমলের ইতিহাস রচনার একটি অপরিহার্য উপাদান তিনি বলেছেন, 'যাকে ধর্মের ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় না (অর্থাৎ যে বিধর্মী) তাকে রাজ্যের ব্যাপারেও বিশ্বাস করা যায় না।'[৩৪] বাংলার মুসলমান শাসকেরা এই নীতি অতিক্রম করতে পারেন নি।

৩৩। আবদুল করীম, 'বাংলার ইতিহাস,' ২৪২ পৃষ্ঠা।

৩৪। A. C. Banerjee, *The State and Society in Northern India*, ১৭ পৃষ্ঠা।

২

সুলতানী আমল (২)

১। ইসলাম ধর্মের প্রসার

বখ্‌তিয়ার খলজীর স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্বকালেই বাংলায় মুসলমান সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর অনুগামী আমীর ও সৈন্যেরা নববিজিত রাজ্যে বসতি স্থাপন করে। পরে নানা কারণে উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমান বাংলা দেশে প্রবেশ করে। হয়তো বাণিজ্য উপলক্ষে পশ্চিম এশিয়া থেকে যে সব মুসলমান চট্টগ্রাম বন্দরে আসত তাদের মধ্যে কেহ কেহ এদেশেই থেকে যেত। কিন্তু এটা নিশ্চিত ঐতিহাসিক সত্য যে অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর। ১৮৭১ সালের সেন্‌সাস গণনায় সর্বপ্রথম দেখা গেল যে পূর্ব বাংলার সকল জেলায় এবং উত্তর বাংলার বৃহত্তর অংশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। তার ঐতিহাসিক পরিণতি পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম।

সুলতানী আমলে ইসলাম ধর্মের প্রসারের দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমতঃ, মুসলমান শাসকদের পক্ষে বিজিত দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলাম ধর্মাবলম্বী একটি সমাজ পত্তন করা অত্যাবশ্যক ছিল। বিধর্মীরা ছিল প্রবলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, নতুন শাসকদের প্রতি তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিরোধিতার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এই বিরোধিতা দমন করার জন্য সামরিক শক্তিই প্রধান অস্ত্র ছিল, কিন্তু জনসমাজের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী একটি গোষ্ঠির সহযোগিতার মূল্যও কম ছিল না। মোহাম্মদ বিন তুগলক যখন দেবগিরিতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন তখন তিনি দিল্লী থেকে বহু আমীর ও রাজকর্মচারীকে এবং মুসলমান জনতার একাংশকে সেখানে যেতে বাধ্য করেছিলেন। তখন দক্ষিণ ভারতে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। বিপুলসংখ্যক হিন্দুর পাশাপাশি থাকতে হলে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি অত্যাবশ্যক

ছিল। বাংলার মুসলমান সুলতানেরা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। উত্তর ভারত থেকে মুসলমান আমদানি করে এর সমাধান সম্ভব ছিল না, সুতরাং স্থানীয় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে মুসলমান সমাজ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হল।

দ্বিতীয়তঃ, ইসলাম ধর্ম প্রত্যেক মুসলমানকে এই শিক্ষা দেয় যে বিধর্মীকে সত্য ধর্মে দীক্ষা দেওয়া তার আবশ্যিক কর্তব্য। ইসলামের শাস্ত্রভিত্তিক আইন অনুসারে মুসলমান রাজ্যের অমুসলমান অধিবাসীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে অথবা জিজিয়া কর দিয়ে প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ক্রয় করতে হবে। ভারতবর্ষের মুসলমান রাজারা এই নীতি অনুসরণ করতেন, তবে বাংলায় হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করার প্রমাণ নেই। বাংলায় এবং অন্য প্রদেশে নানাভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হত, বহু হিন্দু স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে স্বধর্ম ত্যাগ করত। মুসলমান দরবেশরা ধর্মপ্রচারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন, তাঁদের সহায়তা করত মুসলমান রাষ্ট্রের শাসননীতি।

এই দুটি সাধারণ কারণ সমগ্র ভারতেই ইসলাম ধর্ম প্রচারে সহায়ক হয়েছিল, কিন্তু কেবলমাত্র দুটি প্রদেশ (পাঞ্জাব ও বাংলা) বাদে অন্য কোন প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে নি। আবার এই দুটি প্রদেশেই তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আঞ্চলিকঃ পাঞ্জাবে পশ্চিমাংশে, বাংলায় পূর্বাংশে। অন্যান্য প্রদেশ থেকে দুটি প্রদেশের এই পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজন। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অতি সরল, কল্পনা-ভিত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন।

বাংলাদেশী ঐতিহাসিক আবদুল করিম বলেছেন, 'নির্যাতিত বৌদ্ধ ও শূদ্ররা মুসলমান সুফী-সাধকদের চরিত্রে এবং মুসলমানদের বর্ণবৈষম্যহীন সমাজ-ব্যবস্থায় মুগ্ধ হইয়া ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়।'[১] এটি একটি প্রচলিত ধারণার পুনরুক্তি মাত্র, একটি a priori সিদ্ধান্ত; এর সমর্থনে কোন যুক্তি উত্থাপন করা হয় নি। ইসলাম ধর্মের প্রতি 'নির্যাতিত' বৌদ্ধ ও শূদ্রদের আকর্ষণ কেন পূর্ব বাংলায় এবং উত্তর বাংলার বৃহত্তর অংশে সীমাবদ্ধ ছিল তা' তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। 'নির্যাতিত' বৌদ্ধ ও শূদ্র রাঢ় অঞ্চলেও ছিল, 'মুসলমান সুফী-সাধকদের' আস্তানার অভাবও এই অঞ্চলে ছিল না; কিন্তু পশ্চিম বাংলায় হিন্দুর সংখ্যাধিক্য দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান শাসনকালে ক্ষুণ্ণ হয় নি।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বিষয়টির অপেক্ষাকৃত বিশদ আলোচনা করেছেন।[২] তিনি বলেছেনঃ 'হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নানা অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিত। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যতা

১। 'বাংলার ইতিহাস', ৫২৬ পৃষ্ঠা।

২। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্য যুগ), ২১২-১৪ পৃষ্ঠা।

অনুসারে রাজ্যে ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না।' এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি একটি মাত্র উদাহরণ দিয়াছেন: 'বখতিয়ার খিলজীর একজন মেচ জাতীয় অনুচর গৌড়ের সম্রাট হইয়াছিলেন।' এই ব্যক্তির নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। রাজা গণেশের পুত্র জলালউদ্দীনের নাম তিনি বলেন নি। চাকুরির লোভ যে বহু হিন্দুর ধর্মত্যাগের একটি প্রধান কারণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 'ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্তুগীজ পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসা বাংলা দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে রাজ-অনুগ্রহ পাইবার জন্য প্রতি দিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।'[৩] বাংলাদেশী ঐতিহাসিক লিখেছেন: 'সংস্কৃতের পরিবর্তে (রাজভাষা) ফার্সী ভাষা শিখিলেই রাজ-সরকারে চাকুরী পাওয়া যায়।' একথা সত্য হলে চাকুরি লাভের জন্য কোন হিন্দুর স্বধর্ম ত্যাগের প্রয়োজন হত না, কারণ ফার্সী ভাষা পড়ার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অপরিহার্য ছিল না। হিন্দুদের রাজকার্য থেকে বঞ্চিত রাখার নীতি মুসলমান শাসকেরা অনুসরণ করতেন; এই নীতি ধর্মপ্রচারের একটি প্রধান অস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হত।

মুসলমান রাজত্ব স্থাপনের দুশো বছর পরে হোসেন শাহের আমলে কয়েকজন হিন্দু উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশী ঐতিহাসিক বলেছেন: 'ইলিয়াস শাহী আমল হইতে বাংলা দেশের হিন্দুরা উচ্চ পদে নিযুক্ত হইত, পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানেরাও পূর্ববর্তী সুলতানদের নীতি অনুসরণ করিতেন এবং হোসেন শাহ এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া হিন্দুদিগকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন।'[৪] এই উক্তির কোন প্রমাণ তিনি উপস্থিত করেন নি। তাঁর বইতে অধিকাংশ পৃষ্ঠায় পাদটীকার মাধ্যমে সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, যে পৃষ্ঠায় এই উক্তিটি আছে সেই পৃষ্ঠাতেও দুটি পাদটীকা আছে, কিন্তু এই উক্তি সম্বন্ধে কোন পাদটীকা নেই। পশ্চিম বঙ্গীয় একজন ঐতিহাসিক বলেছেন: 'সব সময়ে সমস্ত কাজের জন্য যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাওয়া যেত না বলে হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা অনেকদিন আগে থেকেই চলে আসছিল— রুকনুদ্দীন বারবক শাহের আমলেও বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হোসেন শাহ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সুলতানদের প্রথা অনুসরণ করেছিলেন।'[৫] রুকনউদ্দীন বারবক শাহ বখ্‌তিয়ার খলজীর আড়াইশো বছর পরে বাংলার সিংহাসনে, আরোহণ করেন; এই দীর্ঘকালে হিন্দুদের 'উচ্চ রাজপদে' প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শাসনকার্যের তাগিদে, অথবা রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, অথবা শাসকের ব্যক্তিগত উদারতা বা অনুগ্রহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শাসিত সম্প্রদায়ের

৩। 'The Heathen of these parts daily become Moors to gain the favour of their rulers'. (*The Book of Duarte Barbosa*, tr. M.L. Dames, Vol. II, p. 147).

৪। আবদুল করিম, 'বাংলার ইতিহাস', ৪০৫ পৃষ্ঠা।

৫। সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর', ৫০১-২ পৃষ্ঠা।

ব্যক্তিবিশেষকে অথবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠিকে 'উচ্চ রাজপদে' নিয়োগ করা হতে পারে, কিন্তু কিছু কিছু ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত। ইংরেজ আমলে বহু ভারতীয় 'উচ্চ রাজপদে' নিযুক্ত হয়েছেন, কিন্তু তার ফলে শাসক জাতির একাধিপত্য কতটুকু ক্ষুন্ন হয়েছিল? সুলতানী আমলে চাকুরি সম্বন্ধে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের কি অবস্থা ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বারবোসার নিরপেক্ষ উক্তিতে পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, 'মুসলমানদের বর্ণ-বৈষম্যহীন সমাজ-ব্যবস্থায়' পশ্চিম বাংলার 'নির্যাতিত বৌদ্ধ ও শূদ্ররা' কেন 'মুগ্ধ' হল না তার কোন কারণ বাংলাদেশী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেন নি। আর মুসলমানদের সমাজ-ব্যবস্থা 'বর্ণ-বৈষম্যহীন' ছিল, এই কথাটিও ঠিক নয়। 'সৈয়দ' (যাঁরা হজরত মোহাম্মদের কন্যা ফাতিমার বংশধর বলে দাবি করেন), 'আলিম' (পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী), 'শেখ', 'পীর' প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র রূপে সমাজের উচ্চস্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আব্বাস বংশীয় খলিফাদের সময় থেকে সৈয়দেরা সমাজে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিয়া সম্প্রদায়ের বিস্তৃতির ফলে এই মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ শিয়ারা ফাতিমার স্বামী আলী এবং তাঁদের বংশধরদিগকে খিলাফতের প্রকৃত অধিকারী বলে মনে করত। তৈমুর দিল্লী আক্রমণ কালে সৈয়দ এবং ধর্মীয় শ্রেণীভুক্ত মুসলমানদের রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী সরকারী রাজস্ব অপহরণকারী এক সৈয়দকে তার প্রাপ্য শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেন, এমন কি তাকে ঐ অপহৃত অর্থ ফেরৎ দিতে বাধ্য করেন নি। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণরা যে রকম সুবিধা ভোগ করত সৈয়দেরা মুসলমান সমাজে সেই রকম সুবিধা ভোগের অধিকারী ছিল। এই সুবিধা তারা লাভ করত জন্ম সূত্রে, কোন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের স্বীকৃতি রূপে নয়। ইউরোপে যাজকরা নানা রকম সুবিধা ভোগ করত, কিন্তু যাজকের পদ বংশগত ছিল না। সাধারণ ভাবে বলা যায়, সামাজিক দিক থেকে সৈয়দরা ছিল একটি বংশগত জাতি। ব্রাহ্মণরা উপবীত ধারণ করত, সৈয়দরা একটি বিশেষ ধরণের টুপি মাথায় দিত।

ইসলাম ধর্মে পুরোহিত বা গুরুর স্থান নেই, কিন্তু বাস্তব জীবনে 'শেখ', 'পীর' প্রভৃতি ব্যক্তিদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। সুফীরা ধর্মজীবনে অগ্রসর হবার জন্য 'পীর' বা 'মুরশিদ' নামে পরিচিত গুরুর নির্দেশ মান্য করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করত। পীরের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি হিন্দুদের গুরু-ভক্তির সঙ্গে তুলনীয়। প্রথমে কোন ব্যক্তি ধর্মজীবনে উন্নতি লাভ করে পীর বলে স্বীকৃতি লাভ করত। এটা ছিল একটি বিশেষ কারণে একটি বিশেষ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। ক্রমে এই প্রথা ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করে বংশকে বিশেষ মর্যাদার আসনে উন্নীত করল। হিন্দু সন্ন্যাসীদের মত পীরদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। পীরের পুত্রকে 'পীরজাদা' বলা হত, ধর্মজীবনে তার কৃতিত্ব থাকুক

যা না থাকুক সে পিতার প্রাপ্য মর্যাদার অধিকারী হত। দিল্লীর সুলতান বহলুল লোদীর রাজত্বকালে বড় বড় আমীরেরা পীরজাদাদের কাছে মাথা নত করে রাখতেন, পীরজাদারা ইচ্ছা করলে সেই মাথার উপরে বসতে পারতেন। শেখদের বংশধরদের বলা হত 'মখদুমজাদা' বা 'শেখজাদা'। মুসলমান সমাজে শেখজাদার স্থান ছিল অনেকটা হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের স্থানের মত।

সৈয়দ, পীর, পীরজাদা এবং ধর্মের রীতিনীতি যারা ব্যাখ্যা করত তাদের সাধারণ ভাবে 'উলেমা' বলা হত। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী উলেমা শ্রেণীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—যারা সাংসারিক প্রলোভন থেকে দূরে থাকত এবং যারা পার্থিব ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত হত। 'তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ' বইতে বলা হয়েছে ঃ 'উলেমা পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী।...তাঁরা মর্যাদায় এবং শ্রেণীবিন্যাসে অন্য সকলের চেয়ে অনেক উপরে। রাজারাও এ দিক থেকে তাঁদের নীচে।'

বিশেষ সুবিধাভোগী আর একটি শ্রেণী ছিল অভিজাত-বংশীয় ব্যক্তিরা ('উমরা') - যারা বড় বড় সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত হত, বড় বড় জায়গীর ভোগ করত, ঐশ্বর্য আর জাঁকজমক যাদের জনসাধারণ থেকে পৃথক করে রাখত।

মুসলমান সমাজের নিম্নতম স্তরে ছিল ক্রীতদাস। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রীতদাসেরা উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হত, সিংহাসনও অধিকার করত। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভাগ্য পরিবর্তন থেকে বিরাট ক্রীতদাস শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হিন্দুদের দাসত্বে পরিণত করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হত। আফ্রিকা এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে বহু ক্রীতদাস আমদানি করা হত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা হত। দিল্লী প্রভৃতি শহরে দাসদের বেচাকেনার জন্য বাজার ছিল। আলাউদ্দীন খলজী বিভিন্ন শ্রেণীর দাসদের বাজার দর স্থির করে দিয়েছিলেন। দিল্লীতে ফীরুজ শাহ তুগলকের প্রাসাদে ৪০,০০০ ক্রীতদাস ছিল। মুসলমান সমাজে ক্রীতদাস ছিল মালিকের সম্পত্তি। রাজা কোন অভিজাত ব্যক্তির ক্রীতদাসকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক হলে তিনি মালিককে ঐ ক্রীতদাসের মূল্য বাবদ অর্থ দিতেন। ক্রীতদাসের নিজস্ব কোন সম্পত্তি অর্জনের অধিকার ছিল না। মুসলমান ক্রীতদাসদের তুলনায় হিন্দু সমাজে চণ্ডালদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। তারা নিজ নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হত না, তারা নিজের বাড়ীতে বাস করত এবং নিজের সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করত। হিন্দু সমাজে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের নিজ নিজ জাতির মধ্যে নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা ছিল।

হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের মত মুসলমান সমাজের নিম্নস্তরেও বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণী ছিল। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে এদের বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায়—গোলা, জোলা, মুকেরি (যারা বিক্রেয় জিনিষ আনা নেওয়ার জন্য বলদ ব্যবহার করত), পিঠারি, কাবারি (মৎস্য বিক্রেতা অথবা

কসাই), সানাকার, হাজাম, তীরকর, কাগজী (যারা কাগজ তৈরী করত), বেনটা (যারা বয়ন করত), রংরেজ (যারা রঙ লাগাত), হালান, কসাই। এই সব পেশায় নিযুক্ত অসংখ্য মানুষ 'বর্ণ-বৈষম্যহীন' মুসলমান সমাজে কতখানি মর্যাদা ভোগ করত ?

উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে জাতিভিত্তিক বিভেদ প্রবল ছিল। খলজীরা মূলতঃ তুর্কী হলেও দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাসের ফলে তারা খাঁটি তুর্কীদের কাছে মর্যাদা পায় নি। জলালউদ্দীন খলজী তুর্কী জাতীয় গিয়াস-উদ্দীন বলবনের বংশের হাত থেকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে জিয়াউদ্দীন বরনী বলেছেন: 'তুর্কীরা চির কালের জন্য রাজশক্তি হারাল।' পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বহলুল লোদীর নেতৃত্বে পাঠান বা আফগানেরা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) জয়লাভ করে বাবর মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে শের শাহ আফগান-প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের (১৫৫৬) ফলে দিল্লীতে আবার মোগল-শাসন প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু বাংলায় এবং উড়িষ্যাতে আকবরকে দীর্ঘকাল আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মোগলরা ছিল তুর্কীজাতীয়।

তুর্কী, পাঠান এবং আরবজাতীয় সৈয়দ ও শেখ শ্রেণীভুক্ত উচ্চ স্তরের মুসলমানেরা নিম্নস্তরের মুসলমানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করত না। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার মত সামাজিক বৈষম্য মুসলমান সমাজেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু মুসলমান সমাজে এই বৈষম্যের কঠোরতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

বহিরাগত মুসলমান এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মধ্য যুগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুলতানী আমলে একজন মাত্র ভারতীয় মুসলমান দিল্লীতে উজীরের পদ লাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও দিল্লীতে মোগল দরবারে ইরানী, তুরানী এবং হিন্দুস্থানী ওমরাহদের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

জিয়াউদ্দীন বরনী উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান এবং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যের উপর জোর দিয়েছেন। 'উলেমা' শ্রেণীর প্রতিনিধি এই ঐতিহাসিক নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের প্রতি তাঁর সুস্পষ্ট অবজ্ঞা গোপন করেন নি। ধর্মান্তরিত হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান বলে গণ্য হত। অভিজাত মুসলমান সমাজে তাদের স্থান ছিল না, উচ্চ রাজপদে তাদের অধিকার ছিল না। কয়েকজন উচ্চ পদস্থ মুসলমান রাজকর্মচারীর অনুরোধ সত্ত্বেও গিয়াসউদ্দীন বলবন একজন হিন্দু ক্রীতদাসের ধর্মান্তরিত পুত্রকে কেরানীর পদে নিযুক্ত করতে স্বীকৃত হন নি।

মুসলমান সমাজ প্রকৃতপক্ষে 'বর্ণ-বৈষম্যহীন' ছিল না এবং ধর্মান্তরিত হিন্দুরা সেই সমাজে বহিরাগত মুসলমানদের তুলনায় নিম্নস্তরে থাকত, এই দুটি

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মান্তরিত হিন্দুরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের হিন্দু পূর্বপুরুষদের কথা গোপন করে তুর্কী বা পাঠানের বংশধর বলে দাবি করত। সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরে প্রবেশের এরূপ প্রচেষ্টা কেবল মধ্য যুগে নয়—বর্তমান যুগেও লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উর্দুকে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল। অবস্থাপন্ন বাঙালী মুসলমানেরা বিহার এবং উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষী মুসলমানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত। এই হীনমন্যতা দীর্ঘকালের অর্ধবিস্মৃত স্মৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল। বাঙালী মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা ইরানী-তুরানী-আফগানিস্তানী ভাগ্যান্বেষীদের কাছে যোগ্য মর্যাদা পায় নি, তাই কৌশলে বিদেশীদের সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশের জন্য চেষ্টা করেছে। ইংরেজ আমলেও বাঙালী মুসলমান সেই দুঃস্বপ্নের জট থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারে নি।

'সুফী-সাধকদের চরিত্রে আকৃষ্ট' হয়ে বাংলার হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এই মতটি কতদূর গ্রহণযোগ্য তার আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সুফীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে—সিন্ধু, পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলে। যে সব নেতৃস্থানীয় সুফীর নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাওয়া যায় তাঁদের সঙ্গে সুদূর বাংলার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। বিহারে এবং বাংলায় সুরাবর্দী সম্প্রদায়ের সুফীদের একটি শাখা—'ফিরদৌসী' নামে পরিচিত—মুসলমানদের মধ্যে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুলতানী আমলের যে সকল দরবেশকে সাধারণভাবে সুফী আখ্যা দেওয়া হয় তাঁরা সকলেই প্রকৃত অর্থে 'সাধক' শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, 'অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা মুসলমান শাস্ত্রমতে পুণ্যকার্য বলিয়া বিবেচিত হইত', রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু 'সুফীগণ এই বিষয়ে অতিশয় তৎপর ছিলেন', তাঁর এই মন্তব্য ইতিহাসসম্মত নয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক মোহাম্মদ হবীব বলেছেন, 'মুসলমান অতীন্দ্রিয়বাদীরা (mystics) ধর্মপ্রচারকে তাঁদের কর্তব্যের অংশ বলে মনে করতেন না। কোন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে কোন অতীন্দ্রিয়বাদী কর্তৃক ধর্মান্তরীকরণের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র পরবর্তী কালের জাল গ্রন্থ সমূহে (fabrications) অতীন্দ্রিয়বাদীদের দ্বারা ধর্মান্তরীকরণের কাহিনী পাওয়া যায়।' বলা আবশ্যক, 'অতীন্দ্রিয়বাদী' শব্দটি হবীব সুফীদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছেন। চিশ্‌তী সম্প্রদায়ের প্রথম নেতা খাজা মুইনউদ্দীন দীর্ঘকাল আজমীরে বাস করেন। রাজস্থানের ঐ অঞ্চলে কুতবউদ্দীনের আমলেই তুর্কী প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেনি। আজমীর এখনও মুসলমানদের একটি প্রধান তীর্থ। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চিশ্‌তী সম্প্রদায়ের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নায়ক নিজামউদ্দীন আউলিয়া দিল্লীতে বাস করতেন। তিনি বলেছেন, হিন্দুরা কোনক্রমেই তাদের ধর্ম ত্যাগে রাজি নয়।

মজুমদার বলেছেন : 'সুফীদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন এবং ধর্মনীতি অনুসরণ করিয়া জীবন-যাপন করিতেন। তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত।' খাজা মুইনউদ্দীন এবং নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুপরিচিত সুফী সাধক শেখ ফরিদ বলেছেন, এমন অনেক মানুষ আছে যারা সুফীর পোষাক ব্যবহার করে, সুমিষ্ট কথা বলে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে থাকে ছুরি। এই মন্তব্য শিখদের ধর্মশাস্ত্র 'আদি গ্রন্থে' উদ্ধৃত হয়েছে। 'আদি গ্রন্থে' গুরু নানকের একটি বাণী আছে : 'শেষ মুহূর্তে যন্ত্রণাভোগের আতঙ্কে শেখ এবং পীর কাঁদে।' শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু শেখ এবং পীরদের মধ্যে অনেকের ভোগলিপ্সা এবং দুর্নীতিপরায়ণতা সম্বন্ধে এই ইঙ্গিত করেছিলেন।

সাধারণতঃ চিশ্‌তী সম্প্রদায়ের সুফীরা ভোগে অনাসক্ত ছিলেন, কৃচ্ছ্রসাধন তাঁদের ধর্মজীবনের অঙ্গ ছিল। কিন্তু সুরাবদী সম্প্রদায়ের সুফীরা এই আদর্শ ত্যাগ করে রাজসিক জীবনযাপনের রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা রাজদরবার এবং অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করতেন এবং জনসাধারণকে দূরে রাখতেন। সুতরাং তাঁদের 'চরিত্রে' এবং 'উপদেশে ও দৃষ্টান্তে' আকৃষ্ট হয়ে অনেক হিন্দু স্বধর্ম ত্যাগ করত, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। পূর্বেই বলা হয়েছে, সুরাবদী সম্প্রদায়ের ফিরদৌসী শাখা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল।

নক্‌সবন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত সুফীদের মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষ প্রবল ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই সম্প্রদায়ের নায়ক শেখ সৈয়দ আহম্মদ ফারুকী সির-হিন্দী বলেছিলেন, 'ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য কাফেরদিগকে অপমান করা অত্যাবশ্যক। তাদের কুকুরের মত দূরে সরিয়ে রাখা উচিত।'

সুফীদের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে তাঁরা ছিলেন উদার মতাবলম্বী, নীতিপরায়ণ ও আদর্শচরিত্র সাধক। সুফীদের মধ্যে এই শ্রেণীর সাধক অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু অনেকেই সুফীর পোষাকের আড়ালে ছুরি লুকিয়ে রাখত; সোনার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে খাদ মিশ্রিত ছিল। আবার সুফীদের মধ্যে পাঁচটি প্রধান শাখা ছিল—চিশ্‌তী, সুরাবর্দী, সত্তরী, কাদিরী, নক্‌সবন্দী। এদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সকল সুফীর প্রতি প্রযোজ্য কোন সাধারণ মন্তব্য করা কঠিন। সুন্নী মত যে উলেমারা কঠোর ভাবে অনুসরণ করত তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুফীদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম সম্বন্ধ ছিল। সাধারণতঃ উলেমারা সুফীদের অপছন্দ করত।

সামগ্রিক ভাবে সুফীরা ইসলাম ধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। অনেক হিন্দু সুফীদের খানকায় যেত এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করত, কিন্তু এরূপ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু হিন্দু খ্রীস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, তাঁদের পরিচালিত স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করত।

অনেক হিন্দু ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, ব্রাহ্ম সমাজে প্রার্থনায় উপস্থিত থাকত। এদের মধ্যে কত জন খ্রীস্ট ধর্ম বা ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিল?

পীর, দরবেশ এবং নিম্নস্তরের সুফীরা চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। তাদের কার্যপদ্ধতিতে চরিত্রমাহাত্ম্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তির চেয়ে কৌশলের প্রাধান্য ছিল। আচার্য মজুমদার লিখেছেন: 'মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে বাংলায় তান্ত্রিক ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিত যে তান্ত্রিক সাধু বা গুরুর বহুবিধ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত এবং তাঁহাদের বাসস্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইত। মুসলমানেরা বাংলা জয় করিবার পর অনেক সুফী দরবেশ ও পীর এই সব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের বাসস্থানেই দর্গা প্রতিষ্ঠা করিতেন। ক্রমে পীরগণও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিত পীরেরা ইচ্ছা করিলেই লোকের দুঃখদুর্দশা মোচন করিতে পারেন, মৃত লোককে বাঁচাইতে পারেন, আবার জীবন্ত মানুষকেও জাদুবলে মারিতে পারেন, একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারেন। ফলে তান্ত্রিক সাধুর শিষ্যেরাও অনেকে স্থানমাহাত্ম্য এবং এই সব অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পীরের দর্গায় আসিত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত।'

কালিকা রঞ্জন কানুনগো লিখেছেন: মুসলমান যোদ্ধারা পূর্বে অনেক হিন্দু মন্দির এবং বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেছিল, ধর্মপ্রচারক মুসলমান 'সন্তরা' সেই সব বিধ্বস্ত স্থানে দর্গা ও খানকা তৈরী করত। এভাবে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হত: হিন্দুরা ও বৌদ্ধরা তাদের মন্দির ও মঠ নতুন করে তৈরী করতে পারত না, এবং স্থানমাহাত্ম্য ক্রমে হিন্দুদের সেই সকল দর্গা ও খানকায় টেনে আনত। ক্রমশঃ তারা হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর স্মৃতি ভুলে গিয়ে নতুন ধর্মের প্রচারকদের অনুগত হত এবং স্বধর্ম ত্যাগ করত।[৬] কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমান 'সন্তরা' যে বাহুবলে রাজ্য অধিকার ও ধর্মপ্রচার করতেন সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

'বাংলা দেশে বৌদ্ধ পাল রাজত্বের সময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার ফলে অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ সমাজের নিম্ন স্তরে পতিত হয়। তাহারা মুসলমানদিগকে ত্রাণকর্তা বলিয়াই মনে করিত। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্যই দেবতারা মুসলমানের মূর্তিতে ভূতলে আসিয়াছেন।' আচার্য মজুমদারের এই মন্তব্যের ভিত্তি 'ধর্মপূজা বিধান' নামক 'গ্রন্থে' একটি ছড়া। এই ছড়ার নাম 'নিরঞ্জনের উষ্মা'। তাঁর মতে 'ধর্মপূজা বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়াছে এবং তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্য মতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এখনও পশ্চিম বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে।'

৬। যদুনাথ সরকার সম্পাদিত *History of Bengal*, Vol. II, ৬১ পৃষ্ঠা।

এই মন্তব্যটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি বিতর্কিত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র।[৭] সেই বক্তব্যের মূল কথা: 'ধর্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্মের শেষ।' আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: '...ধর্মপূজা মূলতঃ একটি অনার্য অনুষ্ঠান। বহু পূর্বে, সম্ভবতঃ তুর্কী আমলেরও পূর্বে, বাঙ্গালার কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ইহা বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট হইলেও, আদিতে ইহা স্বতন্ত্র অনার্য লোকধর্ম রূপেই প্রচলিত ছিল।'

ধর্মপূজা বাংলায় কোন্ সময়ে প্রবর্তিত হয়েছিল বলা কঠিন। ধর্মপূজার প্রথম প্রবর্তক বলে উল্লিখিত রামাই পণ্ডিত এক মতে ১৩০০ খ্রীস্টাব্দের, অন্য মতে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের লোক। সুকুমার সেনের মতে, 'পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে ধর্মপূজার কোন উল্লেখ বা বিবরণ বাঙ্গালা সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই।' 'ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গলাদি কাব্যে শুধু ধর্মঠাকুরের বন্দনা পাওয়া যায়।' রামাই পণ্ডিতের জন্মকাল যদি পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে হত তবে ধর্মপূজার উল্লেখ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সাহিত্যে থাকত, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। প্রকৃতপক্ষে 'রামাই পণ্ডিতের কাহিনীর যদি কিছু ঐতিহাসিকত্ব থাকে তবে তাহা উচ্চগ্রামের হোমিওপ্যাথিক মাত্রায়; তাহা হইতে ইতিহাস গঠন করা যায় না, উপন্যাসের পরিকল্পনা হইতে পারে।'[৮]

'শূন্যপুরাণ' নামে একখানি 'গ্রন্থ' রামাই পণ্ডিতের রচনা বলে পরিচিত। তিনটি পুঁথির পাঠ মিলিয়ে এই গ্রন্থটি প্রস্তুত হয়েছিল, তার কোনটিতেই গ্রন্থের নাম ছিল না, 'শূন্যপুরাণ' নাম দিয়েছিলেন সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু। 'পুঁথিগুলি ধর্মঠাকুরের পুরোহিত বা পুরোহিতগণের পদ্ধতি বা সংগ্রহ গ্রন্থ, কোন মতেই পুরাণ নহে।' তিনটি পুঁথির একটিতে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামে ছড়াটি পাওয়া যায়। এর 'ভাষা অর্বাচীন'; সুকুমার সেনের মতে এর রচনা-কাল অষ্টাদশ শতাব্দী 'হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।' এই ছড়াটির রূপান্তর 'ধর্মপূজা বিধান' নামে পরিচিত গ্রন্থেও পাওয়া যায়, সেখানে এর নাম 'কলিমা জালাল।' আচার্য মজুমদার 'ধর্মপূজা বিধান' গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে ছড়া-টির যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন সেটি প্রকৃতপক্ষে আছে 'শূন্যপুরাণে', 'ধর্মপূজা বিধানে' কিছু পাঠভেদ আছে। 'শূন্য পুরাণের' পাঠ নীচে উদ্ধৃত হল।

ব্রাহ্মণেরা যার কাছে দক্ষিণা না পায় তাকে শাপ দেয়, 'সদ্ধর্মীরে (বৌদ্ধকে) করয়ে বিনাশ।' নির্যাতিত বৌদ্ধরা ধর্মের আশ্রয় প্রার্থনা করল—'তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ।' ধর্ম বৈকুণ্ঠে থেকে 'মনেতে পাইয়া মর্ম মায়াতে হইল খনকার (খোন্দকার)।'

৭। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', দ্বিতীয় সম্ভার, ৩৯৯-৪২০ পৃষ্ঠা।

৮। সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম সংস্করণ, বট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম হইলা যবনরূপী মাথায় ত কাল টুপি,
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়,
খোদায় বলিয়া এক নাম।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার,
মুখেত বলয়ে দম্বদার।[৯]
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা এক মন
আনন্দে ত পরিল ইজার।
ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর,
আদম্ভ হইল শূলপাণি
গণেশ হইল কাজী, কার্তিক হইল গাজী,
ফকির হইল যত মুনি।
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেখ
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে,
সভে মিলি বাজায় বাজনা।
আপনি চণ্ডিকা দেবী তিঁহ হৈলা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হৈল বিবি নূর।
যতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে,
পাখড় পাখড়[১০] বোলে বোল।

আচার্য মজুমদার বলেছেন, 'ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত প্রাক্তন বৌদ্ধগণ মুসলমানদিগকেই হিন্দুর উপাস্য দেবতার স্থানে বসাইয়াছিল (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল), উক্ত কবিতায় তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে' কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, 'এই কবিতাটি কোন সময়ের রচনা তাহা জানা নাই।' কবিতাটিতে রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছেঃ 'রামাঞি পণ্ডিত গায়।' রামাই পণ্ডিত কোন সময়ের লোক ঠিক নেই, এই নামের কোন লোক কবিতা-টির লেখক কিনা সেটাও অনিশ্চিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, 'রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয় মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বেশী পরেও নয়। মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের জব্দ করিয়াছিল দেখিয়া ধর্মঠাকুরের দল খুসী হইল, অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।' 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বলেছেনঃ '(ছড়াটি) পাঠ করিলেই

৯। দমদাদার (পীরের নাম)।
১০। অর্থাৎ পাকড়াও পাকড়াও।

মনে হইবে যে, এই অংশ মুসলমান প্রভাবের ফল। রামাই পণ্ডিতের নাম দিয়া পরবর্তী লেখকের রচনা।'

'বেশী পরেও নয়'—এই কথাটি অনুমান মাত্র। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ধর্মপূজার কোন উল্লেখ নেই, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'শূন্যপুরাণ' এবং 'ধর্মপূজাবিধান'—দুটি গ্রন্থেই 'ত্রিকচ কামান' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। উত্তর ভারতে মুসলমান আক্রমণকারীরা দুর্ভেদ্য দুর্গের দেওয়াল বিধ্বস্ত করার জন্য নানারকম যন্ত্র ব্যবহার করত, কিন্তু কামান তৈরী করার প্রথা প্রচলিত হয় নি। বাবর যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) কামান ব্যবহার করেন সেটা ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের একটি প্রধান কারণ। সুলতান ফীরুজ শাহ তুগলক একডালা দুর্গ আক্রমণকালে কামান ব্যবহার করেন নি। সুতরাং উক্ত কবিতাটি কামানের ব্যবহার সুপ্রচলিত হলে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা যায়। সুলতানী আমলের আদি যুগে 'প্রাক্তন বৌদ্ধদের' ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রমাণ রূপে এটি ব্যবহার করা যায় না।

আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিতাটিতে বর্ণিত ঘটনার স্থান জাজপুর (উড়িষ্যা): 'জাজপুর পুরবাসী। ষোল শত ঘর বসি। বসিল যে কেবল দুর্জন।' সেখানেই মুসলমানরূপী দেবতাগণ 'দেউল দেহারা ভাঙ্গে। কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে। পাখড় পাখড় বোলে বোল।' এই উক্তিতে হোসেন শাহের উড়িষ্যা অভিযানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উড়িষ্যার 'মাদলা পঞ্জী' এবং বাংলার চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে তিনি সেখানে বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত সচিব সনাতন উড়িষ্যা অভিযানে তাঁর সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি দেবতার নির্যাতন স্বচক্ষে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুকুমার সেনের মতে, ফীরুজ শাহ তুগলক চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'উড়িষ্যায় যে বিদ্যুৎগতি অভিযান করিয়াছিলেন তাহারই স্মৃতি' উক্ত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' ছড়াটিতে স্থান পেয়েছে।

যাই হোক, উড়িষ্যার অধিবাসী 'জাজপুর পুরবাসী' সম্বন্ধে যে উক্তি সেটা বাংলা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না। উড়িষ্যার সংলগ্ন পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলে (এবং উড়িষ্যার জাজপুর অঞ্চলে) 'প্রাক্তন নির্যাতিত বৌদ্ধরা' যে 'মুসলমানদিগকে ত্রাণকর্তা বলিয়া মনে' করে নি, এই দুই অঞ্চলে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাধিক্যই তার প্রমাণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে রামাই পণ্ডিতের জাজপুর উড়িষ্যায় নয়—'ইহা বঙ্গে—রাঢ়ে।'[১১] এই অনুমান সত্য হলেও 'প্রাক্তন বৌদ্ধদের' সঙ্গে মুসলমান আক্রমণকারীদের সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না।

১১। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিলপুরাণ' কাব্যে দেখা যায় যে উড়িষ্যার অন্তর্গত জাজপুরই ধর্মঠাকুরের পীঠস্থান ছিল। 'শূন্যপুরাণ' অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা হতে পারে, এই সম্ভাবনা মনে রাখলে সহদেব চক্রবর্তীর বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে হবে।

পূর্ব বাংলায় (যেখানে মুসলমানদের প্রবল সংখ্যাধিক্য) ধর্মপূজার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুগলী-বর্ধমান অঞ্চলে অনেকগুলি ধর্মমঙ্গল রচিত হয়েছিল, কিন্তু পূর্ব বাংলায় রচিত এমন কোন গ্রন্থের সন্ধান নেই।

ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের গোঁড়ামিতে অনেক হিন্দু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হত। মুসলমানের পৃষ্ট ভোজ্য বা পানীয় গ্রহণ করলে হিন্দুর জাতি নষ্ট হত, তখন তার পক্ষে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকত না। নূর কুতব উল আলম এক বিচিত্র পদ্ধতিতে যদুকে মুসলমান করেছিলেন। তিনি নিজের মুখ থেকে চর্বিত পানের সামান্য অংশ সেই নাবালক হিন্দুর মুখে দিলেন, তৎক্ষণাৎ সে মুসলমান হয়ে গেল। 'চৈতন্য চরিতামৃতে' হোসেন শাহ কর্তৃক সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে মুসলমানের পাত্র থেকে জল খেতে বাধ্য করা হয়েছিল: 'করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা।' তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে কাশীতে গিয়ে পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইলেন। এক দল পণ্ডিত বললেন, তাঁকে তপ্ত ঘৃত খেয়ে প্রাণত্যাগ করতে হবে। আর এক দল বললেন, অল্প দোষে এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধেয় নয়। তখন শ্রীচৈতন্য কাশীতে যান এবং সুবুদ্ধি রায়ের কাহিনী শুনে তাঁকে বৃন্দাবনে গিয়ে 'নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন' করতে বলেন। সাধারণ হিন্দুর পক্ষে হিন্দু সমাজে বাস করে এভাবে পাপ খণ্ডন করা সম্ভব হত না। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালে 'কৃষ্ণনাম সংকীর্তন' করে মুক্তিলাভের নির্দেশ প্রচারিত হয় নি।

যবনস্পর্শে জাতিচ্যুতির কুফল সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ সচেতন হয়েছিল। অদ্ভুতাচার্যের 'রামায়ণে' বলা হয়েছে: 'বল করি জাতি যদি লএত যবনে/ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে/প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জনে।' দেবীবর ঘটকের বিধানে 'যবন-দোষে' দুষ্ট ব্রাহ্মণ বংশ (অর্থাৎ যে পরিবারের কোন কুলস্ত্রী মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে) ব্রাহ্মণ সমাজে স্থান পেয়েছে। আরাকানী মগদের অত্যাচার সম্বন্ধেও এরকম ব্যবস্থা ছিল। 'আবার পিরালী, শেরখানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের মত কোন কোন পরিবার জাতিভ্রষ্ট হইয়াও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে নাই।' দেবীবর বিভিন্ন 'দোষে' দুষ্ট বিভিন্ন ব্রাহ্মণ বংশকে বিভিন্ন 'মেল' বা শ্রেণীতে বিভক্ত করে ব্রাহ্মণ সমাজকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই উদারতা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল কিনা তা' জানা যায় না, কারণ 'কুলজী' বইগুলিতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যবন স্পর্শে হিন্দু জাতিচ্যুত হইত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত।'

বিভিন্ন কারণে যে সকল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ধর্মান্তরিত হত তারা পয়গম্বরে বিশ্বাস রাখত, নমাজ পড়ত এবং রোজা পালন করত; কিন্তু পূর্ব সংস্কার তারা সম্পূর্ণ ভুলতে পারত না। ফলে ইসলামের মূলতত্ত্ব বিরোধী নানারকম প্রথা

মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছিল। 'মোল্লা' নামে পরিচিত এক নতুন পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হল। 'ইহারা হিন্দুদের পুরোহিতের মতন গ্রামবাসীর নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠান এবং বিবাহাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করিত। লোকের গলায় পুঁতি ঝুলাইয়া তাহাকে ভূতের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে কসাইয়ের ব্যবসা অর্থাৎ মুরগী, বকরী ইত্যাদি জবাই করিত। এই সমুদয় হইতে যে অর্থ লাভ হইত তাহাই ছিল তাহাদের উপজীব্য।' নানারকম পীরের (সত্যপীর, মাণিকপীর, ঘোড়াপীর, কুমীর পীর, মদারী অর্থাৎ মৎস্য ও কুমীর পীর) পূজা প্রচলিত হল।

একজন মুসলমান লেখক মহাভারতের বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে ॥[১২]

নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানেরা আরবী জানত না, ধর্মতত্ত্ব তাদের অজানা ছিল; চাকুরি পাবার আশায় কেহ কেহ সামান্য ফার্সী শিখত। যে মোল্লাদের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন ব্যাপারে যোগাযোগ ছিল তারাও ইসলামের মূল কথা এবং ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। ফলে গল্প ও কাহিনী শোনার স্বাভাবিক আগ্রহ পূরণের জন্য তারা হিন্দুদের ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হত।

উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান সমাজেও এই আকর্ষণ সংক্রামিত হয়েছিল। যে পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন তিনি 'নিত্য' পুরাণ শুনতেন, মহাভারতের কাহিনী শুনতে উৎসুক ছিলেন।

কুতুহল বহুল ভারতকথা শুনি
কোন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী।

পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। এই পৃষ্ঠপোষক সম্বন্ধে কবি বলেছেন ঃ

পণ্ডিতে মণ্ডিত সভা খান মহামতি
একদিন বসি আছে বান্ধব সংহতি।
শুনিল ভারতগাথা অতি পুণ্যকথা
মহামুনি জৈমিনির পুরাণ সংহিতা।
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়।

এই দুজন মুসলমান আমীর হিন্দুদের 'পুণ্যকথা' শুনতে যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে ধর্মসম্বন্ধে উদারতা এবং সাহিত্যপ্রীতি ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু 'কুতুহল'ও ছিল—যে 'কুতুহল' ইসলামী ঐতিহ্য থেকে তৃপ্ত করা সম্ভব ছিল না।

১২। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ২০৫-০৬ পৃষ্ঠা। "সোঙরে" অর্থ স্মরণ করে।

২। হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ

পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে সুলতানী দরবারে আগত চীনা দূতেরা লক্ষ্য করেছিলেন যে বাংলা দেশের অধিবাসীরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—মুসলমান ও হিন্দু। তাদের মধ্যে পার্থক্য এত সুস্পষ্ট ছিল যে সেটা বিদেশীদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। মুসলমানদের প্রাধান্যও তারা উল্লেখ করেছেন: 'সুলতান ও ছোটবড় অমাত্যেরা সকলেই মুসলমান।'

রাজনীতি, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা দুই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছিল। হিন্দুদের রাজকার্যে নিয়োগ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এক রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে গণেশ সাময়িকভাবে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি পুত্রকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে বাধ্য হয়েছিলেন। হিন্দুর রাজত্ব স্থাপনের গুজব শুনলেও মুসলমান সমাজে বিক্ষোভ উপস্থিত হত। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে, নবদ্বীপে এইরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রচার হওয়ায় সুলতানের আজ্ঞায় নবদ্বীপে যে কী ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল তাহা প্রায়-সমসাময়িক গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্যমংগলে বর্ণিত আছে।' অথচ বিদেশী হাবশীদের সিংহাসন অধিকার সম্বন্ধে মুসলমান সমাজের কোন আপত্তি ছিল না। ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকারে (Divine Right) সিংহাসনে মুসলমানের স্থান চিরস্থায়ী হবে, এটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। মুসলমান সুলতানের অধীনে থাকবে মুসলমান শাসকশ্রেণী; কর্তৃত্বে এবং ঐশ্বর্যে থাকবে এই শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার। চীনা দূতদের বিবরণে দেখা যায় যে বাস্তব অবস্থাতে এই রীতিই প্রতিফলিত হয়েছিল। নানা কারণে মুষ্টিমেয় হিন্দুকে খাস দরবারে প্রবেশাধিকার দেওয়া হত, কিন্তু তাতে সমগ্র হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হত না। শাসক মুসলমান, শাসিত হিন্দু—এটাই সুলতানী আমলে বাংলার বাস্তব রূপ।

বৈষ্ণব কবিদের লেখা বইগুলি পড়লে মনে হয় যে হিন্দুদের প্রধান অভিযোগ ছিল ধর্মের ক্ষেত্রে অত্যাচার। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা এবং তার উপকরণ দিয়ে মসজিদ তৈরী করা মুসলমান শাসকদের রাজনীতি ও ধর্মনীতির অংগ ছিল। ত্রয়োদশ শতকে জাফর খাঁ গাজী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদকুলি খাঁ পর্যন্ত অনেক মুসলমান শাসক এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন।[১৩] আবদুল করিম বলেছেন, মসজিদ নির্মাণের জন্য মন্দির ভাঙা হত, না যে মন্দির আগেই ভেঙে গিয়েছিল তার উপকরণ মসজিদ নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হত, সেটা অনিশ্চিত। তিনি বলেছেন, 'অটুট ও ব্যবহার্য মন্দির

১৩। A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca), ৩১-৪৪, ২৭৫ পৃষ্ঠা।

ভাঙ্গার নজীর বিরল।'[১৪] এই প্রশ্ন প্রকৃত পক্ষে অবান্তর। ইসলামের আইনে মুসলমান রাজ্যে নতুন মন্দির নির্মাণ করা এবং পুরানো মন্দিরের সংস্কার করা নিষিদ্ধ। সমগ্র ভারতে বহু মন্দির ভাঙা হয়েছিল; বাংলায় স্বাভাবিক ভাবেই এই রীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। আর পুরানো মন্দিরের সংস্কার নিষিদ্ধ থাকলে সেগুলি স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশঃ ভেঙে পড়বে। দীর্ঘ চার শতক ব্যাপী সুলতানী আমলে 'বাংলায় যে কয়টি হিন্দু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নিশ্চিত জানা যায় তাদের সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গোণা যায়।[১৫] 'গৌড়ের ইতিহাসে' রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন: "পাণ্ডুয়া যে একটি হিন্দু নগর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আদিনা মসজিদ, এক লাখি মসজিদ ও কুতুব আলমের দরগায় হিন্দু আমলের ইট পাথর পাওয়া যায়।...মুসলমানেরা পাণ্ডুয়ায় হিন্দুদের কোন চিহ্ন রাখে নাই। দেবালয়গুলি ভাঙ্গিয়া মসজিদ করিয়াছে।"

হোসেন শাহ উড়িষ্যা অভিযান উপলক্ষে ঐ রাজ্যে বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেন। বাংলার সুলতানের পক্ষে উড়িষ্যা ছিল পররাজ্য, হয়তো পররাজ্যে এ রকম অত্যাচার খুব অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু বাঙালী হিন্দুরা পুরীকে পরম পবিত্র তীর্থ বলে গণ্য করত, অনেকে বহু ক্লেশ সহ্য করে পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করতে যেত। সুতরাং হোসেন শাহের কাজে বাঙালী হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সনাতন মন্দির ধ্বংসের দর্শক হতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাই তিনি হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যায় যেতে অস্বীকৃত হন। এই অপরাধে সুলতান তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। পরে সুলেমান কররানীর সময়ে তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যায় হিন্দু মন্দির ও হিন্দু দেবমূর্তি ধ্বংস করেন। তাঁর নাম ছিল রাজু; সম্ভবতঃ হিন্দুরাই এই দেবদ্বেষী মুসলমান সেনাপতিকে 'কালাপাহাড়' নাম দিয়াছিল।

হিন্দুদের জাত মারার অনেক উদাহরণ সেকালের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। হোসেন শাহের রাজত্বকালে লেখা বিপ্রদাস পিপিলাইর 'মনসামঙ্গলে' আছে, মুসলমানরা হিন্দুদের উপর 'জুলুম' করত এবং 'সৈয়দ মোল্লা'রা হিন্দুদের কলমা পড়িয়ে মুসলমান করত। জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গলে' বলেছেন, রাজা ব্রাহ্মণদের ধরে তাদের জাতি নষ্ট করতেন এবং কোন বাড়ীতে শাঁখ বাজলে তার মালিকের জাতি ও প্রাণ বিপন্ন হত। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' দেখা যায়, হোসেন শাহ অথবা নসরৎ শাহের রাজত্বকালে সুলতানের উজীর বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁর রাজকর বাকি পড়ায় তাঁর বাড়ীতে এসে তাঁকে সপরিবারে বন্দী করেন, তাঁর বাড়ী ও গ্রাম লুণ্ঠন করেন, তাঁর দুর্গামণ্ডপে গোহত্যা করে তিন দিন গোমাংস রন্ধন করান এবং পরে তাঁর জাতি নষ্ট করে তাঁকে নিয়ে যান।

১৪। 'বাংলার ইতিহাস', ৩২৭ পৃষ্ঠা।
১৫। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২০, ৪৪৪-৪৭ পৃষ্ঠা।

রাজকর না দেবার শাস্তি হল ধর্মনাশ করা। সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ সম্বন্ধে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' লেখা বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে আছে: 'বল করি জাতি যদি লএত যবনে'।

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানে নানাভাবে বাধা দেওয়া হত। ঈশান নাগর লিখেছেন, ম্লেচ্ছরা দেবমূর্তি ভেঙে ফেলে, 'ভাগবত' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ছুড়ে ফেলে দেয়, শঙ্খ-ঘন্টা প্রভৃতি জোর করে নিয়ে যায়, পবিত্র তুলসী গাছে প্রস্রাব করে, পূজায় নিযুক্ত হিন্দুদের গায়ে থুথু দেয়। 'চৈতন্য ভাগবতে' আছে, কাজী পথে যেতে যেতে কীর্তনের শব্দ শুনলেন।

যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নবদ্বীপের কাজীর সংঘর্ষের কাহিনী ('চৈতন্যচরিতামৃতে' বিবৃত) সুবিদিত। কাজীর হুকুমে কীর্তন নিষিদ্ধ হল, কীর্তনীয়াদের উপর বিষম অত্যাচার আরম্ভ হল। অনেক বৈষ্ণব নবদ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র যাবার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য বললেন:

ভাঙ্গিব কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে।
কীর্তন করিব দেখি কোন কর্ম করে॥
তিলার্ধেকো ভয় কেহ না করিও মনে।

এই আশ্বাসবাণীতে সাহস সঞ্চয় করে কীর্তনীয়ার দল তাঁর নেতৃত্বে কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হল। কাজী বাধা দিতে অগ্রসর হলেন, কিন্তু বিশাল হিন্দু জনতার সম্মুখীন হয়ে তাঁর সাহস বিলুপ্ত হল। তিনি পালিয়ে গেলেন; কীর্তন সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।

আচার্য রমেশচন্দ্র লিখেছেন: 'তিন শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী ধর্মরক্ষার্থে মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই—মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা ও অকথ্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছে। চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল।' এই সাফল্য বৈষ্ণবদের নতুন প্রেরণা যোগাল। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে যে দেবমূর্তি ছিল সেটা স্বর্ণ নির্মিত মনে করে মুসলমান সৈন্য সেটা কেড়ে নিতে এল।

বক্ষে রাখিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল।
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড যবন কাটিল॥

কিন্তু প্রতিরোধ এবং আত্মদানের এই দৃষ্টান্ত হিন্দু সমাজের ভীরুতা দূর করতে ব্যর্থ হল। আচার্য রমেশচন্দ্র বলেছেন: 'চৈতন্যের এই পৌরুষের আদর্শ বাঙালীর চিত্তে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাস্য ও মাধুর্য ভাবেই বিভোর ছিলেন পৌরুষকে মর্যাদা দেন নাই।'[১৬]

১৬। তদেব, ২৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

কাজীদের অত্যাচার শহরাঞ্চল থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় 'কাজীর পাগলা' নামে একটি গ্রাম আছে। কাজীর পাগলামির কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু গ্রামের নামটি অর্থবহ।

বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু কাজীর হিন্দুবিদ্বেষ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য মুসলমান শাসনকালের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। মুসলমান কর্মচারীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ ॥
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শীল ॥

* * *

ব্রাহ্মণে পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে ॥

মনসা পূজায় নিযুক্ত রাখাল বালকদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার হল। তাদের ঘট ভেঙে ফেলা হল, যে কুম্ভকার ঘট তৈরী করেছিল তাকে গ্রেপ্তার করা হল। কাজী বললেন :

হারামজাদ হিন্দুর এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান ॥
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা।[১৭]
এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাত মারা ॥

কাজীদের কাজ ছিল মোকদ্দমার বিচার করা, কিন্তু তারা শহরে ও গ্রামাঞ্চলে হিন্দু নির্যাতন করে ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ তৎপর ছিল।

কাজী প্রভৃতি স্থানীয় মুসলমান কর্মচারীরা অতিরিক্ত উৎসাহ বশতঃ হিন্দুদের ধর্মকার্যে বাধা দিত, একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু রাজধানীতে অবস্থা কি ছিল? রজনীকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন : "গোঁড়া পাঠানেরা গৌড়ের মধ্যে হিন্দুদিগকে তাহাদের স্বধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া-কলাপের ও পর্বাদির অনুষ্ঠান করিতে দিত না। দ্বারবাসিনী হইতে রামকেলির শেষভাগ পর্যন্ত স্থানে গঙ্গাতীরে হিন্দুগণ আপনাদের ধর্ম্মকার্য করিতে পারিতেন। এই সুবিধার জন্য রামকেলি গ্রামে বিস্তর ব্রাহ্মণ সজ্জন বাস করিতেন।" পাণ্ডুয়াতে আদিনা মসজিদে এক লক্ষ মুসলমান নমাজ পড়ত, কিন্তু হিন্দুদের দেবালয়গুলি ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। আদিনা মসজিদের সিঁড়ির ধাপে কৃষ্ণ, বলরাম, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবতার মূর্তি প্রোথিত ছিল। ধর্মানুরাগী মুসলমানেরা সেগুলির উপরে পা রেখে মসজিদে প্রবেশ করত।

১৭। 'ছেমরা', পূর্ব বাংলার কথ্য ভাষায় শব্দটির অর্থ বালক।

কামান্ধ দুর্বৃত্তদের হাতে নারী নির্যাতন সকল দেশে সকল কালেই ঘটে, কিন্তু মুসলমান আমলে—অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে-এই গর্হিত অপরাধ শাসকশ্রেণীর একটি সুপরিকল্পিত বিলাসে পরিণত হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন: "মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'সিন্ধুকী' (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের খানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। পল্লী গীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে।'[১৮] এরূপ ক্ষেত্রে 'বিবাহ' ধর্ষণের নামান্তর মাত্র। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত লালসাপূরণ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হত। অপহৃতা নারী মুসলমান হত, তার আত্মীয়-স্বজন হিন্দু সমাজ থেকে বহিস্কৃত হয়ে ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য হত।

দুর্গাচন্দ্র সান্যালের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসে' সুলতান ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে এক সুন্দরী যুবতী ব্রাহ্মণ বিধবাকে দেখে সুলতান জোর করে তাকে নিজের হারেমে নিয়ে যান। হিন্দু সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা তাঁর কাজের প্রতিবাদ করায় তিনি বললেন, হয় তাদের মধ্যে কেউ বিধবাকে বিয়ে করবেন, নইলে তিনি নিজেই তাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করবেন। স্বভাবতঃই হিন্দুদের মধ্যে কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজি হলেন না; তখন সুলতান তাকে বিয়ে করে তার নাম দিলেন ফুলমতি বেগম। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু তা' বলা কঠিন, কিন্তু সম্পূর্ণ অবাস্তব গল্প ইলিয়াস শাহের মত সুলতানের নামের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছিল কিনা তা' সন্দেহের বিষয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের অবিচার সহ্য করতে হত। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে আফ্রিকাবাসী পর্যটক ইবন বতুতা ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। বাংলায় এসে তিনি দেখেছিলেন, হিন্দুদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক সরকারকে দিতে হয় এবং এর পরেও নানারকম কর দিতে হয়। ধনী জমিদারদের উপর রাজস্ব আদায়ের জন্য কি রকম অত্যাচার হত তার একটি উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। আরও একটি উদাহরণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে। সপ্তগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তার মিথ্যা নালিশের ভিত্তিতে হোসেন শাহের উজীর ঐ অঞ্চলের ইজারাদার গোবর্ধন মজুমদারের পুত্র রঘুনাথকে বন্দী করেন। কোন মুসলমান ইজারাদার সম্বন্ধে এরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। রাজার অনুগ্রহ প্রাপ্তির লোভে প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত—পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসার এই উক্তিতে হিন্দুদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে যে চীনা দূতেরা গৌড়ে এসেছিল তাদের বিবরণকে

১৮। দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎ বঙ্গ', ৬৫০ পৃষ্ঠা।

ভিত্তি করে আবদুল করিম বলেছেন: 'বাংলাদেশের লোকেরা, বিশেষ করিয়া মুসলমানেরা, ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব তৎপর ছিল।'[১৯] মুসলমান বণিকেরা যে সরকারী অনুগ্রহ ভোগ করত তাতে সন্দেহ নেই। পর্তুগীজদের আগমনের পূর্বে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সামুদ্রিক বাণিজ্যে পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান বণিকদের একাধিপত্য ছিল। পূর্ব বাংলার বন্দর চট্টগ্রাম তাদের একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। বাংলার মুসলমান বণিকদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। পশ্চিম বাংলার একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল সাতগাঁও। সেখানে বহু হিন্দু বণিক ছিল।

ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বারবোসা লিখেছেন, '(বাংলা দেশে) সমুদ্রতীরের বন্দরগুলিতে হিন্দু মুসলমান দুইই আছে—ইহারা জাহাজে করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহু দেশে পাঠায়।' 'অনেক মঙ্গলকাব্যের নায়ক একজন সওদাগর—যেমন, চাঁদ, ধনপতি ও তাহার পুত্র শ্রীমন্ত। ইহাদের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা উপলক্ষে বাণিজ্য-তরীর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।' মঙ্গলকাব্যগুলিতে হিন্দু বণিকদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে চিত্তগ্রাহী বর্ণনা আছে তা' কাল্পনিক নয়। বংশীদাসের 'মনসামঙ্গলে' সূর্য ও তারার সাহায্যে দিক নির্ণয়ের উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ এখানে সমুদ্রযাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সওদাগরেরাই মঙ্গলকাব্যের নায়ক। তারা সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক প্রভৃতি জাতির লোক ছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থেরা বণিকবৃত্তি গ্রহণকে তাদের নিজ নিজ কুলধর্মের বিরোধী বলে মনে করতেন। আচার্য রমেশচন্দ্র অনুমান করেছেন যে 'ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ বর্ণেরা যাহাতে অর্থলালসায় কুলোচিত ধর্ম বিসর্জন দিয়া বণিকবৃত্তি অবলম্বন না করে সেইজন্যই রঘুনন্দন সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।'[২০] আর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে সমুদ্রপথে বিধর্মীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে সমুদ্রযাত্রা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল এবং বিদেশে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত খাদ্যাখাদ্য বিচারে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। জাতিভেদ প্রথা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দুর স্থান সংকুচিত করেছিল।

সুলতানী আমলে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের খুবই অভাব। সুলতানদের মধ্যে প্রায় সকলেই গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং তাঁদের শাসননীতিতে বিভিন্ন মাত্রায় গোড়ামি প্রতিফলিত হত; কিন্তু কাশ্মীরের সুলতান সিকান্দর শাহের (১৩৮৯—১৪১৩) মত ধর্মান্ধ কেহ ছিলেন না, জয়নাল আবিদিনের (১৪২০-৭০) মত উদারও কেহ ছিলেন না। হোসেন শাহের উদারতা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা অনেকটা ভিত্তিহীন। তাঁহার আমলে বাংলায় হিন্দু ধর্ম প্রচার এবং হিন্দু দর্শনচর্চার ব্যাপারে প্রতিকূলতা ছিল। সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

১৯। 'বাংলার ইতিহাস', ২৩৫ পৃষ্ঠা।
২০। 'বাংলা দেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।

'হোসেন শাহ যখন কেশব ছত্রীকে চৈতন্যদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন কেশব ছত্রী তাঁহার কাছে চৈতন্যদেবের মহিমা লাঘব করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্ব-ব্যবহার খুব সন্তোষজনক ছিল না।...এ ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সন্ন্যাস গ্রহণের পরে চৈতন্যদেব আর বাংলায় থাকেন নাই, হিন্দু রাজার দেশ উড়িষ্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন। বাংলায় থাকিলে বিধর্মী রাজশক্তি তাঁহার ধর্মচর্চার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে ভাবিয়াই তিনি হয়তো উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন।...হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের ক্ষতি না করিবার আশ্বাস দিলেও তাঁহার হিন্দু কর্মচারীরা তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই।'[২১]

জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গলে' হোসেন শাহের অব্যবহিত পূর্বে যবনরাজের অত্যাচার বর্ণনার উপসংহারে বিখ্যাত দার্শনিক বাসুদেব সার্বভৌম সম্বন্ধে বলেছেন :

বিশারদসুত সার্বভৌম ভট্টাচার্য।
সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য ॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ময় রাজা।
রত্নসিংহাসনে সার্বভৌমে কৈল পূজা ॥

গৌড় রাজ্যের শাসননীতির সঙ্গে সার্বভৌমের 'সবংশে উৎকল' গমনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল।

সুলতানদের ব্যক্তিগত মত ছাড়া অন্যান্য কারণেও হিন্দুদের নিপীড়ন সহ্য করতে হত। দরবেশদের গোঁড়ামি অনেক সময় শাসননীতিতে এবং দৈনন্দিন সরকারী কাজে প্রতিফলিত হত। নিম্নপদস্থ মুসলমান কর্মচারীরা অনেক সময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং অর্থলোভের সম্মিলিত প্রভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর লেখক মুকুন্দরাম ডিহিদার মামুদের অত্যাচারে পিতৃপুরুষের ভিটা ছেড়ে হিন্দু রাজার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে বলা হয়েছে, (পূর্ব বাংলার জলপ্লাবিত অঞ্চল) 'ভাটি' থেকে আগত 'লম্বা' দাড়িওয়ালা 'বাঙ্গাল' রাঢ়ে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করত।

লাঙ্গল বেচায়, জোয়াল বেচায়, আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপতে বেচায় দুধের ছাওয়াল ॥

কাজীদের কিছু দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক আচারের পার্থক্য বশতঃ তারা প্রতিবেশী হয়েও বিচ্ছিন্নভাবে বাস করত। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে নূতন নগর পত্তনের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে বড় বড় নগরে মুসলমানেরা একটি স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করিত।' গ্রামেও সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা ছিল। বিংশ শতাব্দীতেও শহরে এবং গ্রামে এই ব্যাবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি।

২১। তদেব, ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা।

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুতা সূচক আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতানো একটি পুরানো প্রথা, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিক থেকে এর বাস্তব মূল্য খুবই কম। যে কাজী কীর্তন গানের অপরাধে নিমাই (শ্রীচৈতন্য) ও তাঁর অনুবর্তীদের 'জাতি নেবার' সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই তাঁদের প্রতিরোধে ভীত হয়ে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক দাবি করলেন।

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সেই সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥

এরূপ আত্মীয়তার অবাস্তবতা সম্বন্ধে আচার্য রমেশচন্দ্র বলেছেন: "এই 'কাজী মামা' চৈতন্যের বাড়ীতে আসিলে যে আসনে বসিতেন তাহা গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া শোধন করিতে হইত, জল চাহিলে যে পাত্রে জল দেওয়া হইত তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা শোধন করিতে হইত। খাদ্যের কোন প্রশ্নই উঠিত না। নিমাই পণ্ডিত তাঁহার 'কাজী মামার' বাড়ী গিয়া কিছু পান বা আহার করিলে জাতিচ্যুত হইতেন। ইহাতে আর যাহাই হউক, মামা-ভাগিনেয়ের মধুর প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না।" মনে রাখা দরকার, 'জাতি নেবার' সংকল্প ঘোষণার সময় কাজীর 'গ্রাম সম্বন্ধ' ব্যাপারটা মনে ছিল না।

হিন্দুরা মুসলমানদের সামাজিক দিক থেকে অস্পৃশ্য মনে করত, মুসলমানরাও একই রীতি অনুসরণ করত। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে, হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলে 'মুলুকের পতি' তাঁকে বললেন:

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত॥

হরিদাসকে কঠোর বেত্রাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হল। ইসলাম ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মত্যাগী মুসলমানের শাস্তি প্রাণদণ্ড। হিন্দুকে মুসলমান করা হবে, কিন্তু মুসলমান হিন্দু হতে পারবে না—এটাই ইসলাম ধর্মের এবং মুসলমান রাষ্ট্রের নীতি। সুতরাং দুই সম্প্রদায়কে পৃথক রাখার জন্য কেবলমাত্র হিন্দুদের ছুৎমার্গকে দায়ী করা চলে না।

৩। সাহিত্য

দ্বাদশ শতকে চর্যাগীতি রচনার যুগের পরে প্রায় আড়াইশো বৎসর বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই শূন্যতার যুগ মুসলমানদের আক্রমণ ও রাজ্যবিস্তারের যুগ। সুখময় মুখো-

পাধ্যায় বলেছেন, 'এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিভাধর সাহিত্যিক আবির্ভূত হন নাই। কিছু নগণ্য লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অকিঞ্চিৎকর রচনা স্বতঃই লুপ্ত বা বিস্মৃত হইয়াছে।'[২২] মুসলমান আক্রমণের ফলে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিল তার সঙ্গে সাহিত্যিক ক্ষেত্রে এই দৈন্যের কোন সম্বন্ধ ছিল, একথা তিনি স্বীকার করেন না। কিন্তু চর্যাপদ এবং 'গীতগোবিন্দ' রচনার পরে দীর্ঘ আড়াইশো বৎসর বাঙালীর সাহিত্যসৃষ্টির আগ্রহ ও শক্তি নির্বাপিত থাকল কেন, তার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দরকার। মুসলমানদের পক্ষে 'হিন্দুদের গ্রন্থাদি নষ্ট করার প্রবণতা' ছিল, একথা তিনি স্বীকার করেন না। বখ্‌তিয়ার খলজী যখন মগধের অন্তর্গত বৌদ্ধ 'বিহার' ধ্বংস করেন তখন নিশ্চয়ই ভিক্ষুদের গ্রন্থগুলি রক্ষা পায় নি! বাংলায় তাঁর সময়ে বা তাঁর পরবর্তী কোন সুলতানের আমলে এ রকম ঘটনা ঘটেছিল, এমন কোন প্রমাণ মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা বইতে পাওয়া যায় না; হিন্দুদের লেখা কোন ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক বিবরণ নেই। গ্রামাঞ্চলে গোঁড়া দরবেশদের অনুগামীরা, অত্যুৎসাহী মুসলমান রাজকর্মচারীরা এবং লুণ্ঠনরত সৈন্যেরা কখনও বিধর্মীদের পুঁথিপত্র বিনষ্ট করে নি, এমন কথা মনে করা কঠিন। তা' ছাড়া মুসলমান বিজয়ের যুগে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা হিন্দু সমাজকে শঙ্কিত করে রেখেছিল সেটা সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল ছিল না। সেকালে সাহিত্য ছিল ধর্ম-কেন্দ্রিক। যখন নানাভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তরীকরণ চলছিল, মন্দির ধ্বংসের ফলে হিন্দু ধর্ম বিপন্ন হয়েছিল, দৈনন্দিন জীবনে হিন্দু ধর্মের আচার পালন করা কঠিন হয়ে উঠেছিল (যার প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' পাওয়া যায়) তখন কবিদের পক্ষে নির্বিকার থেকে শান্ত পরিবেশে কাব্য রচনা করা সম্ভব ছিল না।

সুকুমার সেন বলেছেন, 'দ্বাদশ শতাব্দী অবধি যাহাদের হস্তে সাহিত্য সৃষ্টি নির্ভর করিত...তাঁহারা ছিলেন রাজশক্তির আশ্রিত কিংবা কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসংঘের আশ্রিত। মুসলমান-শক্তির আঘাতে উভয়ই বিনষ্ট অথবা ক্ষমতাহীন হইয়া পড়ায় তুর্কী অভিযানের পর কিছুকাল ধরিয়া সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব হইয়া পড়িল। দেশ অশান্তিপূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত, তাহার উপর উপদ্রব লাগিয়াই আছে; সুতরাং এই অবস্থায় কি করিয়া সাহিত্য সাধনা হইতে পারে?' এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি বলেছেন, ইলিয়াসশাহী সুলতানদের সময়ে কিছু শান্তিলাভ করায় দেশে সাহিত্যসৃষ্টি-সম্ভাবনার উপযুক্ত আবহাওয়া দেখা দিল বটে, কিন্তু রাজশক্তির যথেষ্ট সহায়তার অভাব দূর না হওয়ায় যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি হয় নাই। পরে গৌড় দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যসৃষ্টি সুরু হল।[২৩] এই মত মোটামুটি ভাবে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে

২২। তদেব, ৩৫৭ পৃষ্ঠা।
২৩। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১৯৪০, ৫৫ এবং ৭১ পৃষ্ঠা।

চন্ডীদাস 'গৌড় দরবারের' অথবা অন্য কোন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

সমস্যাটির আর এক ভাবে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন আবদুল করিম। তাঁর বক্তব্য এই: 'ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ভাষায় ধর্মকেন্দ্রিক কাব্য লিখিতেন; দেব-ভাষায় এবং দেব-গ্রন্থে শূদ্র বা জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না। তা' ছাড়া দেব-ভাষা সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মণদের কড়া নজর ছিল। এমন অবস্থায় দেশী অদেব-ভাষা বাংলার উৎকর্ষ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু হঠাৎ দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। সংস্কৃত ভাষা তাহার পূর্ব মর্যাদা হারাইয়া ফেলে এবং ফার্সী ভাষা সরকারী ভাষায় পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পূর্ব মর্যাদাও লোপ পায়।...(বহু হিন্দুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে, এবং 'ইসলামের প্রভাব রোধ করার জন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদের বিধিনিষেধ শিথিল করিতে বাধ্য' হওয়ায়) গোটা 'হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সূচনা হয়। সুতরাং... শুধু মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই বাংলা সাহিত্য বিকাশের পথ সুগম হয়।' অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি মুসলমান শাসনের অবদান। অতি-রঞ্জন মনে হইলেও কথাটি সত্য।'[২৪]

চর্যাপদগুলি 'অদেব-ভাষায়' রচিত—রচয়িতারা ছিলেন 'তান্ত্রিক বজ্রাচার্য ও শৈব নাথাচার্য'। মুসলমানদের আগমনের পূর্বেই ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষক সেন রাজাদের আমলেও এগুলি রচিত হয়েছিল। মুসলমান রাজত্বকালে 'অ-দেব ভাষায়' রচনার এই রীতিটি লুপ্ত হয়ে গেল কেন? আবদুল করিম এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন নি। সম্ভাব্য উত্তর এই যে, সাধারণ হিন্দুদের মতই এই আচার্য শ্রেণী মুসলমান শাসকশ্রেণীর বিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। আর একটি কথা। মুসলমান শাসনকালে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণেরা এবং তাঁদের ভাষা সংস্কৃত 'পূর্ব মর্যাদা' হারায় নি। সুলতানী আমলে নানা বিষয়ে বহু সংস্কৃত বই লেখা হয়েছিল।[২৫] ফার্সী যে অর্থে রাজ-ভাষা (শাসনকর্মের জন্য ব্যবহৃত ভাষা) হয়েছিল সে অর্থে সংস্কৃত কখনও রাজভাষা ছিল না—যদিও হিন্দু রাজাদের শিলালিপি ও তাম্রশাসন সংস্কৃতে রচিত হত। তৃতীয় প্রশ্ন এই: আবদুল করিম বলেছেন, 'ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু প্রথম বাংলা কাব্য, চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, রচিত হয় ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে।' এর 'কারণ স্বরূপ' তিনি শহীদুল্লাহর মত উধৃত করে বলেছেন, ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত 'যুদ্ধবিগ্রহে বাংলা দেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ছিল না, সেইজন্য সাহিত্যচর্চা নামে মাত্র ছিল।'

২৪। 'বাংলার ইতিহাস', ৩২৫-২৬ পৃষ্ঠা।
২৫। রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩৬-৫৩ পৃষ্ঠা (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত অধ্যায়)।

মোটের উপর একথা ঠিক যে মুসলমান শাসনকালে দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের বিকাশের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়েছিল ব্রাহ্মণদের দোষে নয়— বিজেতাদের কাজের ফলে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে পলাশীর যুদ্ধের পর অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই নতুন বিদেশী সরকারের ছত্রছায়ায় বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল।

মুসলমান বিজয়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে বাংলা সাহিত্য যখন আবার আত্মপ্রকাশ সুরু করল তখন বাংলার কবিরা সুলতানদের আনুকূল্য কতখানি পেয়েছিলেন? আবদুল করিম বলেছেন, 'হিন্দু কবিদের অনেকেই মুসলমান সুলতান বা তাঁহাদের অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন, সুতরাং মুসলমানেরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।'[২৬]

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হলেও তাঁর রচিত পদগুলি বাংলার পদাবলী-সংকলন-গুলিতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ত্রিহুতের রাজা শিবসিংহ—যাঁকে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী ধ্বংস করেছিলেন। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বিতর্কের অবসান হয় নি; কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' রচয়িতা বলে পরিচিত 'বড়ু চণ্ডীদাস' কোন সুলতান বা মুসলমান অমাত্যের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেন নি। তাঁকে সুলতানী আমলের প্রথম কবি বলে গ্রহণ করলে বলতে হবে, চর্যাপদের দীর্ঘকাল পরে মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বাংলা সাহিত্যের নব জন্ম হল। কৃত্তিবাস যে 'গৌড়েশ্বরের' নির্দেশে রামায়ণ রচনা করেন তাঁর নাম সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। আবদুল করিমের মতে তাঁর নাম সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ, সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে তাঁর নাম রুকনউদ্দীন বারবক শাহ, অপর মতে তিনি ছিলেন কোন হিন্দু রাজা —গণেশ অথবা 'কোন হিন্দু জমিদার'। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচয়িতা মালাধর বসুকে যে 'গৌড়েশ্বর' 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন তাঁর নাম রুকনউদ্দীন বারবক শাহ, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই। হোসেন শাহ যশোরাজ খানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে। 'মনসামঙ্গলের' কবি বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপিলাইর সঙ্গে তাঁর কোনরকম সম্বন্ধ ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। হোসেন শাহের দুই 'অমাত্য'—পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ—যথাক্রমে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কোন কোন ব্যক্তিবিশেষকে পুরস্কার দিয়ে সামগ্রিক ভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের সহায়তা করা যায় না। তার জন্য সমাজে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। সুলতানী আমলে সে কাজ করা হয় নি। আবদুল করিম বলেন, 'বাংলা দেশে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শাসকেরা শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেন এবং এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা (স্কুল) স্থাপন করেন। এই সকল মাদ্রাসায়

২৬। 'বাংলার ইতিহাস', ৫৭২ পৃষ্ঠা।

আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাদিশ, তফসির, ফেকাহ্ ইত্যাদি ধর্মীয় শাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।' স্বভাবতঃই হিন্দুরা এই শিক্ষা-ব্যবস্থার আওতার বাইরে ছিল এবং এর দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন উপকার হয় নি। যে সকল মুসলমান এই ভাবে শিক্ষালাভ করত তারা তাদের ধর্মীয় বিষয় সম্বন্ধেই বই লিখত।[২৭] সাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রসার হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করত, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের পথ রুদ্ধ করত।

প্রায় চারশো বৎসরের সুলতানী আমলে দুই জন মুসলমান কবি দুটি বাংলা কাব্য রচনা করেন। শরখ জাহিদ লেখেন 'আদ্য পরিচয়'। এই বইটি 'মূলতঃ দেহ সাধনার তাত্ত্বিক বিচার মাত্র'। শাহ মোহম্মদ সগীর লেখেন 'ইউসুফ জোলায় খাঁ'। মুসলমানদের রচিত বাংলা সাহিত্যে এই দৈন্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবদুল করিম: 'মুসলমানেরা বাংলায় বহিরাগত। এই দেশের ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাদের সময় লাগে। অমুসলমানদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কাব্য রচনা করেন কিনা জানা নাই।'[২৮]

ইংরেজ মুচির পুত্র উইলিয়ম কেরী ১৭৯৩ সালে বাংলায় এসেছিলেন। অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে থেকেও তিনি সাত বৎসর অতিক্রান্ত না হতেই বাংলা শিখে বাইবেলের কোন কোন অংশের বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের সাহিত্যকীর্তি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। বাংলায় 'বহিরাগত' মুসলমানেরা পৌনে চারশো বৎসরের মধ্যেও বাংলা বই লিখতে পারেন নি।

যে হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ না করার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। তারা প্রায় সকলেই হিন্দু সমাজের নিম্ন স্তর থেকে এসেছিল। তাদের শিক্ষাদীক্ষার কোনরকম পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল না, মুসলমান শাসনকালে তাদের বাংলা পড়বার কোন সুযোগও ছিল না। খুব সম্ভবতঃ তারা হিন্দুদের পাঠশালায় যেতে পারত না; মাদ্রাসায় বাংলা শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। ফলে তারা অশিক্ষিত থাকত। নবগৃহীত ধর্মের মর্মও তারা বুঝত না, কারণ খ্রীস্টান পাদ্রীদের মত মুসলমান মোল্লা-মৌলানারা কোরাণের বাণী তাদের বোধগম্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন নি। বাংলায় কোরাণের প্রথম অনুবাদ করেছিলেন একজন হিন্দু—গিরীশ চন্দ্র সেন – ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে। হয়তো মুষ্টিমেয় ধর্মান্তরিত হিন্দু আরবী শিখত, কিন্তু তারা বাংলা শিখত না এবং বাংলায় লেখা তাদের নবলব্ধ আভিজাত্যের পরিপন্থী মনে করত। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের শিক্ষার অধিকার এবং ধর্মের গূহ্যতত্ত্ব জানবার সুযোগ কেড়ে নিয়েছিল। মুসলমান সমাজে যারা ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করেছিল তারাও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের সম্বন্ধে একই অপরাধে অপরাধী ছিল।

২৭। তদেব, ৫১৬-১৭ পৃষ্ঠা।
২৮। তদেব, ৫৭২ পৃষ্ঠা।

৪। শিল্প

সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় বহু মসজিদে ও সমাধি-ভবনে। এখন পর্যন্ত যেগুলি সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে তার মধ্যে কোনটি চতুর্দশ শতাব্দীর আগেকার নয়। ত্রয়োদশ শতকে এবং চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে যদি কোন বড় ইমারত নির্মিত হয়ে থাকে তবে তা' কালের স্থূলহস্তাবলেপ এড়াতে পারে নি। হয়তো সেই রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে সুদৃঢ় এবং শিল্পের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ইমারত নির্মাণ করা সম্ভব হয় নি।

বিশিষ্ট সমালোচক পার্সি ব্রাউন বলেছেন, বাংলার মুসলমান স্থাপত্যের গঠন-রীতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত ('impressive') নয়। ইমারত-গুলি প্রধানতঃ ইটের তৈরী, কারণ বাংলার নিম্নভূমিতে পাথর পাওয়া যেত না। তাই হিন্দু আমলের মত মুসলমান আমলেও ইটই ইমারত তৈরীর প্রধান উপাদান রূপে ব্যবহৃত হত। ফলে ইমারতগুলি নীচু হত, খিলান (arch) দুর্বল হত, গম্বুজ (dome) ছোট হত এবং স্তম্ভ (pillar) হ্রস্বাকৃতি হত। খিলান ও গম্বুজ মুসলমান শিল্পের বিশেষত্ব, হিন্দু যুগে এদের ব্যবহার অজ্ঞাত না হলেও খুব কম ছিল।

প্রস্তরনির্মিত ইমারতে যে দৃঢ়তা এবং কাঠিন্য থাকে ইষ্টকনির্মিত ইমারতে তা থাকতে পারে না। মুসলমান শিল্পীরা ইমারতের আকার বৃদ্ধি করে এ সব দুর্বলতা ঢাকতে চেষ্টা করত, কিন্তু তাতে অনেক সময় ভারসাম্য (balance) এবং আভ্যন্তরীণ ঐক্য (organic unity) ক্ষুন্ন হত।

সিকান্দর শাহের আমলে (১৩৫৮-৮৯) নির্মিত পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদে এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র ভারতবর্ষে এত বড় মসজিদ আর নির্মিত হয় নি, কিন্তু এর গঠনরীতি বৃহৎ আকারের সঙ্গে মানানসই নয়। এত বড় মসজিদে কোন সুদৃশ্য তোরণ (gateway) নেই। কানিংহাম বলেছেন, এই ইমারত মসজিদের চেয়ে সরাইখানা হবার বেশী উপযোগী। মার্শালের মতে এটা 'একঘেয়ে এবং সাধারণ' ('monotonous and commonplace')।

আদিনা মসজিদ নির্মাণে হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া সুন্দর কারুকার্যশোভিত স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছিল। পান্ডুয়ার একলাখী সমাধি-ভবনে (সম্ভবতঃ এখানে জলালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহের সমাধি রয়েছে) হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন যুক্ত অনেক পাথরের টুকরা আছে। এর কষ্টি পাথরে তৈরী তোরণের তলদেশে হিন্দু দেবতার মূর্তি খোদিত আছে। সমাধি-ভবনটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে কার্নিসটি খড়ের চালের মত একটু বাঁকানো এবং দেয়াল থেকে অনেকটা বাড়ানো। প্রতি দিকে একটি খিলানযুক্ত তোরণ। উপরে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ, তাতে সমগ্র ভবনটির ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। উচ্চতা কম। বাইরের কারুকার্যে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা (সম্ভবতঃ রুকনউদ্দীন বারবক শাহ কর্তৃক নির্মিত) একটি উচ্চ শ্রেণীর স্থাপত্যকীর্তি। এটি ধর্মের সংগে সংশিল্ষ্ট নয়, সম্ভবতঃ এটি দুর্গের প্রধান তোরণ ছিল। মার্শালের মতে, এটি ইট এবং পোড়া মাটির কাজের শিল্পসংগত ব্যবহারের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এর দেয়ালে এবং বলভিতে (turret) হিন্দু প্রভাবের চিহ্ন আছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তৈরী গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদ কানিংহাম ও মার্শালের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। এখানে পোড়া মাটির ফলক এবং খোদিত আভরণগুলির শোভা ও লালিত্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গৌড়ের লোটন মসজিদ ভিতরে ও বাহিরে নানা রঙের মসৃণ টালির বিচিত্র জ্যামিতিক নকসায় সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু দিল্লীতে এবং মুলতানে টালির কাজ আরও উচ্চ স্তরের ছিল।

হোসেন শাহী আমলের স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হোসেন শাহের তৈরী ছোট সোনা মসজিদ ইটের তৈরী, কিন্তু বাইরের দেয়াল পুরাপুরি এবং ভিতরের দেয়াল আংশিক ভাবে পাথরে বাঁধানো। তখন ভাঙবার মত হিন্দু মন্দির ও প্রস্তরনির্মিত দেবমূর্তি আর ছিল না, তাই রাজমহল এবং বালেশ্বর থেকে জলপথে পাথর আনতে হত। পাথরের ওপর নানারকম নকশা খোদিত আছে। কোন কোন গম্বুজের ভিতরের দিকে সোনার গিল্টি করা হয়েছিল, সম্ভবতঃ সেজন্যই 'সোনা মসজিদ' নামটির উৎপত্তি হয়েছিল।

বড় সোনা মসজিদ এবং কদম রসুল নির্মাণ করেছিলেন নসরৎ শাহ। এখানেও দেয়ালে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে এবং সোনার গিল্টি করার চিহ্ন আছে। খোদাই করা আভরণের ব্যবহার কম। আয়তনের বিশালতা এবং খোদাই করা দরদালান বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফার্গুসনের মতে, এটাই গৌড়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌধ।

কদম রসুল ইটের তৈরী। তিনটি বারান্দা, চারি কোণে চারিটি অষ্টকোণ মিনার, প্রত্যেক মিনারের উপর একটি স্তম্ভ। একটি বারান্দার সম্মুখভাগ ইটের কারুকার্যে শোভিত। এখানে হজরত মোহাম্মদের পদচিহ্নাঙ্কিত একখণ্ড কালো মার্বেল পাথর রাখা হয়েছিল। সৌধটির গঠনে স্থাপত্য শিল্পের অবনতির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

গৌড় ও পাণ্ডুয়া ছিল রাজশক্তির কেন্দ্র, তাই সুলতানী আমলের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই দুই শহরেই দেখা যায়। কিন্তু বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও বহু কারুকার্যখচিত মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। বাগেরহাটের সাতগম্বুজ মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দিল্লীতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে ক্রমশঃ সমগ্র ভারতে স্থাপত্য শিল্প নতুন রূপ নিয়েছিল। শিল্প সম্বন্ধে মুসলমানদের ধারণা এবং পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত স্থাপত্যরীতি এদেশে প্রবেশ করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দু শিল্পাদর্শ ও স্থাপত্যরীতি নতুন ভারতীয় মুসলমান শিল্পকে

প্রভাবিত করেছিল। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রভাবের পার্থক্য ঘটেছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুলতানী আমলের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এখনও করা হয় নি।

সুলতানী আমলে নির্মিত হিন্দু মন্দিরের নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী কালে নির্মিত অনেক মন্দির এই আমলে ধ্বংস করা হয়েছিল। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী পুরানো মন্দিরের সংস্কার করা নিষিদ্ধ। সম্ভবতঃ এই কারণে বহু মন্দির কালক্রমে জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছিল। বৃহদাকার কারুকার্যশোভিত মন্দির নির্মাণে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র রাজাদের পক্ষেই সেটা সংগ্রহ করা সম্ভব। রাজশক্তি হারাবার পরে হিন্দুদের সেই সামর্থ্য ছিল না। মুসলমান আমলের যে সব হিন্দু মন্দির এখনও দেখা যায় সেগুলি প্রধানতঃ মল্লভূম অঞ্চলে রয়েছে। খরস্রোত দামোদর নদ এবং নিবিড় অরণ্য দ্বারা সুরক্ষিত বাংলার এই প্রান্তে মুসলমান রাজশক্তি পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পারে নি। তাই আঞ্চলিক হিন্দু শাসকেরা তাঁদের সীমিত আর্থিক সম্বল নিয়ে মন্দির নির্মাণের ঐতিহ্য রক্ষা করেছিলেন।

৩

মোগল পাদশাহী

১। মোগলের বাংলা বিজয়

দায়ুদ কররানীর পতনের (১৫৭৫-৭৬) ফলে বাংলায় মোগল অধিকার বিস্তারের সূচনা হল। এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ে (১৬৬৬)।

আকবরের রাজত্বকালে বাংলায় প্রকৃতপক্ষে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নি; স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলাধিকারীদের প্রতিরোধ দমনের জন্য মোগল বাহিনী ব্যস্ত থাকত, রাজস্ব আদায় এবং শাসনসংক্রান্ত অন্যান্য কাজ যুদ্ধবিগ্রহের জন্য নিয়মিত ভাবে করা সম্ভব হয় নি। আকবরের রাজত্বকালে নিযুক্ত নয় জন প্রাদেশিক শাসককে, এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দিকে নিযুক্ত দুই জন্য প্রাদেশিক শাসককে আচার্য যদুনাথ সরকার 'যুদ্ধজয়ী সেনাপতি' ('conquering generals') আখ্যা দিয়েছেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নিযুক্ত তৃতীয় প্রাদেশিক শাসক ইসলাম খাঁ (১৬০৮-১৩) প্রকৃতপক্ষে প্রথম প্রশাসক ('regular administrator') ছিলেন।

ইতিমধ্যে আকবর তাঁর বিজিত প্রদেশগুলির শাসনের জন্য নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন (১৫৮৬)। প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদবী হয়েছিল 'সিপাহ্ সালার'; সাধারণতঃ তাঁকে 'সুবাদার' বা 'নাজিম' বলা হত। প্রাদেশিক রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল 'দেওয়ান' নামে পরিচিত তাঁর সহযোগী এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর। এই ব্যবস্থা কাগজে কলমে বাংলা প্রদেশ বা 'সুবা' সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু ইসলাম খাঁর পূর্ববর্তী কোন সুবাদার দিল্লী দরবারের নিয়ম কানুন অনুসারে ঠিক মত কাজ করতে পারেন নি।

আকবরের ছোট ভাই, কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিম, ১৫৮০ সালে বিদ্রোহী হয়ে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সমর্থক বিদ্রোহী

সামরিক কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার অধিকার করল। উড়িষ্যায় আফগান প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত হল। কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর মোগল আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হল। আকবরের বিশ্বাসভাজন রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ বিহার ও উড়িষ্যা অধিকার করে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলেন। ১৫৯৪ সাল থেকে ১৬০৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিহার এবং বাংলার সীমান্তে অবস্থিত রাজমহলে নতুন প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করে তার নাম দিলেন আকবরনগর (১৫৯৫)। বিহার তখন বাংলার সুবাদারের শাসনাধীন ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, ১৬০৭ সালে, বিহারে পৃথক সুবাদার নিয়োগের রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলায় মোগল আধিপত্য স্থাপনের বিরুদ্ধে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান (আফগান) আঞ্চলিক শাসক (ভুঞা) যুদ্ধ করেছিলেন। সাধারণতঃ বলা হয় যে তাঁদের সংখ্যা ছিল ১২। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, তাঁরা ছিলেন ভুঁইফোড় ('upstart') সমরনায়ক; কররানী বংশের রাজ্য যখন ভেঙে পড়ছিল তখন তাঁরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষতঃ সমুদ্রোপকূলে খুলনা-বাখরগঞ্জ অঞ্চলে, ব্রহ্মপুত্রের ওপারে ঢাকা অঞ্চলে, উত্তর ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্টের জঙ্গলে আবৃত অঞ্চলে—অধিকার স্থাপন করেছিলেন। উত্তর ভারতের সমতল ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত মোগল অশ্বারোহীরা এই নদীপ্লাবিত অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারত না। এই ভুঁইফোড় রাজ্যাধিপতিদের মোগল-বিরোধী সংগ্রামকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম রূপে গণ্য করা যায় না। রাজপুত রাজা প্রতাপসিংহ বংশানুক্রমিক অধিকার রক্ষার জন্য মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পূর্ব বাংলার ভুঁইফোড় ভাগ্যান্বেষীদের তুলনা হয় না। ইতিহাসাচার্য বলেছেন, আধুনিক কালের বাঙালী লেখকেরা ভিত্তিহীন প্রাদেশিক স্বাদেশিকতার ('false provincial patriotism') বশবর্তী হয়ে এঁদের বিদেশী মোগল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাসংগ্রামী রূপে গৌরব মুকুটে ভূষিত করেছেন।[১]

বাঙালী লেখকেরা যে প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীরের সিংহাসনে বসিয়েছেন আচার্য যদুনাথ ইতিহাসের শুষ্ক আলো ('dry light of history') তাঁর উপর ফেলে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ('debunk') করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি দায়ুদ কররানীর কর্মচারী ছিলেন, তাঁর পতনের পর বহু ধনরত্ন সহ পলায়ন করে জলপ্লাবিত খুলনা অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করে 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন। প্রতাপাদিত্য কখনও কোন মোগল সৈন্যদলকে মুখোমুখি যুদ্ধে পরাজিত করেন নি; তিনি কাপুরুষের মত ('tamely') মোগল সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কেদার রায়

১। যদুনাথ সরকার, *History of Bengal*, Vol. II, ২২৫ পৃষ্ঠা।

যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু তাঁর পুত্র চাঁদ রায় উড়িষ্যার আফগানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দক্ষিণ বাংলা লুণ্ঠন করেন এবং পরে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। ঈশা খাঁ ছিলেন উত্তর ভারত থেকে আগত হিন্দুধর্মত্যাগী কালিদাস গজদানীর পুত্র। তিনি এবং আনোয়ার আলি অরাজকতার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশীর জমিদারী দখলের চেষ্টা করেছিলেন। মোগলেরা বিদেশী আক্রমণকারী হলে কররানীরাও তাই ছিলেন, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ভুঞা যুদ্ধ করেন নি। ত্রিপুরা, কোচ বিহার এবং কামরূপের হিন্দু রাজাদের মোগল-বিরোধী সংগ্রাম প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়ে পড়ে। তাঁরা সুলতানী আমলেও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বার বার যুদ্ধ করেছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনায় আচার্য যদুনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকাল অতিবাহিত করেন। স্বাভাবিক ভাবেই মোগল-মহিমা তাঁকে অভিভূত করেছিল। তিনি বলেছেন, মোগল সম্রাটেরা ভারতে ঐক্যস্থাপন করেছিলেন কেন্দ্রীভূত শাসন-পদ্ধতির মাধ্যমে ; তাঁরা এই বিরাট দেশকে দিয়েছিলেন এক আইন, এক মুদ্রা, এক রাজভাষা (ফার্সী)। পাকিস্তান আন্দোলন যখন ভারতের ঐক্য বিনাশের পথ পরিষ্কার করছিল তখন তিনি একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে দেশবাসীকে মোগলদের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।[২] ভিত্তিহীন প্রাদেশিক স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এই সময়েই রচিত হয়েছিল। মুসলমান আমলে বাংলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি ভারতের ইতিহাসের মূল ধারার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার প্রয়াস অনুমোদন করতে পারেন নি। আকবর-জাহাঙ্গীরের যুগে মোগল সাম্রাজ্যের প্রসারই ছিল সেই মূল ধারা, প্রতাপাদিত্য-কেদার রায়-ঈশা খাঁ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভেসে গিয়েছিলেন।

ভুঁইফোড় ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সাধারণ সৈনিক রূপে ভারতে এসে বখ্তিয়ার খলজী বাংলায় মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করেন। শিবাজী স্বাধীন মারাঠা রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি রাজবংশীয় ছিলেন না ; তাঁর পিতা ছিলেন আহমদনগরের সুলতানের অধীন জায়গীরদার। পেশোয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা বালাজী বিশ্বনাথ শ্রীহরির মতই সাধারণ আমলা হিসাবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। বৈরাগী বান্দা শিখদের রাজনৈতিক আধিপত্যের সূচনা করেন। বাংলার কোন ভুঞা যদি সমগ্র বাংলা দখল করে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে পারতেন তবে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে সেটা অমঙ্গলজনক হত, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। ইংরেজ শাসনের ফলে এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে যে রাজনৈতিক আদর্শ যদুনাথের যুগে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছিল সেটা আকবর-জাহাঙ্গীরের যুগে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। রাজ্যবিস্তারের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে আকবর বাংলা বিজয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ

২। J.N. Sarkar, 'Unity of India', *Modern Review*, November 1942.

করেই প্রাদেশিক বা স্থানীয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মোগল আক্রমণের বন্যা প্রতিরোধ করার মত সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁদের ছিল না। তাঁরা মাৎসন্যায়ের যুগে এদিক ওদিক লাফালাফি করে তাঁদের সীমিত শক্তি নিঃশেষ করেছেন। ইতিহাস সাফল্যের পূজারী। সফল বিদ্রোহীকে বীরের অর্ঘ্য দেওয়া হয়, ব্যর্থকাম রাজ্যলোভীর ভাগ্যে জোটে তিরস্কার। আচার্য যদুনাথ পরোক্ষভাবে বাঙালী লেখকদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

* * *

পূর্ব বাংলায় মোগল আধিপত্য স্থাপনের সূচনা করেন মান সিংহ। এখানে তাঁর প্রধান শত্রু ছিলেন ঈশা খাঁ, কেদার রায়, কয়েকজন আফগান দলপতি এবং আরাকানের মগ লুণ্ঠনকারীরা। আফগানেরা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব দিকে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। ঈশা খাঁ পরাজিত হয়ে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করলেন; কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু হল। কেদার রায় যুদ্ধে আহত ও বন্দী হলেন, তাঁকে মান সিংহের কাছে নিয়ে যাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হল। মগ লুণ্ঠনকারীদের বিতাড়িত করা হল।

১৫৮৪ সালে ঢাকায় মোগলদের একটি 'থানা' ছিল। পূর্ব বাংলায় যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য মান সিংহ প্রায় দু বৎসর (১৬০২-৪) ঢাকায় ছিলেন এবং সামরিক দিক থেকে শহরটিকে সুরক্ষিত করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী সুবাদার ইসলাম খাঁ (১৬০৮-১৩) ঢাকায় একটি নতুন দুর্গ এবং বড় বড় রাস্তা নির্মাণ করলেন। তাঁর শাসনকালের শেষ দিকে (১৬১২) রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হল। সম্রাটের নাম অনুসারে ঢাকার নাম দেওয়া হল জাহাঙ্গীরনগর। প্রধানতঃ সামরিক কারণেই রাজধানী স্থানান্তরিত হল। আরাকানের মগ এবং পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করা কঠিন ছিল। গঙ্গা নদীর স্রোত পরিবর্তনের ফলে রাজমহলে বড় বড় রণতরী যেতে পারত না। তা'ছাড়া পূর্ব বাংলার ভুঞা এবং আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল, সেদিক থেকে রাজমহলের চেয়ে ঢাকা অধিকতর সুবিধাজনক শাসনকেন্দ্র ছিল। বিহারের জন্য পৃথক সুবাদার নিয়োগ করার ফলে দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানে একটি রাজধানী রাখার আর প্রয়োজন ছিল না।

ইসলাম খাঁ যখন বাংলার সুবাদারী গ্রহণ করেন তখন মোগল সম্রাটের শাসন প্রকৃতপক্ষে রাজধানী (রাজমহল), মোগল ফৌজদারদের সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত কয়েকটি ঘাঁটি ('থানা') এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা (civil administration) প্রবর্তন করার জন্য যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রয়োজন সেটা সমগ্র বাংলায় তখনও স্থাপিত হয় নি। ঘাঁটিগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘোড়াঘাট (রংপুর জেলায় করতোয়া নদীর তীরে), শেরপুর (ময়মনসিংহ জেলায়), ঢাকার কাছাকাছি ভাওয়াল ও

চৌক, এবং ত্রিমোহানি (ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী পদ্মা, লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে)। ঘাঁটিগুলির আওতার বাইরে ছিল জমিদারদের এলাকা। তাঁরা মোগল বাহিনীর চাপে মাঝে মাঝে বশ্যতা স্বীকার করতেন, আবার সুযোগ পেলেই বিদ্রোহী হতেন।

পশ্চিম বাংলায় ক্ষমতাশালী জমিদারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বীরভূম-বাঁকুড়ার বীর হাম্বির, পাচেতের শামস্ খাঁ এবং হিজলির সলিম খাঁ। এঁদের এলাকার পূর্বদিকে ছিলেন রাজসাহী-পাবনা এলাকার কয়েকজন হিন্দু এবং একজন মুসলমান জমিদার। হিন্দুদের মধ্যে ছিলেন পুটিয়া রাজবংশের পূর্ব-পুরুষ পীতাম্বর। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল যশোহর-খুলনা-বাখরগঞ্জ জেলায়। যমুনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে ধুম-ঘাটে তাঁর রাজধানী ছিল। প্রতাপাদিত্যের জামাতা ছিলেন বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাকলার জমিদার রামচন্দ্র। নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত ভুলুয়ার জমিদার ছিলেন অনন্ত মাণিক্য। মোগল-বিরোধী জমিদারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ। তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায়। তাঁর চারটি সুরক্ষিত ঘাঁটি ছিল—খিজরপুর (দুলই এবং লক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলে), কাত্রাভু (খিজরপুরের বিপরীত দিকে, লক্ষ্যা নদীর তীরে), কদম রসুল (ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে), যাত্রাপুর (পদ্মা, ধলেশ্বরী এবং ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে)। ঢাকার নয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল তাঁর রাজধানী সোনারগাঁও। 'বারো' ভুঞাদের মধ্যে কয়েকজন মুসা খাঁর সহায়তা করতেন। ভুঞাদের সংখ্যা ঠিক বারো জন ছিল কিনা বলা যায় না, তাঁদের নামের সম্পূর্ণ তালিকাও পাওয়া যায় না। হিন্দু জমিদারদের মধ্যে দুজন—ভূষণার রাজা সত্রাজিৎ এবং ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ—মোগলদের রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করেছিলেন। সত্রাজিতের আধিপত্য ছিল যশোহর এবং ফরিদপুর জেলায়। সমগ্র শ্রীহট্ট জেলায় আফগান-দের আধিপত্য ছিল। শ্রীহট্টের সংলগ্ন ত্রিপুরায় স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ছিল। উত্তর-পূর্বে কামতা বা কোচবিহারের রাজা মানসিংহের আমলে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

যে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক আদর্শ এবং সামরিক শক্তি এই 'খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত' বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি স্বাধীন রাজ্যের গোড়াপত্তন করতে পারত সেকালে তার চিহ্নমাত্রও ছিল না। এখানেই ছিল মোগলদের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। তবু তাদের পক্ষে বাংলা বিজয় সহজ হয় নি। বাংলার জমিদারেরা তাঁদের সীমিত সামরিক শক্তির সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা মোগলদের সঙ্গে বড় যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেন, গেরিলা যুদ্ধ এবং রণতরীর আকস্মিক আক্রমণ ছিল তাঁদের সমরনীতির প্রধান অঙ্গ। বাংলার ভৌগোলিক প্রকৃতি ছিল তাঁদের সহায়।

মোগল অশ্বারোহীরা পূর্ব বাংলার নদী-নালা অতিক্রম করে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত ছিল না। এখানে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত বাঙালী পদাতিক সৈন্য (পাইক) সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। তাদের রণতরীর এবং নাবিকের অভাব ছিল। বর্ষাকালে যুদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বাঙালী জমিদার ছাড়া মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণও তাদের ব্যতিব্যস্ত রাখত।

এই সকল বাধা সুকৌশলে অতিক্রম করে ইসলাম খাঁ মাত্র পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে মান সিংহের আরব্ধ কার্য অনেকটা সম্পূর্ণ করেছিলেন। মুসা খাঁ পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন; তাঁকে ইসলাম খাঁর দরবারে নজরবন্দী করে রাখা হল। অনন্ত মাণিক্য পরাজিত হয়ে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শ্রীহট্টে আফগান নায়কদের পরাজিত করে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হল। শ্রীহট্টের সংলগ্ন হিন্দু রাজ্য কাছাড় আক্রমণ করা হল, রাজা বশ্যতা স্বীকার করলেন। পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ বাংলার হিন্দু জমিদারেরা মোগল প্রভুত্ব মেনে নিলেন।

মুসা খাঁর পতনের পূর্বেই প্রতাপাদিত্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং মুসা খাঁর বিরুদ্ধে মোগলদের সহায়তা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেন নি। পরে মুসা খাঁ এবং অন্যান্য জমিদারদের পরিণাম দেখে ভীত হয়ে তিনি ৮০টি রণতরী সহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ইসলাম খাঁর কাছে পাঠালেন ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য। মোগল সুবাদার রণতরীগুলি ধ্বংস করে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য অধিকার করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর জামাতা রামচন্দ্র পরাজিত ও বন্দী হলেন, বাকলা মোগলের অধীন হল। তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য যশোহর জেলায় বনগাঁর নিকটে, যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি শালকা নামক স্থানে, একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করে বহু সৈন্য, কামান ও রণতরী সংগ্রহ করেছিলেন। মোগল আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে তিনি পলায়ন করলেন। রণতরীগুলি মোগলদের হাতে পড়ল; প্রতাপাদিত্যের নৌবাহিনী শক্তিহীন হল। তিনি ধূমঘাটের নিকটবর্তী কাগরঘাটায় একটি দুর্গ নির্মাণ করে মোগল বাহিনীকে বাধা দিতে প্রস্তুত হলেন। দুর্গটি শত্রুর হস্তগত হলে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। ইসলাম খাঁ তাঁকে বন্দী করে তাঁর রাজ্য দখল করলেন। সম্ভবতঃ তাঁকে একটি লোহার খাঁচায় বন্দী করে দিল্লীতে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু পথিমধ্যে বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'প্রতাপাদিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন—এবং শেষ অবস্থায় মুঘলদের সহিত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে যে প্রকার বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্ত রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, উল্লিখিত কাহিনী তাহার সমর্থন করে না।'[৩] তিনি প্রথমে বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন, পরে প্রতিশ্রুতি

৩। 'বাংলা দেশের ইতিহাস', মধ্য যুগ, ১০৭ পৃষ্ঠা।

ভঙ্গ করে ইসলাম খাঁর অবিশ্বাসভাজন হন, মুসা খাঁর পতনের পরে আবার বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব করেন। 'শেষ অবস্থায়' তিনি বাধ্য হয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ নীতি গ্রহণ করেন, কিন্তু কাগরঘাটায় পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা, রাজনীতিকুশলতা এবং অদম্য সাহসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেনঃ 'প্রতাপের দুশ্চরিত্রতা ও অত্যাচারের জন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ ও প্রতাপের আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।'

মোগলদের সঙ্গে প্রকৃত যুদ্ধ করেছিলেন মুসা খাঁ। তিনি রাজ্য হারিয়েছিলেন, কিন্তু সম্মানিত বন্দী রূপে জীবন কাটাবার সুযোগ পেয়েছিলেন; তাঁকে প্রতাপাদিত্যের মত চরম অপমান ও নির্যাতন সহ্য করতে হয় নি।

কোচ বিহার রাজবংশের একটি শাখা কামরূপে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেছিল। পশ্চিমে সংকোশ নদী থেকে পূর্বে বরা নদী পর্যন্ত এই রাজ্যটি বিস্তৃত ছিল। রাজা পরীক্ষিৎ নারায়ণ সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী ছিলেন। আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলায় ধুবড়িতে একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। পরীক্ষিৎ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর জেলার বিস্তৃত অঞ্চল (বাহির-বন্দ ও ভিতরবন্দ) অধিকার করেছিলেন। ইসলাম খাঁর নির্দেশে কামরূপ আক্রমণ করা হল। পরীক্ষিৎ পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন; তাঁর রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

* * *

ইসলাম খাঁর পরবর্তী সুবাদারদের সামরিক ও রাজনৈতিক দক্ষতার অভাবে বাংলায় প্রায় তিন দশক মোগল শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। কাসিম খাঁর আমলে (১৬১৪-১৭) কোচ বিহার, কামরূপ ও কাছাড়ে বিদ্রোহ হল, আসাম ও চট্টগ্রাম জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হল, আরাকানের রাজা দু'বার ভুলুয়া আক্রমণ করলেন। ইব্রাহিম খাঁ (১৬১৭-২৪) মোটামুটি শান্তি রক্ষা করেছিলেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্য জয় করেন।

১৬২২ সালে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র শাহ জাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। দাক্ষিণাত্যে পরাজিত হয়ে তিনি সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এখানে নিজস্ব একটি রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র স্থাপন। তাঁর আশা ছিল যে মুসা খাঁর পুত্র, আরাকানের রাজা এবং পর্তুগীজেরা তাঁর সহায়তা করবেন। তিনি রাজমহল অধিকার করলেন; ইব্রাহিম খাঁ যুদ্ধে নিহত হলেন। কয়েক মাস বাংলায় রাজত্ব করে শাহ জাহান বাদশাহী ফৌজের চাপে দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ জাহান দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন (১৬২৮)। তাঁর রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁর নির্দেশে সুবাদার কাসিম খাঁ (১৬২৮-৩২) হুগলী বন্দর থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করেন। দীর্ঘকাল-

ব্যাপী যুদ্ধের পর আসামের অহোম রাজাদের সঙ্গে সন্ধি করা হল। কামরূপ মোগলদের হস্তচ্যুত হয়েছিল, আবার সেখানে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এবং শাহ জাহানের রাজত্বকালের প্রথম দশকে (১৬০৫-৩৯) মোট ১২ জন সুবাদার বাংলার শাসনভার বহন করেন। অনেকের কার্যকাল স্বল্পকালস্থায়ী ছিল; কয়েকজন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অধিকাংশ সুবাদারের সামরিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতার অভাব ছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ, আরাকানরাজ ও পর্তুগীজদের আক্রমণ, জমিদারদের পূর্ব অধিকার পুনরুদ্ধারের প্রয়াস, ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার ত্রুটি – বাংলার বহুমুখী সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য ছিল না।

শাহ জাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা দীর্ঘকাল বাংলার সুবাদার ছিলেন (১৬৩৯-৫৯)। তাঁর আমলে বাংলার শাসনকার্যে স্থিতিশীলতা এসেছিল। আওরঙ্গ-জেবের রাজত্বকালে এই স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। তাঁর মামা শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার ছিলেন প্রায় ২৩ বৎসর (১৬৬৪-৮৮)। সম্রাটের পৌত্র আজিম-উশ-শান বাংলার সুবাদার ছিলেন এক দশক (১৬৯৮-১৭০৭)। কয়েক বৎসরের ব্যবধানে সুবাদার পরিবর্তনের ফলে অনেক সময় শাসনকার্যের ও সমরনীতির সহজ গতি ব্যাহত হত। সুবাদারেরা সাধারণ ভাবে সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন, কিন্তু স্থানীয় সমস্যার সমাধানে তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও মতামত প্রতিফলিত হত। সুজার সময় থেকে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) পর্যন্ত বাংলার শাসন-ব্যবস্থা এই দুর্বলতা থেকে মোটামুটি মুক্ত ছিল। তা'ছাড়া সম্রাটের নিকট আত্মীয় সুবাদার হলে তিনি যে সম্মান, প্রভাব ও ক্ষমতা ভোগ করতেন সেটা রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন সুবাদারেরা আশা করতে পারতেন না। স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তিরা এবং বাদশাহী দরবারের ওমরাহেরা নানারকম বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র করে সাধারণ সুবাদারদের বিপর্যস্ত করতে পারতেন; যে সুবাদার সম্রাটের আত্মীয় তাঁর পক্ষে এই বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। ফলে প্রশাসন শক্তিশালী হয়েছিল।

আচার্য রমেশ চন্দ্র বলেছেন, শাহ জাহান এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে 'বাংলার কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস ছিল না। ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার শাসনপ্রণালীও মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য সুবার ন্যায় নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত।'[৪] বাংলা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্য হারালেও সপ্তদশ শতাব্দীতে তার 'স্বতন্ত্র ইতিহাস' ছিল। বাংলায় যে ধরণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছিল অন্যান্য সুবার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

শাহ জাহান এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার উত্তর-পূর্বে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, রাজ্যবিস্তারের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টা চলেছিল। সুবাদার

৪। তদেব, ১৪০ পৃষ্ঠা।

মীর জুমলার সময়ে (১৬৬০-৬৩) ভারতের এই অঞ্চলে মোগল শক্তির প্রসার ঘটেছিল, কিন্তু দুই দশক পরে (১৬৮২) মোগলেরা আসাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। তখন মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ সুরু হয়েছিল ; দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে আওরঙ্গজেব চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই যুগে বাংলায় ইংরেজ এবং ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে মোগল সরকারের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। শায়েস্তা খাঁর সুদীর্ঘ শাসনকালের প্রধান সামরিক কৃতিত্ব আরাকানের হাত থেকে চট্টগ্রাম অধিকার (১৬৬৬)। ১৬৮৪ সালে কোচ বিহার দ্বিতীয় বার বিজিত হয়েছিল।

শায়েস্তা খাঁ সম্বন্ধে বাংলার প্রথম ইংরেজ ঐতিহাসিক চার্লস্ স্টুয়ার্ট ১৮১৩ সালে লিখেছিলেন : মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁর প্রশংসা করেছেন, কিন্তু ইংরেজেরা তাঁকে অত্যাচারী বলে নিন্দা করেছেন। তাঁর আমলে বাংলায় টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। তিনি ঢাকায় নানারকম দালান-ইমারত নির্মাণ করেছিলেন।

১৬৩২ সালে মানরিক (Manrique) টাকায় পাঁচ মণ চাল বিক্রী হতে দেখেছিলেন। ঢাকা শস্যশ্যামলা পূর্ব বাংলার চাল উৎপাদনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। সেখানে চালের দাম আরো কম হওয়ার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ছিল না। শায়েস্তা খাঁর জনপ্রিয়তার কারণ ছিল তাঁর জাঁকজমক, বহু দাসদাসী ও কর্মচারী পোষণ, মুসলমান পীর-ফকীরদের উপকারার্থ দান-দক্ষিণা, ইত্যাদি। তিনি একচেটিয়া ব্যবসায়ের মাধ্যমে প্রজাদের শোষণ করতেন এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতেন। সমসাময়িক ইংরেজদের বিবরণীতে তাঁর অর্থলোভের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর সুবাদারীর প্রথম ১৩ বৎসরে তিনি ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। সম্রাটকে প্রচুর অর্থ পাঠিয়ে তিনি বাদশাহী দরবারকে সন্তুষ্ট রাখতেন। প্রজাপীড়ন না করে এই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁর আমলে বাংলায় কঠোর শৃংখলা ও শান্তি বজায় ছিল। তিনি নিজে জরাগ্রস্ত ছিলেন, বাংলায় এসেছেলেন ৬৩ বছর বয়সে। তিনি বিলাসে ও আলস্যে সময় কাটাতেন, কিন্তু রাজকার্য নির্বাহের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী ছিল।

সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর সময়ে (১৬৮৯-৯৮) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতোবরদার জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমান ও হুগলী অধিকার করেছিলেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন উড়িষ্যার আফগান-নায়ক রহিম খাঁ। শোভা সিংহের অপঘাত মৃত্যুর পর রহিম খাঁ বিদ্রোহের নায়কত্ব গ্রহণ করে মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন এবং মালদহ ও রাজমহল অধিকার করলেন। তাঁর অনুচরদের লুটপাটের ফলে পশ্চিম বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চল বিপর্যস্ত হল। ইব্রাহিম খাঁ এই বিদ্রোহ দমন করতে পারলেন না। তখন আওরঙ্গজেব তাঁকে পদচ্যুত করে নিজের পৌত্র আজিম-উশ-শানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করলেন। রহিম খাঁ পরাজিত ও নিহত হলেন।

আওরঙ্গজেব দীর্ঘকাল রাজধানী থেকে দূরে দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যস্ত ছিলেন; উত্তর ভারতের শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওমরাহদের অধিকাংশ তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে থাকতেন। বাদশাহী সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সেখানেই যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। ফলে উত্তর ভারতে বাদশাহী শাসনের কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছিল। শোভা সিংহ এবং রহিম খাঁর বিদ্রোহ এই দুর্বলতার ফল।

২। আরাকান

বাংলার সঙ্গে আরাকানের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল মুসলমান আমলের অনেক আগে। এর একটা প্রধান কারণ ভৌগোলিক সান্নিধ্য। আরাকান চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরার দক্ষিণে, পাহাড় ও বনাঞ্চল দ্বারা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে চট্টগ্রাম এবং আরাকানের সীমারেখা চিহ্নিত করত ক্ষুদ্র নাফ নদী। আরাকানের পূর্বে ব্রহ্মদেশ, সীমান্তে রয়েছে আরাকান ইয়োমা পর্বতমালা। মাত্র তিনটি গিরিপথ আছে যেখান দিয়ে স্থলপথে আরাকান থেকে ব্রহ্মদেশে যাতায়াত করা সম্ভব। ব্রহ্মদেশের পরাক্রান্ত রাজারা সময় সময় আরাকানে আধিপত্য স্থাপন করতেন, কিন্তু আরাকান সুযোগ পাওয়া মাত্রই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করত। সুলতান জলালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৮-৩৩) আরাকানরাজ ব্রহ্মরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সুলতানের সামরিক সাহায্যে স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৮৫ সালে ব্রহ্মরাজ আরাকান জয় করেন। নতুন শাসকদের অত্যাচারে বহু আরাকানবাসী নাফ নদী অতিক্রম করে ব্রিটিশ-শাসিত চট্টগ্রাম জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এই শরণার্থীদের বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলা সরকার লেফটেনাণ্ট কক্স নামক এক সামরিক অফিসারকে প্রেরণ করেন। তিনি শরণার্থীদের জন্য একটি বাজার স্থাপন করেন এবং এটি কক্স বাজার নামে পরিচিত হয়। পরে বাংলা সরকার এই স্থানটিকে একটি মহকুমা শহর বলে স্বীকৃতি দেন। এসব ঘটনার পরেও আরাকানে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলতে থাকে এবং চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্ত সম্বন্ধে ইংরেজ সরকার এবং ব্রহ্মরাজের মধ্যে মতবিরোধের উদ্ভব হয়। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪-২৬) অনেকাংশে এই পরিস্থিতির পরিণতি। এই যুদ্ধের ফলে আরাকান এবং ব্রহ্মরাজ্যের আর একটি প্রদেশ (টেনাসেরিম) কোম্পানীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৮২৬)। বাংলা সরকারের অধীনে একজন কমিশনার আরাকান শাসন করতেন। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে ব্রহ্মরাজ্যের আর একটি প্রদেশ (পেগু) কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয় (১৮৫২)। ১৮৬২ সালে আরাকান, পেগু এবং টেনাসেরিম সম্মিলিত করে একটি চীফ কমিশনারের শাসনাধীন স্বতন্ত্র

প্রদেশ গঠন করা হল। বাংলার সঙ্গে আরাকানের প্রশাসনিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হল। ক্রমে দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সংযোগের স্মৃতি হারিয়ে গেল।

আরাকানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত থাকলেও ইসলাম ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। রাজাদের দুটি করে নাম থাকত; একটি বৌদ্ধ নাম, একটি মুসলমানী নাম। যেমন, মেঙ ফলঙ—সিকান্দর শাহ (১৫৭১-৯৩), মেঙ রদজগুই—সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২)। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের মুদ্রায় ফার্সী অক্ষরে 'কল্মা' খোদাই করা হত। মুসলমানদের কাছে আরাকানের নাম ছিল 'রখঙ্গ' বা 'রোসাঙ্গ'। রাজদরবারে মুসলমান মন্ত্রী এবং বাংলা সাহিত্যের সমাদর ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান কবি আলাওল আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার মন্ত্রী সুলেমানের অনুরোধে বাংলা কাব্য রচনা করেন।

বাংলা দেশে আরাকানবাসীরা 'মগ' নামে পরিচিত ছিল। 'মগের মুলুক' কথাটি তাদের অত্যাচারের স্মারক রূপে বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করেছে। মগদের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাদের সহযোগী ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুরা। মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা বন্দুক ব্যবহার করত, কিন্তু বাঙালীরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানত না। তাই লুণ্ঠনকারীরা প্রায় বিনা বাধায় তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারত। দ্বিজ বংশীদাস লিখেছেন: 'মগ ফিরিঙ্গি যত। বন্দুক পলিতা হাত। একবারে দশ গুলি ছোটে।' তারা সমুদ্রে বাঙালী বণিকদের বাণিজ্যতরী লুণ্ঠন বা ধ্বংস করত, নদীপথে দেশের ভিতরে প্রবেশ করে গ্রামাঞ্চল লুণ্ঠন করত এবং অনেক গ্রামবাসীকে বন্দী করে নিয়ে যেত। বন্দী স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকাকে দাস রূপে দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলিতে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের কাছে বিক্রয় করা হত। প্রত্যেক বন্দীর হাতের তালুতে ছিদ্র করে ঐ ছিদ্রে বেত ঢুকিয়ে দিয়ে হাত দুটি বেঁধে রাখা হত। সব বন্দীকে জাহাজের খোলের মধ্যে রাখা হত, খাবার জন্য দেওয়া হত শুকনো চাল। কোন শিশু কান্নাকাটি করলে তাকে মেরে ফেলা হত। কোন ব্রাহ্মণ পরিবারের স্ত্রী বা কন্যা মগদের হাতে বন্দী হলে সেই পরিবার সমাজে 'মঘ দোষে দুষ্ট' বলে গণ্য হত।

মগদের অত্যাচার অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত ছিল। ১৬৪৮ সালে ইংরেজ বণিকদের ঢাকা কুঠিতে মগদের উপদ্রবে বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৭১৭ সালে মগেরা দক্ষিণ বাংলা থেকে প্রায় ১৮০০ স্ত্রীপুরুষকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৭১) সমগ্র সুন্দরবনকে 'মগদের অত্যাচারের ফলে জনশূন্য ('depopulated by the Maghs') বলে দেখানো হয়েছে এবং সুন্দরবনের যে অংশ বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সেই অংশে কয়েকটি দুর্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এগুলি মগদের লুণ্ঠন রোধ করার জন্য ব্যবহৃত হত ('held against the Maghs')। পার্বত্য ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম জেলার সংলগ্ন নোয়াখালি জেলায় কোন কোন অঞ্চলে শকুনকে 'মগধেশ্বরী'র

(মগদের এক দেবীর) অনুচর বলে গণ্য করা হত। ১৭৭০ সালে ইংরেজেরা মগ লুণ্ঠনকারীরা যাতে বাংলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য কলকাতা থেকে শিবপুর পর্যন্ত একটি মোটা লোহার শিকল টানিয়ে দিয়েছিল। ১৭৭৮ সালে ভুলুয়ার (নোয়াখালির) লবণব্যবসায়ীরা মগ আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হবার জন্য কোম্পানীর কাছে কিছু সুবিধা পেয়েছিল।

ইংরেজের সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরেও ভয় দূর হয় নি। আরাকান অধিকারের পর ব্রহ্মরাজ নিজেকে পূর্ববর্তী আরাকানরাজদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। ১৮১৮ সালে ব্রহ্মরাজের প্রতিনিধি রূপে আরাকানের শাসনকর্তা গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের নামে লিখিত এক চিঠির মাধ্যমে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং কাসিমবাজারের প্রত্যর্পণ দাবি করেন। পরে আসামে ব্রহ্মরাজের আধিপত্য স্থাপিত হল এবং বাংলার উত্তর-পূর্বে, পূর্বে এবং দক্ষিণে ব্রহ্ম বাহিনীর অগ্রগতির সূচনা হল। তখন বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট লিখলেন (১৮২৪): আসামে অবস্থিত ব্রহ্মবাহিনী পাঁচ দিনের মধ্যে কোম্পানীর গোয়ালপাড়া সীমান্তে এবং ১৫ দিনের মধ্যে ঢাকায় উপস্থিত হতে পারে— ব্রহ্মপুত্র দিয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়েই স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে নৌকা ছিনিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে খুবই সহজ। আসাম এবং পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক প্রকৃতি এমন ছিল যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদীপথে বহুসংখ্যক ব্রহ্ম সৈনিক কোম্পানীর রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করতে পারত।

'মগের মুলুক' কথাটা লুণ্ঠনের স্মৃতিই বহন করত, কিন্তু আক্ষরিক অর্থেও এটা পূর্ব বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চল সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানরাজ আলি খাঁ (১৪৩৪-৫৯) চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমান্তে রামু অধিকার করেন। পরবর্তী আরাকানরাজ কলিম শাহ (১৪৫৯-৮২) চট্টগ্রাম বন্দর অধিকার করেন। সিকান্দর শাহ (১৫৭১-৯৩) সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ অধিকার করেন। সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২) ভুলুয়ার অধিপতি অনন্ত মাণিক্যকে মোগলদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন এবং পরে শ্রীপুর, বিক্রমপুর ও ভুলুয়া আক্রমণ করেন। হোসেন শাহ (১৬১২-২২) বারবার মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। ১৬১৬ সালে মোগলদের চট্টগ্রাম আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ১৬২৬ সালে আরাকানরাজ ঢাকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে রাজধানী লুণ্ঠন করেন। জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল অধিকার ব্রিটিশ আমলের চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালি জেলার সীমান্তে ফেণী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল; তার ওপারে ছিল আরাকান-রাজের মুলুক। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে চট্টগ্রামে ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবপত্রে 'মগ সাল' (খ্রীস্টীয় সালের চেয়ে ৬৩৮ বৎসর কম) ব্যবহৃত হত। অষ্টাদশ শতকের ষাটের দশকে ভেরেলস্ট (Verelst) চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করে আরাকানের রাজার কাছ থেকে এক চিঠি পেয়েছিলেন। তাতে তাঁকে

অনুরোধ করা হয়েছিল যেন চট্টগ্রাম ও আরাকানের সীমান্তে বনজঙ্গলে ঢাকা অঞ্চলে চাষের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে 'নোয়াবাদ' পত্তন করা হয়েছিল।

আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুজা সপরিবারে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকানরাজ তাঁকে নিজের জাহাজে মক্কায় পেঁছে দিতে সম্মত হন, কিন্তু কয়েক মাস পরে তিনি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সুজার এক মেয়েকে বিয়ে করতে চান। সুজা অসম্মত হয়ে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। সুজা নিহত হন এবং তাঁর সঞ্চিত ঐশ্বর্য আরাকানরাজের হস্তগত হয়। সম্ভবতঃ সুজার সঙ্গে ত্রিপুরার রাজার যোগাযোগ ঘটেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান লেখকেরা আরাকানের রাজাদের সামরিক শক্তির বিবরণ দিয়েছেন। 'বহারিস্তানে' বলা হয়েছে, মগ রাজার এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ১৫00 হাতী এবং ১0,000 রণতরী ছিল। অন্যত্র বলা হয়েছে, তাঁর রণতরীর সংখ্যা সমুদ্রের ঢেউ থেকে বেশি, আর তাঁর কামান গণনা করে শেষ করা যায় না। এই বিবরণ অতিরঞ্জিত হলেও এর থেকে মগদের সামরিক বল সম্বন্ধে মোগলদের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুবাদার শায়েস্তা খাঁ বাংলায় মগ এবং পর্তুগীজদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তাদের প্রধান ঘাঁটি সন্দ্বীপ এবং চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এজন্য প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন। মোগলদের নৌবহর (নওয়ারা) সুজার দীর্ঘ শাসনকালে তাঁর শৈথিল্যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারপর মীর জুমলার আসাম আক্রমণ কালে অনেক রণতরী নষ্ট হয়েছিল। শায়েস্তা খাঁ প্রায় ৩00 রণতরী নির্মাণ করলেন। নির্মাণের কেন্দ্র ছিল ঢাকা, হুগলী, যশোর, বালেশ্বর, চিলমারি, করিবারি ও মোরঙ। গঠন অনুযায়ী রণতরীগুলির নানারকম নাম ছিল—মহলগিরি, গরবা, কোষ, কুশত, জলবা, বচরি, পরন্ডা ইত্যাদি।

তখন চট্টগ্রাম থেকে জলপথে সন্দ্বীপের দূরত্ব মাত্র ছয় ঘণ্টা। এটি মেঘনার মোহানায় একটি ছোট দ্বীপ; ১৮৮১ সালের জরিপের সময় মোট জমি ছিল ২২0 বর্গ মাইল। আকবরের আমলে তোড়রমল এই দ্বীপের রাজস্ব ধার্য করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এখানে পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি ছিল। ১৬১৬ সালে আরাকানরাজ সন্দ্বীপ অধিকার করেন। শায়েস্তা খাঁর সময়ে দ্বীপটি মোগল বাহিনীর এক পলাতক সেনানায়কের অধিকারে ছিল। তাঁকে পরাজিত করে মোগল সৈন্যদল চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হল। জলযুদ্ধে এবং স্থলযুদ্ধে মগেরা পরাজিত হল। চট্টগ্রাম মোগলের অধিকারভুক্ত হল (২৫ জানুয়ারী ১৬৬৬)[৭]

মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে 'নওয়ারা'তে ৭৬৮টি রণতরী ছিল। প্রধান ঘাঁটি

ছিল ঢাকা। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মগ এবং ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের প্রতিরোধ করা। নৌবহরের জন্য বার্ষিক ব্যয় ছিল ৮,১৩,৪৫২ টাকা। এই টাকা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার পরগণাগুলি থেকে পৃথক কর হিসাবে সংগ্রহ করা হত। ইংলণ্ডে রাজা প্রথম চার্লস সমুদ্রতীরে অবস্থিত বন্দর থেকে যে জাহাজ কর (Ship Money) আদায় করতেন তার সঙ্গে এই নৌ-করের তুলনা করা যেতে পারে।

আরাকানের রাজাদের আক্রমণ থেকে ত্রিপুরাও রক্ষা পায় নি। অমর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৫৭৭-৮১) আরাকানরাজ ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর লুণ্ঠন করেন। মনের দুঃখে অমর মাণিক্য বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করেন। যশোধর মাণিক্য (১৬০০-১৬২৫) মোগলদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে আরাকানে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মোগল সৈন্য তাঁকে অনুসরণ করে বন্দী করেছিল।

আরাকানের রাজধানী ছিল বর্তমান আকিয়াব জেলার অন্তর্গত ম্রোহং। ১৮২৬ সালে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার পর সমুদ্রতীরে অবস্থিত আকিয়াবে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আগে এটি ছিল জেলেদের গ্রাম।

৩। ফিরিঙ্গি বণিক (১)

বাংলায় পর্তুগীজেরা প্রথম প্রবেশ করেছিল হোসেন শাহের রাজত্বকালে—১৫১৮ সালে; কিন্তু প্রায় দুই দশক তারা এখানে কোনরকম সাফল্য লাভ করতে পারে নি। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল চট্টগ্রাম বন্দরে বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন। তারা চট্টগ্রামকে বলত 'বড় বন্দর' ('porto grande'), সাতগাঁওকে বলত 'ছোট বন্দর' ('porto pequeno')। সুলতান মাহমুদ শাহ শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় পর্তুগীজদের সাহায্য চেয়েছিলেন এবং বিনিময়ে দুটি বন্দরেই তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। মাহমুদ শাহ রাজ্য হারালেন, প্রাণও হারালেন; পর্তুগীজদের চট্টগ্রাম অধিকারের চেষ্টা বিফল হল (১৫৩৮)।

বিশ বৎসর পরে—১৫৫৯ সালে—বাকলার রাজা পরমানন্দ রায় পর্তুগীজদের সঙ্গে এক সন্ধি করেন। বাকলা রাজ্যে পর্তুগীজদের বাণিজ্যের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হল। বাকলার রাজাদের সাহায্য থেকে পর্তুগীজরা বিপদের দিনে বিশেষ উপকার পেয়েছিল। পরমানন্দের পুত্র রামচন্দ্রের আমলে একজন জেসুইট মিশনারী তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর রাজ্যে ধর্মপ্রচার ও গির্জা নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন। রামচন্দ্রের সৈন্যদলে একজন পর্তুগীজ সেনানায়ক এবং অল্পসংখ্যক পর্তুগীজ সৈনিক ছিল। পর্তুগীজ ভাগ্যান্বেষীরা বাংলার বারভুঞা-দের সৈন্যদলে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার এবং সামরিক দৌরাত্ম্যের মারফতে অর্থলুণ্ঠন পর্তুগীজদের কার্যক্রমের প্রধান অঙ্গ ছিল। পর্তু-

গীজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের অপরাধে রামচন্দ্রকে শাস্তি দেবার জন্য আরাকান-রাজ তাঁর রাজ্য অধিকার করলেন। পরে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর আক্রমণে বাকলা রাজ্য মোগলদের অধিকারভুক্ত হল।

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে ডমিঙ্গো কার্ভালহো (Domingo Carvalho) শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের সেনানায়কত্ব গ্রহণ করে তাঁর নামে সন্দ্বীপ জয় করেন। কিন্তু আরাকানরাজের আক্রমণে অল্পদিন পরেই সন্দ্বীপ তাঁর হস্তচ্যুত হয়েছিল। নৌযুদ্ধের দিক থেকে সন্দ্বীপের গুরুত্ব ছিল, তা'ছাড়া এটি ছিল লবণের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানকার অধিবাসীরা ছিল প্রধানতঃ মুসলমান।

সন্দ্বীপ হারাবার পর কার্ভালহো শ্রীপুরে এসে কেদার রায়ের পক্ষে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পরে যশোহরের প্রতাপাদিত্য তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন। সম্ভবতঃ আরাকানরাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি এই কাজ করেছিলেন। সন্দ্বীপ এবং বাকলা অধিকার করে আরাকানরাজের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল এবং তাঁর অধিকার প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁকে সন্তুষ্ট করা প্রতাপাদিত্যের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। আর এক পর্তুগীজ ভাগ্যান্বেষী সেনানায়ক গঞ্জালেস (Sebastiao Gonsalves Tibau) ১৬০৯ সালে সন্দ্বীপ অধিকার করেন এবং কয়েক বৎসর সেখানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন।

মগদের মত পর্তুগীজেরাও পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে লুণ্ঠন ও নানারকম অত্যাচার করত। সামুদ্রিক বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা বাংলার বণিকদের জাহাজ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করত। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে আছে ঃ

> ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
> রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে॥

'হারমাদ' পর্তুগীজ শব্দ 'আরমাডা'র (Armada) অপভ্রংশ। 'আরমাডা' শব্দের অর্থ সামরিক নৌবহর। হারমাদের অত্যাচারে বাংলার জলপথে বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল।

সন্দ্বীপ থেকে বিতাড়িত হবার পরেও পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় পর্তুগীজদের কয়েকটি ঘাঁটি ছিল। ভুঞা শ্রেণীভুক্ত জমিদারেরা সামরিক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাকলা (বাখরগঞ্জ), চণ্ডিকান (যশোর), শ্রীপুর (ঢাকা), ভুলুয়া (নোয়াখালি) এবং 'কত্রবো' বা কত্রাভু (ঢাকা ও ময়মনসিংহ) অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ (settlement) ছিল। চণ্ডিকানের রাজার অর্থসাহায্যে পর্তুগীজেরা তাঁর রাজ্যে বাংলার প্রথম গির্জা নির্মাণ করেছিল। জেসুইট-পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। ভুঞাদের অধিকৃত অঞ্চলের বাইরে তমলুক, হিজলি প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজদের কর্ম-

তৎপরতা ছিল। ১৫৩৭-৩৮ সালে তারা সাতগাঁও বন্দরে বাণিজ্যকুঠি ও শুল্ক আদায়ের কেন্দ্র স্থাপন করেছিল, কিন্তু চট্টগ্রামই দীর্ঘকাল তাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সরস্বতী নদীর জল ক্রমশঃ কমতে থাকার ফলে সাতগাঁও বন্দরের গুরুত্ব কমে গেল। রালফ্ ফিচ-এর (Ralph Fitch) ভ্রমণকালে (১৫৮৩-৯১) হুগলী ছিল পর্তুগীজদের 'ছোট বন্দর' ('porto piqueno')। সেখানেই তাদের প্রধান উপনিবেশ স্থাপিত হল। তারা গঙ্গার দুই তীরে জমি দখল করল। হুগলীতে প্রধানতঃ চাউল, চিনি এবং রেশম ও সুতী বস্ত্রের কারবার হত। আকবর খ্রীস্টধর্মের তত্ত্ব জানার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাঁর অনুরোধে একজন পর্তুগীজ মিশনারী (Juliano Pereiro) আগ্রায় বাদশাহের দরবারে গিয়েছিলেন। আকবর পর্তুগীজদের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এক 'ফরমান' দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরও পর্তুগীজদের প্রতি অনুকূল ছিলেন।

শাহ্ জাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগে হুগলীতে পর্তুগীজদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল। দুটি ব্যক্তিগত কারণে তিনি পর্তুগীজদের উপর বিরূপ ছিলেন। তিনি যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বাংলায় এসেছিলেন তখন কয়েকজন পর্তু-গীজ সেনানায়ক অর্থলোভে তাঁকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়ে পরে তাঁকে ত্যাগ করেছিল। এ সময়ে বেগম মমতাজ মহলের দুজন দাসীকে অপহরণ করে পর্তুগীজেরা তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছিল। তা'ছাড়া বাংলার জন-সাধারণের পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে দুটি গুরুতর অভিযোগ ছিল। তারা নানা জায়গা থেকে বহু নরনারীকে ধরে এনে তাদের দাস রূপে বিক্রয় করত। হুগলী ছিল এই বিক্রয়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। দ্বিতীয়তঃ, তারা ছলে বলে কৌশলে নদীতীরবর্তী অঞ্চলের বহু মানুষকে খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করত। মোগল সাম্রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থেও হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশটি ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। পর্তুগীজদের ঐশ্বর্য, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা এবং জলপথে তাদের আধিপত্য মোগল সরকারের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারত। মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে একটি কার্যতঃ স্বশাসিত শক্তিকেন্দ্র গঠন সম্বন্ধে উদাসীন থাকা বাদশাহী দরবারের পক্ষে সংগত হত না।

শাহ্ জাহানের আদেশে সুবাদার কাসিম খাঁ হুগলী অবরোধ ও দখল করলেন (১৬৩২)। পর্তুগীজ এবং অন্যান্য ধনী খ্রীস্টানেরা হুগলী ত্যাগ করে চলে গেল। পর বৎসর পর্তুগীজদের হুগলীতে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হল, কিন্তু তখন তাদের ঐশ্বর্য ও সামরিক শক্তি প্রায় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিন দশক পরে শায়েস্তা খাঁ যখন চট্টগ্রাম অধিকার করেন তখন সেখানকার ফিরিঙ্গি অধিবাসীরা মগ রাজার পক্ষ ত্যাগ করে মোগলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজদের আধিপত্য ক্ষুন্ন হল এবং বাংলার বাণিজ্যে তাদের আধিপত্যের যুগ শেষ হল।

বাংলায় 'মগের মুলুক' প্রতিষ্ঠায় পর্তুগীজেরা এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের কাছে বাঙালীর কিছু ঋণ আছে। তারাই বাংলায় তামাক, গোল আলু, কাজু বাদাম, কামরাঙ্গা ও পেয়ারা ফল এবং কৃষ্ণকলি ফুল এনেছিল। ফলে বাংলার কৃষি সমৃদ্ধ হয়েছিল। বাংলা ভাষার কয়েকটি সুপ্রচলিত শব্দ এসেছে পর্তুগীজ ভাষা থেকে (চাবি, বালতি, পেরেক, সাবান, তোয়ালে, আলপিন, বারান্দা, জানালা, কেদারা অর্থাৎ চেয়ার, ইত্যাদি)।

পর্তুগীজেরাই বাংলায় গদ্য রচনায় পথিকৃৎ ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার – বাংলা ভাষার মাধ্যমে খ্রীস্ট ধর্মের মাহাত্ম্য বাঙালীর কাছে পৌঁছে দেওয়া।

'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামে পরিচিত বইর লেখক ছিলেন একজন বাঙালী খ্রীস্টান। তিনি পূর্ব বাংলায় ভূষণার জমিদারের পুত্র ছিলেন। মগেরা তাঁকে বন্দী করে, পর্তুগীজরা তাঁকে মগদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে। তখন তাঁর নাম হল দোম্ আন্তোনিও। তিনি বাস করতেন ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় নাগরী গ্রামে। 'পশ্চিম বঙ্গে যেমন হুগলী-ব্যাণ্ডেল পর্তুগীজদের বাণিজ্যের ও ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র হয় পূর্ব বঙ্গে তেমনি ঢাকা-ভাওয়ালে তাদের ধর্মকর্মের বড় রকম আস্তানা গড়ে ওঠে। সেখানে ও তার আশে পাশে বহু পর্তুগীজ ও দেশীয় খৃস্টান ও দোঁ-আসলা ফিরিঙ্গির বাসভূমি হয়।'

দোম্ আন্তোনিওর জীবনকাল সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে। নতুন ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তখন বাংলায় গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হয় নি, নিজের গদ্য রচনার প্রকৃতি তিনি নিজেই স্থির করেছিলেন। তিনি মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করেছেন: বাংলা কাব্যে প্রচলিত সাধুভাষা, ভাওয়াল-অঞ্চলের কথ্যভাষা এবং পর্তুগীজ ভাষার রচনারীতি মিলিয়ে তিনি গদ্যের কাঠামো তৈরি করেছেন। বইটির বিষয়বস্তু হল হিন্দু ধর্মের অবতারবাদ সম্বন্ধে এক ব্রাহ্মণ এবং এক পাদ্রীর মধ্যে বিতর্ক এবং ব্রাহ্মণের পরাজয়।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বইটির গুরুত্ব অপরিসীম, কিন্তু—সম্ভবতঃ প্রচারের অভাবে—বাংলা সাহিত্যে এই নবজাত গদ্যের প্রভাব পড়ে নি। 'তখন এদেশে বাংলা বই ছাপার ব্যবস্থা ছিল না, বাংলা লিপির হরফও তৈরী হয় নি। তাই রোমান অক্ষরে লিপ্যন্তর (transliteration) করে ছাপাবার জন্যে বইটির পাণ্ডুলিপি (পর্তুগালের রাজধানী) লিস্‌বনে পাঠানো হয়' ১৭২৬ সালে। কিন্তু সেখানেও বইটি ছাপা হয় নি। ছাপা হয়েছিল কলকাতায়—১৯৩৭ সালে।

অষ্টাদশ শতকে পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল দা আসসুম্পসাম্ বাংলা গদ্যে

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' নামে বই লিখেছিলেন, তবে মাঝে মাঝে পদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। এই বই ছাড়া বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ তিনি লিখেছিলেন পর্তুগীজ ভাষায়; এর সঙ্গে যুক্ত ছিল পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ। দুখানি বই-ই ১৭৪৩ সালে লিসবনে ছাপা হয়েছিল—রোমান অক্ষরে। কিন্তু তখন বাংলায় পর্তুগীজদের প্রভাব অস্তমিত। সেকালের বাঙালী লেখকেরা বই দুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যে পর্তুগীজদের অবদান সম্বন্ধে বাঙালী সচেতন হয়েছে বিংশ শতকে।

৪। ফিরিঙ্গি বণিক (২)

সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ বণিকদের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হল, ইংরেজ-ওলন্দাজ-ফরাসী বণিকদের অভ্যুদয় হল।

১৬০০ সালে লণ্ডনের এক বণিক গোষ্ঠী রাণী প্রথম এলিজাবেথের এক সনদের (Charter) বলে প্রাচ্য দেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। একচেটিয়া অধিকার (exclusive right, monopoly) অর্থ এই যে এই বণিক-গোষ্ঠীর বাইরে রাণীর আর কোন প্রজা প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করতে অধিকারী হবে না। ইংলণ্ডের সংবিধান অনুসারে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল রাজার হাতে। ১৭৫৩ সালে কোম্পানী রাজা দ্বিতীয় জর্জের কাছ থেকে শেষ সনদ পেয়েছিল। তারপর কোম্পানীর অধিকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে যায় এবং পার্লামেন্ট এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১৭৭৩ সালে 'নিয়ন্ত্রণ আইন' (Regulating Act) পাশ করে। কোম্পানীর অংশীদার না হয়েও অনেক ইংরেজ ব্যক্তিগত ভাবে ভারতে বাণিজ্য করত। তাদের বেআইনী অনুপ্রবেশকারী (interloper) বলা হত।

ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যের সূচনা হয়েছিল পশ্চিম ভারতে। মোগল সম্রাটেরা নবাগত ইংরেজ বণিকদের সুনজরে দেখেন নি। আকবরের দরবারে পর্তুগীজ পাদ্রীদের কিছু প্রভাব ছিল। সেটা তারা ব্যবহার করেছিল পর্তুগীজ বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ বণিকদের বিরুদ্ধে। কাপ্তেন উইলিয়ম হকিন্স (William Hawkins) আগ্রায় গিয়ে জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেও সুরাট বন্দরে কুঠি স্থাপনের অনুমতি আদায় করতে পারেন নি। ১৬১১-১২ সালে কাপ্তেন মিডলটন (Middleton) সুরাটের মোগল শাসনকর্তার অনুমতি নিয়ে সেখানে কুঠি স্থাপন করেন। পর্তুগীজদের সঙ্গে সুরাটের কাছে একটি নৌযুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হল। ইংরেজদের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে মোগল শাসকেরা সচেতন হল। ক্রমশঃ সুরাট থেকে ইংলণ্ডের বাণিজ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে প্রসারিত হল। ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেমসের দূত স্যার টমাস রো (Sir Thomas Roe) জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি বাণিজ্যের

অনুমতি আদায় করতে পারেন নি, তবে ইংরেজরা সুরাটে বাস করার এবং দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত করার অধিকার লাভ করল।

ভারতের পূর্ব উপকূলে ইংরেজরা প্রথমে উপস্থিত হয়েছিল মসুলিপটমে (১৬১১)। সে অঞ্চলে তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ওলন্দাজ বণিকেরা। ১৬৩২ সালে গোলকুণ্ডার সুলতানের 'ফর্মান' নিয়ে তাদের বাণিজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপনের সুযোগ হল। ১৬৩৯ সালে চন্দ্রগিরির রাজার অধীন এক স্থানীয় শাসকের ('নায়ক') সনদ নিয়ে ছয় মাইল লম্বা এবং এক মাইল চওড়া এক ভূখণ্ডের ইজারা নেওয়া হল। সেখানে গড়ে উঠল মাদ্রাজ; দুর্গ নির্মিত হল, কুঠি স্থাপিত হল (১৬৪০)। এটাই ভারতে ইংরেজদের প্রথম উপনিবেশ (Settlement)।

* * *

হল্যাণ্ডের বণিকেরা (Dutch, ওলন্দাজ) প্রাচ্য দেশে বাণিজ্যের জন্য ১৬০২ সালে এক কোম্পানী গঠন করেছিল। তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পর্তুগীজেরা। তারা সিংহল অধিকার করেছিল, মসলার ব্যবসায়ের জন্য জাভায় আধিপত্য স্থাপন করেছিল। মসলার ব্যবসায়ের দিকে ইংরেজদেরও দৃষ্টি ছিল, কিন্তু ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে তারা ভারতের বাণিজ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিল।

উড়িষ্যায় ওলন্দাজদের কুঠি স্থাপিত হয়েছিল প্রথমে পিপলিতে, পরে বালেশ্বরে। বাংলায় প্রথম কুঠি স্থাপিত হয় হুগলীতে—১৬৫৩ সালে। চুঁচুড়ায় তারা এক দুর্গ (Fort Gustavus) নির্মাণ করে; তখন বাংলায় ইংরেজদের কোন দুর্গ ছিল না। হুগলীতে এবং কলকাতার সংলগ্ন বরানগরে তাদের অধিকার মোগল সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল। পরে কাসিম বাজারে এবং পাটনায় তাদের কুঠি স্থাপিত হয়। বাংলা থেকে তারা সূতী বস্ত্র, রেশম, বারুদ তৈরীর উপাদান ও আফিম রপ্তানি করে প্রচুর লাভ করত।

* * *

পর্তুগীজ, ইংরেজ এবং ওলন্দাজ বণিকদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে ফ্রান্স ভারতে বাণিজ্যের জন্য ১৬৬৪ সালে একটি কোম্পানী গঠন করেছিল। ফরাসীদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়েছিল সুরাটে এবং মসুলিপটমে। ১৬৭৩ সালে তারা বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত পণ্ডিচেরীর অধিকার লাভ করে। ১৭০১ সালে পণ্ডিচেরী প্রাচ্য দেশে ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। বাংলায় ফরাসীরা চন্দন নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬৭৬ সালে। পণ্ডিচেরীতে তাদের বাণিজ্য লাভজনক ছিল; কিন্তু নানারকম অসুবিধার জন্য সুরাট ত্যাগ করতে হল এবং মসুলিপটমে বাণিজ্য লাভজনক হল না। অষ্টাদশ শতকের প্রথম তিন দশকে—যখন বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রসারিত হচ্ছিল সেই সময়ে— বাংলায় ফরাসীদের বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয় ছিল।

৫। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা

রমেশ চন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ টোড়র মল ছিলেন পাঞ্জাবী ক্ষত্রী। অসি ও মসীর ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়ে তিনি আকবরের আস্থা-ভাজন হয়েছিলেন। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারক রূপে আকবরের রাজত্বের ইতিহাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

দায়ূদ কররানীর পতনের পরে মোগল বাহিনী যখন বাংলায় পাদশাহী আধিপত্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল তখন তোড়র মল বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন (১৫৮২)। তিনি যে কাঠামো তৈরি করেন সেটা মুর্শিদকুলি খাঁর আমল (১৭২২) পর্যন্ত মোটামুটি বজায় ছিল।

টোড়র মলের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা দরকার। ১৫৮২ সালে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলই পাদশাহী প্রশাসন-ব্যবস্থার বাইরে ছিল। যে সব অঞ্চল ঐ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেখানেও জমি জরিপ করা সম্ভব ছিল না, কারণ নানা স্থানে যুদ্ধ চলছিল। বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পাদশাহী দরবারে কোন কাগজপত্র ছিল না, কারণ সুলতানী আমলে বাংলার প্রশাসনের উপর দিল্লীর কোন রকম কর্তৃত্ব ছিল না। এই সকল কারণে টোড়র মল সুলতানী আমলের কানুনগোদের কাছ থেকে কাগজপত্র সংগ্রহ করে তারই ভিত্তিতে বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি করেছিলেন। এই কাঠামোটি আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে পাওয়া যায়।

টোড়র মলের সংগৃহীত তথ্য সুলতানী আমলের শেষ দিকে বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 'আইন-ই-আকবরী' অনুসারে বাংলা ১৯টি 'সরকারে' বিভক্ত ছিল। এই বিভাগ টোড়র মল করেন নি, শের শাহ করেছিলেন। এই ১৯টি সরকারের অন্তর্গত ছিল ৬৮২টি মহল। সমগ্র বাংলার জন্য টোড়র মলের নির্ধারিত রাজস্ব ছিল ১০, ৬৮৫, ৯৪৪ টাকা। যে সব অঞ্চল মোগলদের অধিকারে ছিল না (যেমন, চট্টগ্রাম) তাদের রাজস্বও এর মধ্যে ধরা হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলার তৎকালীন সুবাদার, শাহ জাহানের তৃতীয় পুত্র সুজা, মোট রজেস্ব ধার্য করেছিলেন ১৩, ১১৫, ৯০৭ টাকা। তখন সরকারের সংখ্যা ছিল ৩৪। জাহাঙ্গীর ও শাহ জাহানের আমলে মোগল-শাসন প্রসারিত এবং শৃংখলাবদ্ধ হবার ফলে শাসিত অঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি এবং রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটেছিল।

আবুল ফজল কর্তৃক উল্লেখিত সরকারগুলির নাম ও ভৌগোলিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে সুলতানী আমলের শেষ দিকে এবং মোগল আমলের প্রথম দিকে বাংলার প্রশাসনিক বিভাগ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা করা যায়।[১]

১ Blochmann, *Contributions to the Geography and History of Bengal*, ৭-১১ পৃষ্ঠা।

১। সরকার লখনৌতি (ভাগলপুর ও পূর্নিয়া জেলার কিয়দংশ এবং মালদহ জেলা)।

২। সরকার পূর্নিয়া (পূর্নিয়া জেলার পশ্চিমাংশ)।

৩। সরকার তাজপুর (পূর্নিয়া এবং দিনাজপুর জেলার কিয়দংশ)।

৪। সরকার পঞ্জরা (দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ)।

৫। সরকার ঘোরাঘাট (দিনাজপুর, রংপুর এবং বগুড়া জেলার কিয়দংশ)।

৬। সরকার বারবকাবাদ (মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী এবং বগুড়া জেলার কিয়দংশ)।

৭। সরকার বাজুহা (রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা জেলার কিয়দংশ)।

৮। সরকার সিলহট (শ্রীহট্ট)।

৯। সরকার সোনারগাঁও (ত্রিপুরা এবং নোয়াখালি জেলার কিয়দংশ)।

১০। সরকার চাটগাঁও (চট্টগ্রাম)।

১১। সরকার সাতগাঁও (চব্বিশ পরগণা, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ)।

১২। সরকার মামুদাবাদ (নদীয়া, যশোহর এবং ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ)।

১৩। সরকার খলিফতাবাদ (যশোহর এবং বাখরগঞ্জ জেলার কিয়দংশ)।

১৪। সরকার ফতহাবাদ (যশোহর, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ জেলার কিয়দংশ ও সন্দীপ)।

১৫। সরকার বাকলা (বাখরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ)।

১৬। সরকার তাণ্ডা (মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কিয়দংশ)।

১৭। সরকার সরিফাবাদ (বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কিয়দংশ)।

১৮। সরকার সুলেমানাবাদ (হুগলী, বর্ধমান এবং নদীয়া জেলার কিয়দংশ)।

১৯। সরকার মাদারন (বীরভূম, বর্ধমান এবং হুগলী জেলার কিয়দংশ)।

১৫৮৬ সালে আকবর প্রদেশগুলিতে সুবাদারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বাংলার একটি বৃহৎ অংশ তখন তাঁর কর্তৃত্বের বাইরে ছিল, কিন্তু বাংলাকেও এই শাসন-ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছিল। প্রাদেশিক রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল 'সুবাদারে'র সহযোগী 'দেওয়ানে'র উপরে। তিনি দিল্লীর পাদশাহী 'দেওয়ানে'র কর্তৃত্বাধীনে কাজ করতেন। পাঁচ শ্রেণীর কর্মচারী ভূমি-রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিল। প্রত্যেক 'ক্রোরি' মোট আড়াই লক্ষ টাকা আদায় করতেন। সরকারী দাবি এবং রায়তের বক্তব্য বিচার করে সামঞ্জস্য করতেন 'আমীন'। ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের ('কানুন') ব্যাখ্যা করতেন 'কানুনগো'। প্রাক্-মোগল যুগ থেকেই কানুনগোরা এই কাজ করছিলেন এবং তখনকার জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র তাঁদের কাছে জমা ছিল। তাঁদের

অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার জন্য তোড়র মল প্রত্যেক পরগণায় একজন কানুনগো নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কোম্পানীর শাসন প্রবর্তনের পরেও কানুনগো পদের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। 'মুস্তফী' নামে পরিচিত কর্মচারীরা হিসাবপত্রের রক্ষক ছিলেন। গ্রাম ছিল 'পাটোয়ারী'র কর্মক্ষেত্র।

ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য আবশ্যকমত সৈন্য ব্যবহার করা হত। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, মোগল শাসন ছিল মূলতঃ সামরিক শাসন এবং প্রজারা যথাসময়ে ভূমি-রাজস্ব মিটিয়ে দিতে অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বাঙালী কৃষকের সুনাম ছিল পাদশাহী দরবারে। আবুল ফজল বলেছেন: 'বাংলার রায়তেরা বাধ্য এবং খাজনা দিতে প্রস্তুত। তারা নিজেরাই টাকা বা সোনার মোহর (খাজনা দেবার জন্য) নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসে।' হয়তো জমিদার ও জায়গীরদারের অত্যাচারে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল।

সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন পাদশাহী দেওয়ান। তাঁর নির্দেশ অনুসারে প্রাদেশিক দেওয়ান এবং কর্মচারীরা কাজ করতেন, কাগজপত্র দিল্লীতে পাঠাতেন, গাফিলতি ধরা পড়লে জবাবদিহি করতেন। এটা সুলতানী আমলে প্রচলিত ব্যবস্থার এক মৌলিক পরিবর্তন। তখন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার পরিচালনা কেন্দ্রীভূত ছিল না; জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হত। তোড়র মলের ব্যবস্থার ফলে বাংলার পরিবর্তে ফার্সীতে ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্র রাখার রীতি প্রচলিত হল, কারণ এদের নকল দিল্লীতে পাঠাতে হত। উত্তর ভারত থেকে ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত কর্মচারী প্রেরিত হত, ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে দৈনন্দিন কাজের ভার তাদের হাতে চলে গেল।

মোগল সাম্রাজ্যে প্রশাসনের দিক থেকে জমি প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হত। যে জমি থেকে সরকারী কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় করত—যেখানে সরকারের সঙ্গে রায়তের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল—তাকে বলা হত 'খালসা'। ইংরেজ আমলে 'খাস মহাল' কথাটি প্রচলিত হয়েছিল। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নগদ বেতন না দিয়ে তাদের জমি দেওয়া হত। এই জমির নাম ছিল 'জায়গীর'। জায়গীর থেকে যে আয় হত তার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বেতন থেকে খুব বেশি বা কম হত না। জায়গীরের সঙ্গে নানারকম সর্ত থাকত। সর্ত পালন না করলে, অথবা অন্য কোন কারণে, যে কোন সময় জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হত। জায়গীরে বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকৃত হত না।

জমির আর একটি শ্রেণী ছিল জমিদারী। ফার্সী ভাষায় 'জমিদার' শব্দের মূল অর্থ: সরকার যার উপর জমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছে। এই অর্থে সরকারই জমির মালিক; জমিদার রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করবেন, সরকারের প্রাপ্য অংশ রাজকোষে জমা দিয়ে অবশিষ্ট অংশ নিজে ভোগ করবেন। কিন্তু মোগল আমলে জমিদারেরা কার্যতঃ জমির মালিকানা ভোগ করতেন। বাংলার নায়েব দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খাঁ ১৭৭৫ সালে লিখেছিলেন: 'জমি-

দারেরা এবং তালুকদারেরা তাঁদের নিজ নিজ জমির মালিক। রাজা তাঁদের শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের জমি কেড়ে নিতে পারেন না। জমিতে তাঁদের বংশানুক্রমিক অধিকার।' কোম্পানীর আমলে ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ কর্মচারী জন শোর (ইনি পরে গভর্ণর-জেনারেল হয়েছিলেন, ১৭৯৩-৯৮) ১৭৮৮ সালে লিখেছিলেন, জমিদারই জমির মালিক, সরকার শুধু খাজনা পাবার অধিকারী। জমিদার জমি বিক্রয় করতে, বন্ধক রাখতে বা দান করতে পারতেন। জমিদারীর উত্তরাধিকার নির্ধারিত হত হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমান আইন অনুসারে—অর্থাৎ জমিদারীর অধিকার ছিল বংশানুক্রমিক। মোগল আমলের এই রীতি অবলম্বন করেই ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।

মোগল আমলে জমিদার শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হত। রাজস্থানের রাজগণ, কোচবিহারের রাজা, ত্রিপুরার রাজা—এঁরাও মোগল সরকারের দৃষ্টিতে ছিলেন জমিদার। বাংলার কোন কোন রাজা (যেমন, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বনবিষ্ণুপুরের মল্ল রাজা, ময়মনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজা) মোগল আমলের আগে থেকেই প্রায়-স্বাধীন ভূম্যধিকারী ছিলেন। কিন্তু বাংলার অধিকাংশ জমিদারবংশের উদ্ভব হয়েছিল মোগল আমলে। মোগল আমলের শেষ দিকে, মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে, কয়েকটি নতুন জমিদারবংশ স্থাপিত হয়েছিল। মোগল আমলে জমিদারেরা কিছু শাসন-ক্ষমতা এবং সৈন্যপোষণের অধিকার ভোগ করতেন। আবুল ফজল আকবরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে বলেছেন, সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে জমিদারদের সৈন্য-সংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষের বেশি।

জমির চাষীদের ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও অন্যান্য নানা রকম কর দিতে হত। ভূমি-রাজস্বকে বলা হত 'মাল', ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণকে বলা হত 'তখশিস্', ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহকে বলা হত 'তহসিল'। বাংলায় 'তহসিলদার' শব্দটি সুপরিচিত। নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বের পরিমাণকে বলা হত 'জমা', সংগৃহীত ভূমি-রাজস্বকে বলা হত 'হাসিল'। নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ জানিয়ে রায়তকে একটি দলিল দেওয়া হত; তার নাম ছিল 'পাট্টা'। সে ঐ পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়ে একটি দলিল দিত; তার নাম 'কবুলিয়ত'। পাট্টা এবং কবুলিয়ত মিলে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হত।

মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল। বাংলায় প্রচলিত পদ্ধতির নাম ছিল 'নসক'। শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। মোগল সরকার জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করত, অথবা প্রত্যক্ষ ভাবে রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করত, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তোড়র মল বাংলায় বেশি দিন ছিলেন না; তাঁর পক্ষে সুলতানী আমলের রীতি অনুসরণ করে জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই সহজ ছিল, রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার জন্য যে সময় এবং প্রশাসনিক কাঠামো দরকার তা' তাঁর ছিল না। যাই হোক, 'নসক' পদ্ধতিতে

যে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হত তার পরিমাণ প্রতি বৎসর পরিবর্তিত হত না, বন্দোবস্ত মোটামুটি দীর্ঘকালের জন্য করা হত। রায়তদের কাছ থেকে নেওয়া হত উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশের মূল্য—নগদ টাকা দিতে হত, শস্য নেওয়া হত না। সুজার আমলে (১৬৩৯-৫৮) নির্ধারিত বার্ষিক ভূমি-রাজস্ব ছিল ১৩,১১৫,৯০৭ টাকা। এর মধ্যে ৮৬, ১৯, ২৪৭ টাকা দিল্লীতে পাঠাতে হত; বাকি যা' থাকত তার মধ্যেই প্রাদেশিক শাসনের ব্যয় এবং প্রদেশ রক্ষার জন্য সামরিক ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হত।

ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিল 'আবওয়াব' নামে পরিচিত অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রথা। কোন কোন আবওয়াবের উৎপত্তি হয়েছিল মোগল আমলে; অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে এই কুপ্রথা প্রসারিত হয়েছিল। নির্ধারিত খাজনার বাইরে যে আবওয়াব আদায় করা হত সেটা জমিদারেরা এবং তাঁদের কর্মচারীরা ভোগ করতেন। আওরঙ্গজেবের আমলে চাষীকে শোষণ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল; পরবর্তী ফসল কাটার সময় পর্যন্ত তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যে পরিমাণ শস্য প্রয়োজন হত সেটুকু সে রাখতে পারত, বাকি অংশ ছিল সরকারের প্রাপ্য। ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি করা ছিল মোগল শাসন-পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রজাদের রক্ত শোষণ করেই বাদশাহেরা এবং আমীর-ওমরাহেরা অকল্পনীয় বিলাস-ব্যসনে দিন যাপন করতেন। তাজমহল এবং দিল্লী ও আগ্রার হর্ম্যরাজি সম্বন্ধে আমরা যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি এবং এগুলিকে ভারতীয় সভ্যতার স্তম্ভ বলে বর্ণনা করি তখন সেই বুভুক্ষু কৃষকের কথা আমাদের মনে পড়ে না যে অনাহারে বা অর্ধাহারে থেকে এদের গড়ে তোলার অর্থ জুগিয়েছিল।

৬। পাদশাহী শাসনের ফলাফল

প্রাক্-মোগল যুগে দিল্লীর সুলতানেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন করতেন। আলাউদ্দীন খলজী এবং মোহাম্মদ বিন তোগলক প্রায় সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই খলিফার সার্বভৌম অধিকার মেনে নিয়েছিলেন; ভারতে অবস্থিত মুসলমান রাজ্যকে তাঁরা এশিয়া এবং আফ্রিকার বিশাল মুসলমান জগতের অংশ রূপেই গণ্য করতেন। ইসলামের জগৎ অবিভাজ্য, খলিফা তাঁর অধিপতি, বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধিরা তাঁর ছত্রছায়াতলে তাঁর অনুমতি নিয়ে রাজ্যশাসন করেন—ইসলামের ধর্মতত্ত্ব এবং আইনের এই নীতি তাঁরা স্বীকার করতেন। সেই সময়ে খলিফা কার্যতঃ ছিলেন ক্ষমতাহীন; ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খলিফারা মিশরে প্রায় বন্দীর মত দিন কাটাতেন। তবু দিল্লীর অধিপতিরা তাঁদের দোহাই দিতেন, 'সুল-তান' উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন, 'পাদশাহ' (সম্রাট) উপাধি গ্রহণ করতেন না।

বাবর নতুন রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর সময়ে তুরস্কের সুলতান খলিফা হয়েছেন, কিন্তু তিনি এই খলিফার সার্বভৌম আধিপত্য অস্বীকার করে 'পাদশাহ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পাদশাহের মর্যাদা এবং অধিকার সম্বন্ধে আকবরের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁর অন্তরঙ্গ সভাসদ আবুল ফজল বলেছেন, রাজকীয় পদ ঈশ্বরের দান, কোন ব্যক্তির মধ্যে সহস্র গুণের সমাবেশ না হলে সে এই পদের অধিকারী হয় না ('Kingship is a gift of God and is not bestowed till thousand grand qualities have been gathered together in an individual.')। তিনি আরও বলেছেন, রাজকীয় পদ ঈশ্বর থেকে বিনিসৃত আলো এবং যিনি বিশ্বকে আলোকিত করেন সেই সূর্যের রশ্মি ('Royalty is a light emanating from God and a ray from the sun, the illuminator of the universe.')। সুতরাং রাজাকে দেখা ঈশ্বরের উপাসনার একটি অঙ্গ ('The very sight of the King has been held to be a part of divine worship.')। দিল্লী বা বাংলার কোন সুলতান এই ইসলামবিরোধী ধারণা পোষণ করার কল্পনাও করতেন না।

আকবর বা তাঁর কোন উত্তরাধিকারী—এমন কি, ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী আওরঙ্গজেব পর্যন্ত—খলিফার প্রতি মৌখিক আনুগত্যও স্বীকার করেন নি। তাঁরা নিজেরাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; পাদশাহের উপরে কোন মানবদেহধারী প্রভু থাকতে পারে না। পাদশাহ রাজার রাজা—'শাহান শাহ'; তাঁর রাজ্য বিস্তারের কোন ভৌগোলিক সীমা নেই। আবুল ফজল বলেছেন, মহাপুরুষদের মনোযোগের অভাবে সভ্য জগৎ বিভিন্ন রাজ্যে খণ্ডিত হয়েছে; যদি এই জগৎ একজন সুদক্ষ এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকের অধীন হত তবে বিভেদের ধূলি উড়ে যেত এবং মানুষ শান্তি লাভ করত ('...if this civilized world, which has been split up owing to the inattention of the great souls, were under one able and just ruler of extensive capacity, the dust of dissensions would assuredly be laid and mortals find repose.')। এই আদর্শ অনুযায়ী আকবর রাজ্যবিস্তারের যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন আওরঙ্গজেবের আমলে তার পরিণতি ঘটেছিল। মোগল আমলে ভারতবর্ষ যে রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করেছিল অশোকের পরবর্তী কালের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

দিল্লীর সুলতানদের আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীনভাবেই কাজ করতেন। প্রকৃতপক্ষে সুলতানী রাজ্য (Sultanat) ছিল কতকগুলি অর্ধস্বাধীন রাজ্যের সমষ্টি। প্রাক্-মোগল আমলে কোন কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নি। মোগল আমলে এই ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। কাবুল থেকে গৌহাটি পর্যন্ত, কাশ্মীর থেকে 'সুদূর দক্ষিণ' পর্যন্ত,

সম্রাটের হুকুম এবং পাদশাহী সেরেস্তার নির্দেশ কার্যকর হত। আকবরের আমল থেকেই সুবাগুলি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক সুদৃঢ় ও বিশাল রাজনৈতিক সৌধের অঙ্গীভূত হয়েছিল। এই সৌধের শীর্ষে ছিলেন পাদশাহ, তাঁর মন্ত্রীরা এবং বিভিন্ন প্রদেশে সুবাদার ও দেওয়ান ছিলেন তাঁর হুকুম তামিল করার যন্ত্র। যোগাযোগ ব্যবস্থার সেই দুর্বলতার যুগেও কেন্দ্রীভূত শাসনের সুব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। শাসনসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট রীতি গড়ে উঠেছিল। এই রীতির বিরুদ্ধে কোন কাজ করার উপক্রম হলে পাদশাহী সেরেস্তা থেকে আপত্তি করে বলা হত, 'এটা রীতি নয়' ('জবিতা নাস্ত')। সমগ্র সাম্রাজ্যে শাসনসংক্রান্ত কাজে একমাত্র ফার্সী ভাষা ব্যবহৃত হত। একমাত্র সম্রাটের নামাঙ্কিত মুদ্রা সকল সুবায় এবং অনুগত হিন্দু রাজাদের রাজ্যে প্রচলিত ছিল। 'খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত' ভারত এক সূত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

* * *

সুলতানী আমলে বাংলার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ছিল, মোগল আমলে তার পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটল। সুলতানেরা নবাগত বিদেশী অথবা বিদেশী বংশজাত হলেও তাঁরা বাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করতেন, বাংলার সমস্যা নিয়েই চিন্তাভাবনা করতেন, বাংলার স্থায়ী অধিবাসীদের সেনানায়ক এবং কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করতেন, বাংলার রাজস্ব বাংলার জন্যই ব্যয় করতেন। তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ বাংলার সীমান্তবর্তী হিন্দু রাজ্যগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। মোগল পাদশাহেরা সারা ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্তান নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন, তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্র ভারতের সীমা অতিক্রম করে মধ্য এশিয়াতে প্রসারিত হত। বাংলার সঙ্গে তাঁদের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, কোন মোগল সম্রাট বাংলায় আসেন নি। দায়ুদ কররানীর সঙ্গে যুদ্ধের প্রথম পর্বে আকবর বিহারে এসেছিলেন, বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেন নি। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ে শাহ জাহান কিছুকাল বাংলায় ছিলেন, কিন্তু সিংহাসন লাভের পর এই সুদূর সুবায় আর আসেন নি। মোগল সম্রাটেরা পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে ও রাজস্থানে যেতেন, বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে আগ্রায় তাঁদের রাজধানী ছিল। আওরঙ্গজেব তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অর্ধেক কাটিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতে। মোগল বংশের সুজা ও আজিম-উশ-শান বাংলার সুবাদার ছিলেন; দু'জনেই বাদশাহী তখ্‌তের জন্য যুদ্ধ করে পরাজিত হন। আজিম-উশ-শানের পুত্র ফররুখশিয়র কিছুকাল বাংলায় পিতার প্রতিনিধি ছিলেন। পরে তিনি দিল্লীর সম্রাট হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে (১৭১৩-১৯) বাংলায় বাদশাহী কর্তৃত্ব কার্যতঃ বিলুপ্ত হয়েছিল। তিনি বাংলায় ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন, ফলে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হবার পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

বাদশাহের প্রতিনিধি রূপে যাঁরা বাংলা শাসন করতেন তাঁরা ছিলেন ইংরেজ

আমলের বড়লাটদের মতই উড়ন্ত পাখী, বাংলার সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ ছিল না। সম্রাট তাঁদের নিযুক্ত করতেন। ইংরেজ বড়লাটদের মত তাঁদের কোন নির্দিষ্ট কার্যকাল ছিল না, তাঁদের আসা-যাওয়া চলত সম্রাটের মর্জি অনুসারে। ইংরেজ বড়লাটদের মতই তাঁরা ছিলেন বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের কাছে বিদেশী। মুনিম খাঁ থেকে আলিবর্দি খাঁ পর্যন্ত (১৫৭৪-১৭৫৬) বাংলার কোন সুবাদারই বাঙালী ছিলেন না। মোট ৩২ জন সুবাদারের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন হিন্দু—রাজপুত রাজা মানসিংহ। সুবাদারদের সহযোগী দেওয়ানেরাও ছিলেন বহিরাগত। মুর্শিদকুলি খাঁ এসেছিলেন দেওয়ান হয়ে, পরে তিনি সুবাদারী লাভ করেন।

বাংলার সঙ্গে কোন সুবাদার বা দেওয়ানের স্থায়ী সম্বন্ধ ছিল না। তাঁদের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য ছিল বাংলা থেকে যথাসম্ভব বেশি অর্থ সংগ্রহ করা—শুধু বাদশাহী কোষাগারের জন্য নয়, নিজেদের ব্যক্তিগত কোষাগারের জন্যও বটে। সেকালে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বৈধ ও অবৈধ উপায়ে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি করার অনেক সুযোগ ছিল। মীর জুমলা তিন বৎসরেরও কম সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন; তার বেশির ভাগ সময় কেটেছিল যুদ্ধে। তবু তিনি লবণ এবং পানের মত নিত্যব্যবহার্য জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসায় করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। এই কুপ্রথা শায়েস্তা খাঁর আমলে প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি টাকা। তিনি জাহাজে লবণ, পান এবং অন্যান্য জিনিস বাংলায় আমদানি করে লাভ রেখে বেচে দিতেন। ঢাকায় কোন বণিকের তাঁর কাছ থেকে না কিনে লবণ ও সুপারি বেচার অধিকার ছিল না। বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে কম দামে জিনিস কেনা হত এবং নানা অজুহাতে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হত। সুবাদারেরা এভাবে যে অর্থ সংগ্রহ করতেন তার অতি সামান্য অংশ তাঁরা বাংলায় ভোগ বিলাসে ব্যয় করতেন, বাকিটা দিল্লী-আগ্রায় তাঁদের পারিবারিক কোষাগারে সঞ্চিত হত। মোগল সুবাদারেরা ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের পথপ্রদর্শক ছিলেন, এ কথা বললে অন্যায় হবে না।

আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, বাংলায় মোগল-শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের এই অংশের 'সংকীর্ণ বিচ্ছিন্নতা' ('narrow isolation') দূর হল, উত্তর ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হল। ফলে স্থলপথে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাংলার সংযোগ পুনরুদ্ধারের সুযোগ পাওয়া গেল। পশ্চিমে নতুন দরজা দিয়ে বাংলা বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হল। বাঙালী বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে ধর্মচর্চা ও ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করলেন। বাংলা থেকে রাজকর্মপ্রার্থীরা দিল্লীতে দরবার করতে যেত; যারা স্থানীয় বিচারকদের কাছে সুবিচার পায় নি তারাও সুবিচার পাবার আশায় রাজধানীতে যেত। আবার পশ্চিম থেকে বাংলায় আসতেন বহু সরকারী কর্মচারী, সৈনিক, বণিক

এবং মুসলমান ধর্মতত্ত্ববেত্তা ও ধর্মপ্রচারক। এঁদের মধ্যে কেহ কেহ বাদশাহী রাজধানী থেকে বাংলার মুসলমান সমাজে 'উচ্চতর সংস্কৃতির তাজা হাওয়া' ('fresh breath of a higher culture') নিয়ে আসতেন। এই পরিবর্তনকে ঊনিশ শতকের রেনেসাঁসের সূচনা—'প্রভাতের অস্পষ্ট আলোক' ("a faint glimmer of dawn')—আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৬]

বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির কতখানি উন্নতি হয়েছিল তার সম্বন্ধে কোন আলোচনা ও বিশ্লেষণ আচার্য যদুনাথ বা অন্য কোন ঐতিহাসিক করেন নি। তবে উত্তর ভারত থেকে যে সব মুসলমান ও হিন্দু কর্মচারীরা এসেছিলেন তাঁরা বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের অন্নসংস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সুলতানী আমলে বাংলায় রাজকার্যে প্রধানতঃ বাঙালীরাই নিযুক্ত হত। ফাসী রাজভাষা হলেও প্রশাসনের নিম্ন স্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হত এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বাংলা জানতেন। মোগল আমলে ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত দলিলপত্রে সকল স্তরে ফাসী ভাষার ব্যবহার প্রচলিত হল। হিসাবপত্র রাখার পদ্ধতিতে নানা রকম জটিলতা প্রবর্তিত হল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা দিল্লী থেকে আসতেন, কিছুকাল বাংলায় কাজ করার পর চলে যেতেন। তাঁরা বাংলা জানতেন না। তাঁদের সঙ্গে পাঞ্জাব ও আগ্রা অঞ্চল থেকে মুসলমান ও হিন্দু নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা আসত। ফাসী ভাষায় এবং হিসাবপত্রে তাদের দক্ষতা ছিল। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে এটা ছিল 'প্রতিভার স্রোত' ('flow of talent')। তিনি বলেছেন, বাংলায় মোগল প্রশাসনের সমুদয় উচ্চ পদে—শুধু সামরিক ও বিচার বিভাগে নয়, রাজস্ব এবং হিসাব বিভাগে—আগ্রা এবং পাঞ্জাব থেকে আনীত লোক নিযুক্ত করা হত; তারা বাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করত না, সুবাদার বদলের সঙ্গে সঙ্গেই চলে যেত।[৭] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সিভিল সার্ভিসের মাধ্যমে প্রশাসন এবং ব্রিটিশ কর্মচারী দ্বারা সামরিক বাহিনী পরিচালনা করত। কার্যকাল শেষ হলে সকলেই দেশে চলে যেত। এই পদ্ধতির সঙ্গে মোগল পদ্ধতির সাদৃশ্য অতি সুস্পষ্ট।

যারা উত্তর ভারত থেকে 'প্রতিভা' নিয়ে আসতেন তাঁদের সঙ্গে বাংলার পরিচয় ছিল না, বাংলার স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকার কোন কারণও ছিল না। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁরা আসতেন, এই সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব অর্থ সঞ্চয় করে ফিরে যাওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থ সঞ্চয়ের উপায় সম্বন্ধে সুবাদারেরা ছিলেন পথপ্রদর্শক। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে টাকা নিতেন। রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা প্রজাদের শোষণ করত, লাখেরাজ (নিষ্কর জমি) যারা ভোগ করত তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে 'ডিহিদার মামুদ সরিপ' সম্বন্ধে কবি বলেছেন:

৬। যদুনাথ সরকার, *History of Bengal*, Vol. II, ১৮৮-৯৯, ২২৪ পৃষ্ঠা।
৭। তদেব, ৪১০ পৃষ্ঠা।

মাপে কোণে দিয়া দড়া পনের কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।
সরকার হইলা কাল খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
* * *
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ুলি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।

কবি এই দুরবস্থাকে 'প্রজার পাপের ফল' বলে মন্তব্য করেছেন। অত্যাচারের প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না, তাই তিনি 'ছয়-সাত পুরুষের' বাসভূমি দামুন্যা ছেড়ে গেলেন।

সুবাদারদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল সাধারণ পণ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। তার ভার সাধারণ মানুষকে বহন করতে হত। সুবাদার থেকে আরম্ভ করে সকল স্তরের কর্মচারীরা যে অর্থ সঞ্চয় করতেন তার অধিকাংশই বাংলার বাইরে চলে যেত। ইংরেজ শাসনকালে সমগ্র ভারতের যে অবস্থা হয়েছিল এটা তারই আঞ্চলিক পূর্বাভাষ।

মোগলদের কাছে বাংলা ছিল 'প্রচুর রুটিতে সমৃদ্ধ নরক' ('দুজখ পুর আজ নান')। উত্তর ভারত থেকে আগত ছোট বড় কোন কর্মচারীই 'দুজখ' থেকে মধু আহরণ করতে সংকুচিত হত না। স্বয়ং পাদশাহেরাও এ বিষয়ে খুব সজাগ ছিলেন। বাংলা থেকে পাদশাহী কোষাগারে প্রচুর কর প্রেরিত হত। সুজা যখন সুবাদার ছিলেন তখন বার্ষিক ৮৬,১৯,২৪৭ টাকা দিল্লীতে পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁর কাছ থেকে নানাভাবে প্রচুর টাকা নিয়েছেন। পরে মুর্শিদকুলি খাঁ দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ পাঠিয়ে পাদশাহের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন। ইংরেজ আমলে Home Charges খাতে যে সম্পদের স্রোত ভারত থেকে ইংলণ্ডে প্রবাহিত হত তার প্রতিদানে অপর্যাপ্ত হলেও কিছু পাওয়া যেত—যেমন, সামরিক উপ-করণ, অস্ত্রশস্ত্র, কলকারখানার যন্ত্র, রেলওয়ে এবং শিল্পে বিনিয়োগের জন্য মূলধন, ইত্যাদি। কিন্তু মোগল আমলে বাংলা থেকে দিল্লী-আগ্রার দিকে যে সম্পদের স্রোত প্রবাহিত হত তার প্রতিদানে উল্লেখযোগ্য কিছুই মিলত না।

আচার্য যদুনাথ সরকার মোগল শাসনের সুফল সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন।[৮] প্রথমতঃ, পাদশাহী আমলে বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ('Mughal peace', 'imperial peace')। কিন্তু আকবরের আমলে এবং জাহাঙ্গীরের আমলের প্রথমার্ধে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বাংলায় প্রচুর অশান্তি ছিল। তারপরেও পূর্ব-দক্ষিণ বাংলায় মগ ও পর্তুগীজদের অত্যাচার অব্যাহত ছিল,

৮। তদেব, ১৮৮-৯৯, ২১৮, ২২৩-২৫, ৩১৫, ৩৯১ পৃষ্ঠা।

মোগল শাসকেরা 'নওয়ারা'র দুর্বলতা বশতঃ জলপথে আগত লুণ্ঠনকারীদের দমন করতে পারেন নি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ বিস্তৃত অঞ্চলে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল এবং ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ নির্মাণের সুযোগ দিতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, পাদশাহী শাসনে বাংলায় ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ১৬৬৫ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকানরাজের শাসনাধীন ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালের পূর্বে ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, বাখরগঞ্জ এবং যশোহর থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় হত না। তৃতীয়তঃ, মোগল আমলে সাংস্কৃতিক রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল। মুসলমান সমাজের উচ্চ স্তরে আরবী-ফার্সী শিক্ষার কিছু প্রসার হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার বা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে কোন মোগল বাদশাহ বা সুবাদারের কোন সম্পর্ক ছিল না। আকবর ধর্মালোচনার জন্য হিন্দু, জৈন, পার্সী ও খৃস্টান ধর্মযাজকদের সম্মিলিত করেছিলেন, হুগলী থেকে জেসুইট পাদ্রীকে আগ্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাংলার কোন হিন্দু পণ্ডিতকে তিনি ডাকেন নি—এমন কি, আগ্রার কাছাকাছি বৃন্দাবনে যে বৈষ্ণব গোস্বামীরা বাস করতেন তাঁরাও তাঁর আমন্ত্রণ পান নি। মোগল সাম্রাজ্যের শিল্পকীর্তি দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল, সুদূর বাংলা তার কোন অংশ দাবি করতে পারে না। এখানে যে সব মসজিদ, সমাধিভবন, স্তম্ভ ও তোরণ নির্মিত হয়েছিল সেগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে কোন রকম উৎকর্ষের পরিচয় দেয় না, কোন নতুন শিল্পরীতির ইঙ্গিতও সেগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না।

আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের (১৬৫৮-১৭০৭) শেষভাগেই মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন সুরু হয়েছিল, কিন্তু সেই বিরাট পুরুষের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের ছায়া ফাটলগুলিকে ঢেকে রেখেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ফাটলগুলি দৃষ্টিগোচর হল এবং প্রসারিত হতে লাগল। নাদির শাহের আক্রমণকালে (১৭৩৯) মোগল পাদশাহী ছিল একটি 'সুসজ্জিত মৃতদেহ' ('gorgeously dressed corpse')। ইতিমধ্যে বাংলা, অযোধ্যা এবং দাক্ষিণাত্যের সুবাদারেরা কার্যতঃ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু 'সুসজ্জিত মৃতদেহ' নানা কারণে কবর দেওয়া হল না, দিল্লীতে শাহ জাহানের প্রাসাদে রেখে দেওয়া হল। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি বড়লাটেরা 'মৃতদেহ'কে নজরানা দিতেন। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত 'মৃতদেহে'র নাম কোম্পানীর মুদ্রায় খোদিত হত। ১৮৫৭ সালে 'বিদ্রোহী' সিপাহীরা গেল দিল্লীতে—যেখানে প্রায়-জনশূন্য প্রাসাদে বসে প্রায়-কপর্দকহীন বাহাদুর শাহ উর্দু কবিতা লিখে সময় কাটাতেন। সিপাহীদের ক্রীড়নক রূপে তিনি আবার বাদশাহ হলেন। এর পরিণতি হল তাঁর রেঙ্গুনে নির্বাসন। আকবর-আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীর দেহান্ত হল ভারতের বাইরে।

বাংলায় মোগল পাদশাহীর ছায়া বিলুপ্ত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে। যে কোম্পানী পাদশাহী সনদ নিয়ে বাংলার দেওয়ানী গ্রহণ করেছিল তার প্রতিনিধি লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। বাদশাহের প্রতিনিধি নবাবের ক্ষমতার শেষ প্রতীক ইংরেজের শাসন-সৌধের ভিতরে ঢুকে গেল।

কিন্তু নিজামতের অন্তর্ভুক্ত ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থায় মোগল আমলের মূল নীতি আরও দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত ছিল। সুলতানী আমলে এবং মোগল আমলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার হত ইসলামের আইন অনুসারে, বিচার করতেন মুসলমান বিচারকেরা। আওরঙ্গজেবের নির্দেশে কয়েকজন মুসলমান আইনজ্ঞ পণ্ডিত এই আইনের সার সংকলন করে 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' নামক সংহিতা (code) প্রস্তুত করেছিলেন। কর্ণওয়ালিসের সময় থেকে বিচার করতেন ইংরেজ কর্মচারীরা, ইসলামের ফৌজদারী আইন চালু থাকল। ১৮৫৯ সালে পিনাল কোড (Indian Penal Code) এবং ১৮৬১ সালে ফৌজদারী কার্যবিধি আইন (Criminal Proccdure Code) প্রবর্তিত হল। ইংলণ্ডের ফৌজদারী আইনের ভিত্তিতে রচিত নতুন ফৌজদারী আইন বলবৎ হল ধর্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য।

৪

বৈষ্ণব ধর্ম ও বাংলা সাহিত্য

১। শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণী বাংলার ধর্মে, সমাজে এবং সাহিত্যে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল তার তুলনা পাওয়া যায় একমাত্র ঊনিশ শতকের রেনেসাঁসে। কিন্তু এর সঙ্গে মোগল পাদশাহীর কোন সম্বন্ধ নেই; কোন মোগল সম্রাট বা সুবাদার বা উচ্চ রাজকর্মচারী এই বিপ্লবে সহায়তা করেন নি, বাধাও দেন নি।

শ্রীচৈতন্যের জন্ম (১৪৮৬) এবং দেহাবসান (১৫৩৩) ঘটেছিল সুলতানী আমলে। তাঁর জন্মের বহুকাল পূর্বেই ভক্তিধর্ম এবং বিষ্ণুর উপাসনা বাংলায় প্রচলিত ছিল। হিন্দু আমলে তৈরী বহু বিষ্ণুমূর্তি বাংলার নানা স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যের উপজীব্য। লক্ষ্মণ সেন, উমাপতি ধর ও গোবর্ধন রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করে অনেক ভক্তিমূলক শ্লোক রচনা করেন। সমসাময়িক গ্রন্থ শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে বহু ভক্তিরসাত্মক কবিতা সংগৃহীত হয়েছিল। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকথা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর বিষয়বস্তু।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য অনুসারে মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন বাংলায় প্রেম ধর্মের আদি প্রচারক। 'চৈতন্য ভাগবতে' আছে: 'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার'। জীব গোস্বামী বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে 'মাধব-সম্প্রদায়' বলেছেন। মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীরঙ্গ পুরীর সঙ্গে একবার নবদ্বীপে এসে চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাঙালী ছিলেন কিনা জানা যায় না, দক্ষিণের লোকও হতে পারেন। অদ্বৈত মতে দীক্ষিত হলেও তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণলীলাক্ষেত্র গোবর্ধনে গোপালের সেবা প্রবর্তন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন চৈতন্যের দীক্ষাগুরু কুমারহট্ট

নিবাসী ঈশ্বরপুরী এবং চৈতন্যের প্রধান সহায়ক শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতাচার্য। চৈতন্যের দীক্ষা গ্রহণের আগে নবদ্বীপে যাঁরা কৃষ্ণকথা আলোচনা করতেন তাঁদের মধ্যে অনেকের উপরই মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁর অনুগামীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছিল। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে কয়েকজন কৃষ্ণভক্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সমগ্র বাংলার কথা দূরে থাকুক---নবদ্বীপেও তাঁদের মত সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে নি। বৃন্দাবনদাস বলেছেন, তাঁরা 'নিগূঢ়ে···বৈসে নদীয়ায়'। তিনি আরও বলেছেন, নবদ্বীপে মঙ্গলচণ্ডীর গান এবং বিষহরি, বাশুলী ও যক্ষের পূজো প্রচলিত ছিল, 'কৃষ্ণপূজো বিষ্ণুভক্তি' ছিল না, 'ভক্তির ব্যাখ্যান' ছিল না। মাধবেন্দ্র পুরী দক্ষিণ ভারত থেকে বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিরসপ্লাবিত যে রূপ নবদ্বীপে এনেছিলেন তা সমগ্র বাংলাকে উদ্বেলিত করেছিল চৈতন্যের শিক্ষার ফলে। রূপ গোস্বামী তাঁর 'স্তবমালা'য় বলেছেন, শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিরত্ন প্রকাশ করলেন তা বেদে, উপনিষদে বা ভগবানের অন্য কোন পূর্বাবতারে প্রচারিত হয় নি। 'শ্রীরূপ গোস্বামীর ন্যায় সূক্ষ্ম ভাবদর্শী ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের প্রেম প্রচারের মধ্যে এমন কিছু অভিনব ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, যাহার জন্য ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন।'

চৈতন্য বাঙালী হিন্দু সমাজকে কতখানি প্রভাবিত ও সঞ্জীবিত করেছিলেন তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবনী রচনার উপাদানের প্রাচুর্যে।[১] তাঁর জীবনকালে তাঁর কোন জীবনী লিখিত হয় নি ; কিন্তু তাঁর সহচরদের মধ্যে ৫৮ জন কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাঁদের রচনায় তাঁর এক উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার বিচারে সমসাময়িক পদগুলির মূল্য বেশি নয়, কিন্তু এগুলি ঐতিহাসিকদের মনোযোগ দাবি করতে পারে এজন্য যে 'পূর্ণচন্দ্র উদয়ে সমুদ্র যেমন উদ্বেল হইয়া উঠে, চৈতন্যচন্দ্রের দর্শনেই তেমনি তাঁহার পারিষদগণের ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিত এবং তাঁহাদিগকে কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করিত।'

চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার অন্যতম প্রধান পরিকর মুরারি গুপ্ত সংস্কৃতে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে এক 'কড়চা' লিখেছিলেন তাঁর দেহাবসানের অব্যবহিত পরে — সম্ভবতঃ ১৫৩৩ থেকে ১৫৪২ সালের মধ্যে। 'কর্ণপুর' উপাধি দ্বারা পরিচিত কবি পরমানন্দ সেন চৈতন্যের পারিষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র। তিনি চৈতন্য জীবন সম্বন্ধে সংস্কৃতে তিন খানি বই লিখেছেন ঃ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (কাব্য), 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' (নাটক), 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'। এই বইগুলি সম্ভবতঃ ১৫৪২ থেকে ১৫৭৬ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। বাংলায় লেখা চৈতন্য-জীবনীগুলির মধ্যে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্য সম্ভবতঃ ১৫৪৮ সালে রচিত হয়েছিল। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য প্রায়

১। দ্রষ্টব্য ঃ বিমান বিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান।'

সমসাময়িক হলেও বৈষ্ণব সমাজে অসমাদৃত ছিল। রচনাকাল আনুমানিক ১৫৬০ সাল। সম্ভবতঃ কয়েক বৎসর পরেই—১৫৬০ থেকে ১৫৬৬ সালের মধ্যে—লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য লেখা হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' কাব্য কখন লেখা হয়েছিল সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতৈক্য নেই। বিমান বিহারী মজুমদারের মতে রচনাকাল ১৬১২ সাল, সুকুমার সেনের মতে রচনাকালের গণ্ডী ১৫৬০-৮০ সাল। গোবিন্দদাসের 'কড়চা' নামে পরিচিত বইটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সংস্কৃত ও বাংলা ছাড়া উড়িয়া, অসমীয়া এবং হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীর রচনায় চৈতন্য-জীবনী সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।

উপাদানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও চৈতন্য-জীবনের সকল ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন বইতে পরস্পরবিরোধী বহু উক্তি আছে। তা'ছাড়া লেখকদের ভক্তির আতিশয্যে মানুষ হিসাবে মহাপ্রভুর চরিত্র ও কার্য-কলাপ অনেকটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ভক্তের কাছে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের অবতার, তাই অপ্রাকৃত ঘটনাও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল শচী। শৈশবে চৈতন্যের নাম ছিল বিশ্বম্ভর, মহিলারা নাম দিয়ে-ছিলেন নিমাই; তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন বলে তাঁকে গৌরাঙ্গও বলা হত। তাঁর বয়স যখন চব্বিশ বৎসর তখন তিনি সন্ন্যাসী হন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করেন। তিনি দুবার বিয়ে করেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর তাঁর বিয়ে হয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে।

চৈতন্য নবদ্বীপে শিক্ষালাভ করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করে তিনি নবদ্বীপে ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য একটি টোল প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ তিনি ব্যাকরণ, অলংকার ও দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন।

নবদ্বীপে কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে চৈতন্যের সংযোগ কখন আরম্ভ হয়েছিল তা ঠিক বলা যায় না। তিনি একবার পূর্ব বাংলায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কেবল পৈতৃক সম্পত্তি থেকে অর্থসংগ্রহ করেন নি, 'নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াইঞা পণ্ডিত।' এই উক্তি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। তাঁর অনুপস্থিতি কালে লক্ষ্মী দেবী সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি নবদ্বীপে ফিরে এসে শোকাভিভূত চিত্তে কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তনে যোগ দিলেন। সংকীর্তনের কেন্দ্র ছিল ভক্ত শ্রীবাসের অঙ্গন; সেখানে যাঁরা সমবেত হতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অদ্বৈত। শ্রীবাস ও অদ্বৈত দুজনেই শ্রীহট্টের লোক। শচী দেবীর বড় ছেলে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। তাই ছোট ছেলের ধর্মের দিকে ঝোঁক দেখে তিনি তাঁকে সংসারে আবদ্ধ রাখবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু চৈতন্যের মনের পরিবর্তন হল না, বরং হরিদাস ও নিত্যানন্দ নবদ্বীপে উপস্থিত হলেন এবং এই দুই 'ভগবৎ-প্রেমাতুর' সহচর তাঁকে

ধর্মের দিকে আরো আকর্ষণ করলেন। নবদ্বীপের পথে পথে চৈতন্যের নেতৃত্বে কীর্তন সুরু হল।

১৫০৮ সালে চৈতন্য গয়ায় যান মৃত পিতার পিণ্ড দিতে। সেখানে ঈশ্বর পুরী তাঁকে দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা দেন। তিনি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে নবদ্বীপে ফিরলেন। অদ্বৈতাচার্য এবং স্থানীয় অন্যান্য বৈষ্ণব তাঁর নেতৃত্বে সংকীর্তন আরম্ভ করলেন। জগাই এবং মাধাই নামে দুই 'পাষণ্ড' তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে বশীভূত হল। কাজী সংকীর্তনে বাধা দিলে তিনি বহু লোক নিয়ে প্রতিবাদ করলেন, কাজী তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল। তারপর কেশব ভারতী তাঁকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিলেন। বৈষ্ণব মতে এখানে চৈতন্যের 'আদি লীলা' শেষ হল।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন; 'মধ্য লীলা' সুরু হল। কিন্তু বর্ধমান অঞ্চল থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী নিত্যানন্দ তাঁকে শান্তিপুরে ফিরিয়ে আনলেন। শচীমাতার ব্যাকুল অনুরোধে তিনি নীলাচলে (শ্রীক্ষেত্রে বা পুরীতে) বাস করতে সম্মত হয়ে সেখানে গেলেন (১৫১০)। পুরীতে প্রখ্যাত বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাঁর সঙ্গে তর্কে পরাজিত হয়ে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ভক্তিধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং দ্বৈতবাদের যাথার্থ্য স্বীকার করলেন।

পুরীতে অল্পদিন থেকেই - সম্ভবতঃ ১৫১০ সালের মাঝামাঝি—চৈতন্য দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার জন্য যাত্রা করেন। বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দুটি—ভক্তিধর্মের আদিভূমির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ এবং কৃষ্ণনাম প্রচার। পথে যেতে যেতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ নাম আবৃত্তি করতেন, গ্রামের লোকেরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, তাঁর প্রচারের ফলে সমগ্র দক্ষিণ ভারত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করল। এটা ভক্ত কবির অতিশয়োক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু কন্নাডভাষী অঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্রে দীর্ঘকাল পরেও তাঁর স্মৃতি বেঁচে ছিল। মহারাষ্ট্রের সন্ত তুকারাম একটি 'অভঙ্গে' তিন জন কৃষ্ণ-সেবককে তার শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের নাম বাবা চৈতন্য, কেশব চৈতন্য এবং রাঘব চৈতন্য।

দক্ষিণ ভারতে গমনাগমনে বোধ হয় দু' বৎসর সময় কেটেছিল। এই পর্যটন কালের বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা রাজমহেন্দ্রীতে চৈতন্যের সঙ্গে রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ এবং রাধাতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। রামানন্দ উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অমাত্য এবং ঐ রাজ্যের দক্ষিণাংশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি চৈতন্যের অনুগামী হয়ে তাঁর সংগ লাভের জন্য কর্মত্যাগ করে পুরীতে ফিরে এসেছিলেন।

চৈতন্য বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ, তামিল নাড়ু, কেরল, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ—এই সাতটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করে পুরীতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও ত্রিবন্দ্রম এবং পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র

পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাঁর এই দীর্ঘ পরিক্রমার পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না।

পুরীতে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে (১৫১৩ সালে) চৈতন্য গঙ্গাতীর-পথে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন। গৌড়ে সনাতন ও রূপের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হল। সেখান থেকে তিনি, সম্ভবতঃ সুলতান হোসেন শাহের প্রতিকূলতার আশঙ্কায়, পুরীতে ফিরলেন। যাতায়াতের পথে তিনি কুমারহট্টে ও শান্তিপুরে যান এবং শচীমাতা ও অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পরবর্তী যাত্রা বৃন্দাবনের দিকে—ঝাড়খণ্ডের বনপথ অতিক্রম করে। পথে কাশীতে ও প্রয়াগে কিছুদিন অবস্থান করে চৈতন্য গেলেন মথুরায় ও বৃন্দাবনে। গোবর্ধনে মাধবেন্দ্র পুরীর প্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহ ছাড়া ঐ অঞ্চলে তখন আর কোন বিগ্রহ বা তীর্থস্থলী ছিল না। চৈতন্য ব্রজমণ্ডলে নানাস্থানে গিয়ে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার স্থান নিরূপণ করলেন। এই প্রসঙ্গে রাধাকুণ্ড আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরে তাঁর নির্দেশে সনাতন ও রূপ মদনগোপাল, গোবিন্দ ও গোপীনাথ—এই তিন মুখ্য বিগ্রহ স্থাপন করেন। প্রথমে বিগ্রহগুলির পাশে রাধার মূর্তি ছিল না; চৈতন্যের দেহাবসানের বহু বৎসর পরে রূপের তত্ত্বব্যাখ্যা অনুযায়ী জীব গোস্বামীর নির্দেশে রাধার মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। বৃন্দাবনে চৈতন্যের অবস্থিতিকাল সংক্ষিপ্ত হয়েছিল তিনটি কারণে—'লোকের সংঘট্ট, নিমন্ত্রণের জঞ্জাল' এবং 'নিরন্তর আবেশ' (অর্থাৎ অত্যধিক ভাবাবেগ)। সেখান থেকে প্রয়াগে পেঁাছে গৃহত্যাগী রূপ ও তাঁর ছোট ভাই বল্লভ বা অনুপমের (জীবের পিতা) সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। রূপকে 'শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া'। প্রয়াগ থেকে চৈতন্য এলেন কাশীতে। সেখানে হোসেন শাহের কারাগার থেকে পলাতক সনাতন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপদেশ ('সনাতন-শিক্ষা') লাভ করলেন।

কাশী থেকে বনপথে চৈতন্য পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। জীবনের বাকি আঠারো বৎসর তিনি পুরীতে কাটালেন, আর কখনও বাইরে যান নি। এই দীর্ঘকালের বিস্তারিত বিবরণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর মহাগ্রন্থের 'অন্ত্যলীলা' খণ্ডে প্রধানতঃ চৈতন্যের ভাবজীবনের আলেখ্য অঙ্কন করেছেন।

পুরীতেই চৈতন্যের দেহাবসান ঘটে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে বলা হয়েছে, মনে হয় তিনি শরীরকে রূপান্তরিত করে লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন ('মন্যে তেনৈব শরীরেণ রূপান্তরং লব্ধা লোকান্তরং প্রাপ্তঃ')। লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গলে' বলা হয়েছে:

'জগন্নাথে প্রভু লীন হইলা আপনে'।

চৈতন্যের সমসাময়িক লেখক ও তাঁর কৃপাধন্য ওড়িশী সাহিত্যিক অচ্যুতানন্দ তাঁর 'শূন্য পুরাণে' এই কথাই বলেছেন:

'চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি বলে।

জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎপ্রায় মিশি গলে ॥'

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' ভিন্ন কথা আছে।

'আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে ॥

* * *

চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শরণ অবশেষে ॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা ॥'

বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্য ভাগবতে' বলেছেন ঃ

'একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া ॥

* * *

সেই ক্ষণ কূপ হইল নবনীতময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয় ॥'

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, চৈতন্য 'যমুনার ভ্রমে' সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিলেন, তখন তাঁর মূর্চ্ছা হল, সমুদ্রতরঙ্গ তাঁকে 'কোণার্কের দিগে' ভাসিয়ে নিয়ে গেল। 'প্রভুর বিচ্ছেদে' কাতর ভক্তেরা 'সিন্ধুতীরে-নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ'। এক জালিকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল ; সে বলল, 'জাল বাহিতে এক মৃতক মোর জালে আইল', সে 'বড় মৎস্য' মনে করে দেহটিকে 'উঠা ল যতনে'। কিন্তু ভক্তেরা দেখলেন, তাঁরা সংকীর্তন করে 'প্রভুর কানে' কৃষ্ণনাম বলা মাত্রই তাঁর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হল– 'হুংকার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিলা'। ভক্তেরা তাঁকে সানন্দে ঘরে নিয়ে এলেন। তিনি 'কৃষ্ণ প্রেমাবেশে' দিবারাত্রি 'উন্মাদ প্রলাপ' আরম্ভ করলেন।

'এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী-দিবস-কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলে ॥'

এই অবস্থার পরিণতি এবং চৈতন্যের দেহাবসান সম্বন্ধে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' কোন ইঙ্গিত নেই।

* * *

'শ্রীচৈতন্যের বর্ণ, আকৃতি ও অঙ্গকান্তি তাঁহার লোকোত্তর ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিত।' এই ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রথম জীবনে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরদিগকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ধর্মজীবন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি বাসুদেব সার্বভৌমের মত শুষ্ক অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিককে এবং রায় রামানন্দের মত বাস্তব জীবনের বিবিধ ক্রূরতার সঙ্গে সুপরিচিত প্রশাসককে জয় করেছিল। তাঁর ভাবের ঐশ্বর্য ও প্রেমাশ্রু লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ভক্তির স্রোতে ভাসিয়ে নিয়েছিল।

সুকুমার সেন বলেছেন, 'আমরা এখন যে অর্থে প্রচার কথাটি ব্যবহার করি সে

অর্থে চৈতন্য প্রচারক ছিলেন না এবং তিনি কখনো কোন ধর্মপ্রচার করেন নাই।'[২] বিমান বিহারী মজুমদারের মন্তব্যঃ 'অন্যান্য ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষদের ন্যায় তাঁহাকে কখনও বক্তৃতা করিতে হয় নাই, গ্রন্থ লিখিতে হয় নাই, এমন কি দশজনের মাঝে দশটা উপদেশও দিতে হয় নাই।'[৩] নরহরি সরকার ঠাকুর বলেছেন, কেবল নয়নের প্রেমাশ্রু দ্বারাই তিনি সকলের চরিত্র শোধন করেছেন, আসুরভাব চূর্ণ করেছেন ('কেবলং প্রেমধারয়ৈব সর্বেষামাশয়ং শোধিতবান্, আসুরভাবঞ্চ চূর্ণিতবান্।') কবীর ও নানকের মত তিনি জনারণ্যে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে, অথবা এক জায়গায় বসে, সমাগত জনসমষ্টিকে ধর্মোপদেশ দিতেন না। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাসুদেব সার্বভৌম এবং রায় রামানন্দকে ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন। রূপ সনাতন তাঁর কাছে ধর্মোপদেশ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিকটতম অনুরাগীরাও আক্ষরিক অর্থে তাঁর শিষ্য ছিলেন না, কারণ তিনি তাঁদের প্রচলিত প্রথায় দীক্ষা দেন নি। নবদ্বীপে, শান্তিপুরে, পুরীতে, কাশীতে তাঁর ভাবোন্মত্ত সংকীর্তন সমবেত মানুষের চিত্তভূমি আর্দ্র ও সরস করত; কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করত সেটা প্রত্যক্ষভাবে বৃহত্তর জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ত না।

তিনি প্রচলিত প্রথায় ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না, কারণ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মুক্তির জন্যই তিনি ব্যাকুল ছিলেন না, কৃষ্ণনাম প্রচারের মাধ্যমে বদ্ধ জীবের মুক্তির পথ পরিষ্কার করা তাঁর মহাজীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্য মনে রেখে তিনি দুটি পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সংসার-বিরাগী রূপ ও সনাতনের উপরে তিনি নতুন ধর্মভাবনার দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণের ভার দিলেন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের জন্য এবং জাগতিক ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য তাঁদের বাংলা থেকে বহু দূরে বৃন্দাবনে বাস করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে তাঁর বাণী সাক্ষাৎভাবে পেঁৗছে দেবার ব্যবস্থারও প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁর ৪৮ বৎসরের জীবনের শেষ ১৮ বৎসর কাটিয়েছিলেন নীলাচলে। বাংলার খুব কম মানুষই সেখানে যেতে পারত। তাই বাংলায় কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের ভার তিনি দিলেন অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দকে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেনঃ

'আচার্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডাল-জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড় দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করহ প্রকাশে॥'

চৈতন্য স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু অদ্বৈতাচার্য বিবাহিত গৃহস্থ ছিলেন

২। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ), ৩১৮ পৃষ্ঠা।
৩। 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', ৫৯০ পৃষ্ঠা।

এবং নিত্যানন্দও বৈরাগী-জীবন ত্যাগ করে দুটি বিয়ে করেছিলেন। চৈতন্য কৃষ্ণ-প্রেমধর্মকে সন্ন্যাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজে গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু গৃহস্থ বৈষ্ণব গুরুর আশ্রয় না নিয়ে অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হতে পারে না, একথা তিনি বলেন নি। তিনি সনাতনকে বলেছিলেন, স্বয়ং কৃষ্ণই 'মহান্ত রূপে' জীবের 'শিক্ষাগুরু' হন। বৈষ্ণব সমাজে গোষ্ঠী বিভাগের উদ্ভব হয়, এটাও তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁর দেহাবসানের পর বৈষ্ণব সমাজে গুরুবাদ এবং গোষ্ঠী-বিভাগ দেখা দিল।

অদ্বৈত শান্তিপুরে থেকেই কৃষ্ণনাম প্রচার করতেন। নিত্যানন্দ খড়দহে তাঁর 'শ্রীপাট' স্থাপন করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীদের নায়কত্ব গ্রহণ করলেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী জাহ্নবী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তিনিই প্রথম 'গোস্বামিনী' বা মহিলা-মহান্ত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন তাঁর সপত্নী-পুত্র বীরভদ্র। নিত্যানন্দ ও বীরভদ্র অনেকটা রাজার চালে চলতেন, বাহ্যিক বৈরাগ্যের দিকে তাঁরা দৃষ্টি দেন নি। অদ্বৈত, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী সীতা, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্রেরা, শান্তিপুরে অনাড়ম্বরভাবে শিষ্যগ্রহণ ও দীক্ষাদান করতেন। ফলে বৈষ্ণব-সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হল এবং গুরুবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হল। গুরুর আসনে বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকৃত হল। ক্রমে বৈষ্ণব-সমাজে আরও দু'একটি গুরুবংশের উদ্ভব হল। এর মধ্যে বর্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে মুকুন্দ দাস ও নরহরি দাস সরকার কর্তৃক স্থাপিত সম্প্রদায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার বৈষ্ণব-সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পাঞ্জাবে একই গুরু-পরম্পরার নেতৃত্বে সুসংহত শিখ-সমাজ গড়ে উঠেছিল, বাংলার বৈষ্ণব-সমাজে বিভিন্ন গুরুবংশের নেতৃত্বে আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত এবং গোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতা বজায় থাকল। কালক্রমে গুরুবাদ নানাবিধ সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করেছিল। অতি জঘন্য 'গুরুপ্রসাদী' প্রথার বর্ণনা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় পাওয়া যায়।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য মূর্তিপূজা করতেন না। পুরীতে তিনি প্রত্যহ জগন্নাথ দর্শন করতেন, যাকে পূজা বা সেবা বলে সেটা করতেন না। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর ভক্তেরাও কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন নি। তাঁর দেহাবসানের পর বাংলায় নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করে পূজার রীতি প্রবর্তন করেন। বৃন্দাবনে সনাতন ও রূপ মাধবেন্দ্র পুরীর প্রবর্তিত দেবসেবার রীতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে মূর্তিপূজা সুপ্রচলিত হল।

চৈতন্যের উপর তাঁর জীবনকালেই তাঁর ভক্তেরা দেবত্ব আরোপ করেছিলেন, তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের রসময় বিগ্রহ। তাঁকে কৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দকে বলরাম রূপে কল্পনা করে তাঁদের কাষ্ঠনির্মিত যুগল মূর্তির পূজা তাঁর দেহাব-সানের পূর্বেই সুরু হয়েছিল। চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার রূপে পূজিত হলেও তাঁর

দেহকান্তি ও আচরণ ছিল বিরহিনী রাধার মত, তাই তাঁকে রাধা-কৃষ্ণের যুগলাবতার মনে করা হত। বৃন্দাবনে গোস্বামীরা চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকার করলেও চৈতন্যপূজার প্রবর্তন করলেন না। সম্ভবতঃ তাঁরা মনে করেছিলেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে বাংলার বাইরে গ্রহণীয় করতে হলে চৈতন্য-লীলাকে আড়ালে রেখে কৃষ্ণলীলার উপর জোর দিতে হবে।

প্রকৃত পক্ষে 'চৈতন্যের তিরোভাবের পরে গৌড়ে ও বৃন্দাবনে বৈষ্ণব চিন্তা ও সাধনা ঈষৎ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল।' বৃন্দাবনবাসী সনাতন, রূপ ও জীব বৈষ্ণব মতের শাস্ত্র ও সাহিত্য রচনায় বাংলার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। 'তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে সংস্কৃত আশ্রয় না করিলে কোন নূতন চিন্তা ও আদর্শ গৃহীত হইবে না। তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে সংস্কৃতে নূতন শাস্ত্র চালাইতে হইলে তাহা পুরাতন শাস্ত্রের অনুবর্তী রূপেই উপস্থাপিত করিতে হইবে।'[৪] কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য-চরিতামৃত' রচনায় বাংলা ভাষা ব্যবহার করলেও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অসংখ্য উধৃতি দিয়ে নিজের বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। 'নূতন চিন্তা ও আদর্শকে প্রাচীন ভাষায় প্রকাশ করা এবং প্রাচীন শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বৈশিষ্ট্য। কবীরপন্থী ও নানকপন্থীরা এই পথ অবলম্বন না করে লোকভাষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রাণে ভক্তিরস সঞ্চারের প্রয়াস করেছিল।

সংস্কৃত ভাষাকে ধর্মব্যাখ্যার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার অন্য কারণও অনুমান করা যায়। কবীর ও নানক অব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁরা সাধারণ অর্থে সুশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁরা হিন্দু বা মুসলমান---কোন সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রে ধর্মের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে বলে স্বীকার করতেন না। তাঁদের ভূমিকা ছিল প্রকৃত লোক-শিক্ষকের, তাই দেবভাষার পরিবর্তে লোকভাষাতেই তাঁরা তাঁদের বক্তব্য প্রচার করতেন। চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণ বংশে, তাঁর জীবন কেটেছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কেন্দ্র নবদ্বীপে এবং পুরীতে, নবদ্বীপে টোলে শিক্ষালাভ করে তিনি সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, তিনি নিজেও কিছুকাল নবদ্বীপে টোলে অধ্যাপনা করেছিলেন। তিনি ভাবোন্মত্ত অবস্থায় সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতেন। স্বভাবতঃই তাঁর ধর্মচিন্তার মূল প্রাচীন শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে নিহিত ছিল। তাঁর অনুগামীরা নতুন পথের সন্ধান করেন নি। তাঁর প্রধান অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উচ্চবংশীয় এবং উচ্চপদস্থ। এই প্রসঙ্গে রূপ, সনাতন, বলদেব বিদ্যাভূষণ, রামানন্দ এবং প্রতাপরুদ্রের নাম সহজেই মনে পড়ে। প্রথম চার জন উচ্চ শ্রেণীর পাণ্ডিত্যে ভূষিত ছিলেন। ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত বাংলা কাব্য রচনায় বৈষ্ণব কবিরা অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাখ্যায় যাঁরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সংস্কৃতকে তার প্রাচীন আসন থেকে বিচ্যুত করেননি। ফলে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার সঙ্গে বৈষ্ণব সমাজের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি।

৪। সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ), ৩২৪ পৃষ্ঠা।

সংসারবিরাগী ভক্তদের চৈতন্য বৃন্দাবনে পাঠাতেন। তাঁদের উপর দুটি প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হত—লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করা এবং ভক্তিশাস্ত্রের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-সম্মত ব্যাখ্যা রচনা করা। রূপকে চৈতন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'ব্রজে তুমি রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।' সনাতন ও রূপ দুজনেই চৈতন্যের চেয়ে বয়সে বেশ বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁরা দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে তাঁরা দেহত্যাগ করেন। তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

রূপের বহু রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল-নীলমণি'। এই দুটি বইতে কৃষ্ণলীলাভাবনাকে 'সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের রসাভিব্যক্তির পথে প্রবাহিত' করা হয়েছে। সনাতনের রচিত 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত' বইটি মোটামুটি শ্রীমদ্‌ভাগবতের সারসংগ্রহ। প্রেমভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় তাঁর মৌলিকতা অপূর্ব। 'বৈষ্ণবতোষণী' নামে শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের টিপ্পনীও তাঁর লেখা। রূপ ও সনাতন ছাড়া বৃন্দাবনের 'ছয় গোসাঞি'র মধ্যে ছিলেন রঘুনাথ ভট্ট (ভট্টাচার্য), রঘুনাথ দাস (সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধিশালী কায়স্থ বংশের সন্তান), গোপাল ভট্ট এবং জীব।

সনাতন ও রূপের দেহত্যাগের পর জীবই বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নায়কত্ব লাভ করেন। তিনি ছয়টি সন্দর্ভে ('তত্ত্ব সন্দর্ভ', 'ভগবৎসন্দর্ভ', 'পরমার্থসন্দর্ভ', 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ', 'ভক্তিসন্দর্ভ', 'পরমাত্মসন্দর্ভ') গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর 'গোপালচম্পূ' নামক বিরাট গ্রন্থে ব্রজলীলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গোলোক লীলার বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে।

সুকুমার সেন বলেন: 'কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়া জীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব চিন্তাকে নূতন দিকে ফিরাইয়া দিলেন।...কৃষ্ণের মূর্তির বামে রাধা মূর্তির প্রতিষ্ঠা এবং যুগল মূর্তির উপাসনা জীব গোস্বামীর স্বীকৃতি পাইয়াই প্রথমে বৃন্দাবনে ও পরে বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।... জীব গোস্বামীর সময় হইতে বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সর্বাধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।'[৫] এতদিন পর্যন্ত বল্লভাচার্যের মত অনুযায়ী রাধাকে গৌণ স্থান দেওয়া হত।

রূপ, সনাতন ও জীবের রচনাবলী ভারতের দর্শনচিন্তায় উচ্চ স্থান লাভের যোগ্য এবং বাঙালী মনীষা ও অধ্যাত্মচিন্তার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে গভীর তত্ত্বের আলোচনা মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে উপাদেয় হলেও অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে তার কোন বাস্তব মূল্য ছিল না। তত্ত্ব এবং প্রাত্যহিক আচারের মধ্যে প্রাচীন সীমারেখা মুছে গেল

৫। তদেব, ৩১৮ পৃষ্ঠা।

না, বরং মূর্তিপূজা বজায় রেখে সেটা দৃঢ়তর করা হল। কবীর ও নানকের বাণী আবৃত্তি করে সাধারণ মানুষ যে আধ্যাত্মিক বোধ ও মানসিক শান্তি লাভ করত বাংলার বৈষ্ণবেরা তাতে বঞ্চিত রইল। কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে মানুষের ধর্মবোধ কতদূর অগ্রসর হতে পারে সেটা বিচারের বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে নামকীর্তন অর্থহীন ও যান্ত্রিক (mechanical) পুনরাবৃত্তিতে অথবা অশ্রুসিক্ত ভাববিলাসে পরিণত হয়।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁদের ভক্তি ও পাণ্ডিত্য একাগ্রভাবে নিয়োজিত রেখেও বাংলার বাইরে 'নূতন চিন্তা ও আদর্শ'' প্রচারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন নি, তাঁদের রচনাবলী বাঙালী বৈষ্ণবেরাই শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছিল। বাংলার পূর্বসীমান্তে আসাম। সেখানে শংকরদেব যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন তার রূপ স্বতন্ত্র, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য। উত্তর ভারতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কতখানি সীমিত ছিল তার প্রমাণ একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। আকবর যখন 'ইবাদতখানায়' বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন তখন গুজরাট থেকে জৈন ও পার্শী আচার্যদের এবং হুগলী থেকে এক পর্তুগীজ পাদ্রীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু রাজধানীর নিকটবর্তী বৃন্দাবন থেকে কোন গোস্বামীকে ডাকেন নি।

বাংলা 'ভক্তমালে' স্বয়ং চৈতন্যের আশীর্বাদধন্য কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী নামে একজন পাঞ্জাবী ভক্তের কথা আছে। তিনি মুলতান. গুজরাট, পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন, এই বিবরণ ঐ বইতে পাওয়া যায়। এই 'বিবরণের ঐতিহাসিক সত্যতা কতদূর তাহা নির্ণয় করা দুরূহ', এই মন্তব্য করেও বিমান বিহারী মজুমদার বলেছেন : 'এ কথা জোর করিয়া বলা চলে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বাঙ্গালা ভক্তমাল (লালদাস কর্তৃক) লিখিত হয়, তখন মুলতান, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও গুজরাতে বহু ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ঐ গ্রন্থে এরূপ বিবরণ স্থান পাইত না।' কিন্তু এই 'ভক্তের নাম ও প্রচারকার্যের কথা কোন চরিত-গ্রন্থ ও বৈষ্ণব-বন্দনায় না থাকা খুবই বিস্ময়ের কথা।'[৬] সুতরাং তাঁর উক্তির উপর নির্ভর করে ভারতের ঐ বিস্তৃত অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচার হয়েছিল, একথা বিশ্বাস করা সহজ নয়।

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ধর্মপ্রচারের অনুকূল ছিল না। তাঁরা এক জায়গায় বসে সাধনা করতেন, বই লিখতেন। তাঁদের উপদেশ প্রচারের ব্যবস্থা ছিল না। 'শ্রীচৈতন্যের সাতখানি প্রাচীন চরিত-গ্রন্থে অ-বাঙালী ভক্তদের কথা খুব কমই আছে।'[৭] অ-বাঙালী ভক্তদের পক্ষেই অ-বাঙালীদের

৬। 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', ৫৩৩ পৃষ্ঠা।
৭। তদেব।

কাছে চৈতন্যের ধর্ম প্রচার করা সহজ হত। বাঙালী ভক্তেরা বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা শিখে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করতেন, এমন প্রমাণও নেই। গোস্বামীদের রচনা হয়তো অ-বাঙালী পণ্ডিত সমাজে প্রচারিত ও সমাদৃত হয়েছিল, কিন্তু তাতে জনসমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের আনুকূল্য হয় নি।

আর এক কথা। ধর্ম প্রচার করলেই হয় না, যারা ধর্ম গ্রহণ করে তাদের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং তাদের সংশয়ের সমাধান করার জন্য স্থানীয় কেন্দ্র গড়ে তুলতে হয়। বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রীস্টান—সকলেই এ রকম কেন্দ্র স্থাপন করতেন। তাই দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এত মসজিদ ও গির্জা দেখা যায়। শঙ্করাচার্য বেদান্ত ব্যাখ্যা করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, বিশাল দেশের চার সীমান্তে মঠ স্থাপন করেছিলেন। চৈতন্য দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কোন মঠ স্থাপন করেন নি। গোস্বামীরাও বৃন্দাবনের বাইরে ধর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন নি। কেবল সংস্কৃত ভাষায় পুঁথি লিখে কোন 'নূতন চিন্তা ও আদর্শ' প্রচার করা সম্ভব ছিল না, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতাই তাঁর প্রমাণ।

* * *

চৈতন্যের জীবন ও আদর্শ বাঙালী-সমাজে কিছু পরিবর্তন এনেছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু এই পরিবর্তন বিশেষ অর্থবহ এবং সুদূরপ্রসারী হয় নি। ধর্মব্যাখ্যা এবং গুরুগিরি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছিল; অব্রাহ্মণ পুরুষেরা এবং ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ মহিলারা বৈষ্ণব সমাজে গুরুগিরি করতে পারতেন। ক্রমে গুরুগিরি প্রথা নানাভাবে সমাজকে কলুষিত করতে লাগল। 'গুরুপ্রসাদী' প্রথার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মোটামুটি বলা যায়, বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণদের সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি নষ্ট হয় নি; সামগ্রিক হিসাবে বাংলার হিন্দু সমাজ আগের মত ব্রাহ্মণ-শাসিতই থাকল। জনৈক পদকর্তা বলেছেন, 'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।' ভাবাবেগের প্রাবল্যে সাময়িক 'কোলাকুলি' চণ্ডালের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে নি। বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার সমাজে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে নি।

বৈষ্ণবপ্রবর, গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন: 'তিনি (চৈতন্য) যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রবল স্রোতোবেগমুখে অনেক অবাঞ্ছনীয় সামাজিক ব্যাপার বহুদূরে ভাসিয়া গিয়াছিল। ...তিনি কেবল অস্পৃশ্যতা বর্জনের বীজই বপন করিয়া যান নাই; সাম্যনীতিও প্রচার করিয়া গিয়াছেন।'' বন্যার জল অল্পদিন পরেই সরে যায়; পিছনে রেখে যায় আবর্জনা। 'অস্পৃশ্যতাবর্জনের বীজ' থেকে গাছের উৎপত্তি হয় নি;

৮। রাধাগোবিন্দ নাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা', তৃতীয় সংস্করণ, ৬৫ পৃষ্ঠা।

বিংশ শতাব্দীতেও 'সাম্যনীতি' বাঙালী সমাজের মৌলিক রূপের পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রভৃতি কুপ্রথা বিলুপ্তির দিকে গেল না। সমাজের তথাকথিত নীচ জাতীয় মানুষ নতুন জীবনের খানিকটা আস্বাদ পেয়ে কিছু শক্তি সংগ্রহ করল, সংকীর্তনের মাধ্যমে তারা ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করল, ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের কঠোর আচার-বিচারের শৃংখল থেকে খানিকটা মুক্তি লাভ করল। কিন্তু মোটের উপর তাদের স্থান সমাজের উপরের স্তরে উঠ না, যারা নীচে ছিল তারা নীচেই রইল।

এ সম্বন্ধে রাধাগোবিন্দ নাথের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, চৈতন্যের সময়ে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে প্রকাশ্য আন্দোলনের 'অনেক 'বিঘ্ন' ছিল। তখন বাঙ্গালায় সমাজবন্ধন খুব দৃঢ় ছিল। মুসলমানের কড়োয়ার জল গায়ে লাগিলেই ব্রাহ্মণের জাতি যাইত ; এই দিকে স্মার্ত পণ্ডিতগণ আবার তৎকালীন সমাজবন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। সাধন-রাজ্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে নূতন সংস্কারের প্রবর্তন করিয়াছিলেন নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ তাহারই বিশেষ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে তখন নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজেরই বিশেষ প্রতিপত্তি—সমাজের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কর্ত্তা তখন তাঁহারাই।... যখন নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচলিত সামাজিক নিয়মের প্রধান প্রধান গুলিতে বিশেষ-রূপে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, তখন তাঁহাদের মনঃপূত না হইলেও তাঁহার ধর্ম বিষয়ক আন্দোলনে মৌখিক দু'চারিটী কথা ব্যতীত কার্যতঃ বিশেষ কিছু বিঘ্ন উৎপাদন করেন নাই। তাঁহারও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মসংস্কার ; তাই তিনি ধর্ম্মসংস্কারের দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিলেন। পণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রবল বিরুদ্ধাচরণের আশংকাও যে তাঁহার উপর কোনও ক্রিয়া করে নাই, তাহাও বলা যায় না। তিনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন—সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রাধান্য দিতে গেলে অভীষ্ট ধর্ম্ম-সংস্কারেই সম্ভবতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।'[৯]

সুকুমার সেন বলেছেন, চৈতন্য যে বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করলেন সেটা 'কর্মবিমুখ ভিক্ষুকের কর্মহীনতা নয়।'[১০] এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা সূত্রে তিনি চৈতন্যের উক্তি বলে পরিচিত 'শিক্ষাষ্টক' থেকে একটি শ্লোক এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত উধৃত করেছেন। শ্লোকটি এই :

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ো সদা হরিঃ।'

'তরোরিব সহিষ্ণুনা' কথাটির অর্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যাখ্যা করেছেন :

'বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়।

৯। তদেব, ৬৪ পৃষ্ঠা।
১০। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ), ৩২১-২২ পৃষ্ঠা।

যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন
ঘর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ।'

সুকুমার সেন বলেছেন : "শুকাইয়া মৈলে তবু পানী না মাগয়"—'এই হইতেছে চৈতন্য-পথিক বৈরাগীর ধর্ম। রঘুনাথ দাস এই ধর্ম আচরণ করিয়াছিলেন। এ কি নিবীর্যের ধর্ম?' নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যে ধর্ম আচরণ করেছিলেন সেটা কি সাধারণ সংসারী গৃহস্থের ধর্ম হতে পারে? সাধারণ মানুষকে 'তরোরিব সহিষ্ণু' এবং 'তৃণাদপি সুনীচ' হবার নির্দেশ দিলে তাকে অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের কাছে নির্বিবাদে মাথা নোয়াতে বলা হয় না কি? স্বয়ং চৈতন্য কি কাজীর ব্যাপারে 'তরোরিব সহিষ্ণু' ছিলেন? সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি 'চৈতন্য-পথিক বৈরাগী'র জন্য যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ফল সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে কি 'নিবীর্য' হবার ইচ্ছা প্রবল করে নি? সুকুমার সেন বলেছেন, 'চৈতন্য বাঙ্গালীকে একটা বড় উদ্যমের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন।' এই 'উদ্যমের পথটি' কি তা তিনি বলেন নি। তাঁর মন্তব্য ভক্তি এবং সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, গৃহস্থের কর্মজীবন সম্বন্ধে নয়।

চৈতন্য কর্মবীর ছিলেন না, ভক্তিধর্মে নিবেদিতচিত্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা' সাংসারিক মানুষের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে সেটা খুব সম্ভবতঃ তিনি ভেবে দেখেন নি। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন : 'অপরের অত্যাচার, উৎপীড়ন, দুর্ব্যবহার—আমারই উপার্জিত, আমারই পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল, সুতরাং আমারই প্রাপ্য। ইঁহারা উপলক্ষ্য মাত্র, ইঁহাদের যোগে আমার স্বোপার্জিত কর্মফলই আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহাদের দোষ কিছু নাই, বরং আমার উপার্জিত কর্মফলগুলি ভোগ করিবার সুযোগ দিয়া ইঁহারা আমার উপকারই করিতেছে, আমার কর্মফলের দুর্বহ বোঝা কিছু কমাইয়া দিতেছে—এই রূপ চিন্তা করিয়া অম্লান বদনে সহ্য করিবে।'[১১] এই শিক্ষা ধর্মপথে অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু বলিষ্ঠ জাতি গঠনের ভিত্তি হতে পারে না। মোটের উপর বলা যায়, চৈতন্য সংসার-বিরাগীর জন্য যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার অপপ্রয়োগ করে গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা বাঙালী হিন্দুর বীর্যহীনতার ঐতিহ্যকে দৃঢ়তর করেছিল। মোগল আমলে উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল; কিন্তু কর্মফল সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিক্ষা এবং বৈষ্ণব ধর্মের নির্দেশ বাংলার কৃষককে সহিষ্ণু এবং সুনীচ করে রেখেছিল।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও চৈতন্যের নির্দেশ পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজে বিকৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন, যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শোনা যায় তিনিই বৈষ্ণব। তিনি যেসব আচার বর্জনের উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল

১১। রাধাগোবিন্দ নাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা', ৬৭ পৃষ্ঠা।

অবৈষ্ণবের পাচিত অন্ন দ্বারা কৃষ্ণের ভোগ দেওয়া। কিন্তু 'বৈষ্ণব' শব্দের অর্থ পরবর্তীকালে সংকুচিত হয়েছিল। রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেনঃ যিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু 'শাস্ত্রবিহিত মুখ্য ভজনাঙ্গের একটিও অনুষ্ঠান করেন না, তিনি মিথ্যাভাষণ-চৌর্যাদি দোষে দুষ্ট হইলেও অন্নপাকের অধিকারি বিচারে বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহারই সমাদর করিয়া থাকেন।' আবার বৈষ্ণব-শাস্ত্রে অন্নপাক সম্বন্ধেই বৈষ্ণবত্বের বিচারের কথা আছে; কিন্তু ফল, মূল, জল প্রভৃতি যেসব জিনিস রন্ধন না করেই ভোগে দেওরা যায় তার সম্বন্ধে কোন কথা নেই। অথচ 'বর্তমান বৈষ্ণব-সমাজের মতে যিনি বৈষ্ণব নহেন, ফল-মূল তৈয়ার করার কথা তো দূরে—জল স্পর্শের অধিকার, এমন কি স্থলবিশেষে রান্নার কি ভোগের ঘর স্পর্শ করিবার অধিকারও বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে দেন না—বৈষ্ণব সমাজে তিনি অস্পৃশ্য···অনেকে এইরূপ আচারের পালনকেই যেন জীবনের ব্রত করিয়া বসিয়াছেন ইহার প্রাবল্যে মুখ্য ভজনাঙ্গকে অনেক সময় দূরে সরিয়া থাকিতে হইতেছে।'[১২] চৈতন্যের উদার উপদেশ তাঁর পরবর্তীকালে বৈষ্ণব-সমাজকে ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

চৈতন্যের শিক্ষার সঙ্গে পরকীয়াবাদ যুক্ত করা হয়েছে। এর মূল হচেছ প্রেমদাসের বংশীশিক্ষায় রসরাজ-উপাসনা তত্ত্বের ব্যাখ্যা। সনাতন রাধাকৃষ্ণের অপ্রকট লীলায় স্বকীয়াত্ব ও প্রকট লীলায় পরকীয়াত্ব স্বীকার করেছেন। রূপ গোস্বামীর রচনায় পরকীয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'বিশ্বনাথ চক্রবর্তী চরম পরকীয়াবাদী।···তিনি শ্রীজীবের স্বকীয়াবাদের উপর ঘোরতর আক্রমণ করিয়াছেন।'[১৩] সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে পরকীয়াবাদের বহুল প্রচার হয়েছিল। সহজিয়ারা বলেন, তাঁদের মত প্রবর্তন করেছিলেন চৈতন্যের প্রিয় ভক্ত স্বরূপ দামোদর। পরকীয়াতত্ত্ব এবং সহজিয়াতত্ত্ব দার্শনিক বিচারে এবং উচ্চস্তরের সাধনায় মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে বাঙালী সমাজে এদের প্রভাবে বহুবিধ দুর্নীতি এসেছিল।

২। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

জগৎ, জীব, ব্রহ্ম—অথবা প্রকৃতি, পুরুষ, পরমেশ্বর—অথবা দেহ, জীবাত্মা, পর-মাত্মা—এই তিনের প্রকৃত স্বরূপ ও পারস্পারিক সম্বন্ধ নির্ণয় ভারতীয় দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্যের মতে নির্বিকল্প ও নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম। এটা জ্ঞানমার্গের কথা; জীবাত্মা ও মন এবং বুদ্ধির অ-গোচর পরমাত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন হলে ভক্তির কোন ক্ষেত্র থাকে-না। যাঁরা ভক্তি-

১২। তদেব, ৩১৭-১৮ পৃষ্ঠা।
১৩। বিমান বিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', ৫৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা।

মার্গের প্রবক্তা তাঁরা দ্বৈতবাদী, কিন্তু দ্বৈতবাদের বিভিন্ন রূপ আছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র, জগৎ মিথ্যা নয়—ব্রহ্মেরই শরীর। ব্রহ্ম সগুণ, তিনি জগতের কর্তা, তাঁর সঙ্গে জীবের পূজ্য ও পূজারীর—প্রভু ও ভক্তের—সম্পর্ক। নিম্বার্কের প্রচারিত মত ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে অংশীভাব রয়েছে—এরা একও বটে, পৃথকও বটে। সুতরাং এদের মধ্যে প্রভু ও ভক্তের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। রামানুজের উপাস্য শ্রী (লক্ষ্মী) ও নারায়ণ, নিম্বার্কের উপাস্য রাধা ও কৃষ্ণ। মধ্বাচার্যের মতে জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ অতি সুস্পষ্ট। ঈশ্বর নিরাকার নন, তিনি চিদাকার, তাঁর দেহ চিৎ এবং আনন্দ দ্বারা গঠিত। লক্ষ্মীও পরমাত্মা থেকে ভিন্ন, কিন্তু তাঁর কর্তৃত্বাধীন। ঈশ্বর বৈকুণ্ঠবাসী, লক্ষ্মী তার সঙ্গিনী। জীব বিভিন্ন শ্রেণীতে (গণ) বিভক্ত। ভক্তি দ্বারা জীব ঈশ্বরের কৃপা এবং মুক্তি লাভ করতে পারে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্যের মতে কৃষ্ণ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। অগ্নি থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ বেড়িয়ে যায় তেমন ব্রহ্মের চিৎস্বরূপ থেকে জীবের উৎপত্তি হয়। জীব ঈশ্বরের অংশ হলেও সকল ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হয় না। জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাঁর শক্তির প্রকাশ; সুতরাং জগৎ মিথ্যা নয়। ভক্তিই জীবের মুক্তির কারণ।

চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন সে সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ তাঁর দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর গুরু মাধবেন্দ্র পুরী চরম দ্বৈতবাদী মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু মাধবেন্দ্রের প্রবর্তিত প্রেমধর্মের সহিত মাধ্বমতের গুরুতর পার্থক্য ছিল; মাধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রেমধর্মের সম্পূর্ণ স্ফুরণ না দেখে তিনি নিজে এক সম্প্রদায় গঠন করেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই জীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে মাধব-সম্প্রদায় বলেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, 'ভক্তিকল্পতরু' মাধবেন্দ্র থেকে ঈশ্বর পুরীর মাধ্যমে চৈতন্যের মধ্যে ভক্তিধর্মের পূর্ণ স্ফুরণ হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতামতের সঙ্গে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতামতের অনেক মিল আছে; কিন্তু চৈতন্য কখনও নিম্বার্কের অনুগামী কোন বৈষ্ণব গুরুর সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে জানা যায় না। জীব গোস্বামী নিম্বার্ককে বৈষ্ণব আচার্য রূপে উল্লেখ করেন নি।

চৈতন্য দ্বৈতবাদী হলেও সম্ভবতঃ অদ্বৈতবাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ ছিলেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, তিনি শ্রীধর স্বামীর 'শ্রীমদ্ভাগবত' ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ছিলেন। জীব গোস্বামী শ্রীধর স্বামীর প্রশংসা করেছেন। শ্রীধর স্বামী অদ্বৈতবাদী ছিলেন। অদ্বৈতবাদীরা মুক্তিলাভ করবে না, একথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন নি।

প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য একটি স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামে পরিচিত। এটি দ্বৈতবাদের একটি

বিশিষ্ট রূপ। ভারতীয় দর্শনে এটি বাংলার একটি বিশিষ্ট অবদান।

ঈশ্বর অগ্নিতুল্য, অসংখ্য জীব সেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। ঈশ্বর 'বিভু-চিৎ', জীব 'অনু-চিৎ'। অগ্নি ভিন্ন স্ফুলিঙ্গের পৃথক অস্তিত্ব নেই। যেহেতু ব্রহ্ম থেকে জীবের উৎপত্তি সেহেতু ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এটা অভেদ তত্ত্ব। আবার স্ফুলিঙ্গ ঠিক অগ্নি নয়, অগ্নির কণা। সুতরাং জীব ঠিক ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মের কণা। এটা ভেদ তত্ত্ব। সনাতন বলেছেন, সমুদ্রের এক দিকে ঢেউ উঠে অন্য দিকে মিলিয়ে যায়। সমুদ্রে জল আছে, ঢেউতেও জল আছে—তারা অভিন্ন। কিন্তু সমুদ্রের গভীরতা এবং ঐশ্বর্য (জলের নীচে অবস্থিত রত্নরাজি) ঢেউতে নেই—সুতরাং সমুদ্র ও ঢেউ ভিন্ন। জীব গোস্বামী বলেছেন, 'পুরুষোত্তমে' এক সঙ্গে 'একত্ব' ও 'পৃথকত্ব', 'অংশত্ব' এবং 'অংশীত্ব'—এই দুই আপাতবিরোধী গুণের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। এটা তাঁর 'অচিন্ত্যশক্তি'র প্রকাশ।

ভেদ এবং অভেদ—দুইটি তত্ত্বের সংমিশ্রণ বুঝে নেওয়া কঠিন। প্রকৃতপক্ষে অংশ ও অংশীতে কোন ভেদ থাকতে পারে না, কিন্তু জীবের আমিত্ব বুদ্ধি থাকায় ভেদ মনে হয়। যখন এই বুদ্ধির লোপ হয় তখন ভেদ সংক্রান্ত ধারণারও লোপ হয়, জীব মুক্তি লাভ করে, ব্রহ্মে লীন হয়। তখন ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের 'একত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে 'পৃথকত্ব' লোপ হয় না—মুক্তির পরেও জীব তার সীমাবদ্ধতা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে না। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যও বলেছেন, ঢেউ সমুদ্রের—কিন্তু সমুদ্র ঢেউর নয়। সনাতনের মতে, শঙ্করাচার্যের এই উক্তিতে ভেদাভেদতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। যাই হোক, ভক্তি শাস্ত্র অনুসারে জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। দেহাবসানের পর—জন্মমৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করার পরেও—এই দাসত্ব বিলুপ্ত হয় না, মুক্ত আত্মা তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে ভক্তির আনন্দরসে আপ্লুত থাকে।

অদ্বৈতবাদ বাংলার পণ্ডিতদের কাছে সমাদর লাভ করেছে, তাঁদের চিন্তাধারা গভীরতর খাতে প্রবাহিত করেছে; কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বাঙালী সমাজের উপর তার প্রভাব অতি অস্পষ্ট। বাঙালীর ধর্মচিন্তা দ্বৈতবাদের বিভিন্ন খাতে পথ খুঁজে নিয়েছে। রামপ্রসাদ কালীকে 'ব্রহ্মময়ী তারা' রূপে দেখেছেন, যেটা বাহ্যতঃ পৌত্তলিক সাধনা তাকে পৌত্তলিকতার উপরে নিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সাধক এবং আরাধ্য পরম সত্তার মধ্যে পার্থক্য ভুলতে পারেন নি। রামমোহন বলেছেন: 'ভাব সেই একে / জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।' যে মানুষ সেই সর্বব্যাপী 'এক'কে ভাববে তার পৃথক সত্তা স্পষ্টই স্বীকৃত হয়েছে, কারণ মানুষ নিজেই ব্রহ্ম হলে ভাববার কথা আসত না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দ্বৈতবাদী সুফীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র ভক্তিরসে আপ্লুত হয়েছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পরিণত বয়সের সাধনা ভক্তিধর্মের একটি বিশিষ্ট রূপ।

রবীন্দ্রনাথ যে দ্বৈতবাদী ছিলেন, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অভেদ স্বীকার করেন

নি, একথা অনস্বীকার্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, তিনি 'পিতা নোঽসি' এই মন্ত্রটির (শুক্ল যজুর্বেদ) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ('শান্তিনিকেতন') বলেছেন: 'এক দিকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাম্য আছে, পুত্রের মধ্যে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছে। আর এক দিকে পিতা হচ্ছেন বড়ো, পুত্র ছোটো। একদিকে অভেদের গৌরব, আর একদিকে ভেদের প্রণতি।' এই 'ভেদের প্রণতি'ই ভক্তি। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে 'গভীর আত্মীয় সম্বন্ধ (তা) কোনো বাহ্য অনুষ্ঠান, কোনো ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রক্ষিত হয় না, কেবল ভক্তির দ্বারা এবং ভক্তিজনিত কর্মের দ্বারাই এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতে হয়।' এই সম্বন্ধ যে মানুষের কাছে 'অচিন্ত্য'—যুক্তি তর্কের বাইরে—কবি তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেবলমাত্র পরম পিতাই সন্তানকে এই সম্বন্ধ বুঝিয়ে দিতে পারেন; 'তাঁকে বলব—তুমি যে পিতা সে তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

> 'করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ,
> তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
> আপনার আত্মার স্বরূপ।'

('জন্মদিনে')

যখন 'সূর্য' বা 'সবিতা' নিজেকে 'অপাবৃত' করেন কেবলমাত্র তখনই মানুষ তাঁর 'পরম জ্যোতির মধ্যে' 'আপনার আত্মার স্বরূপ' দেখতে পায়।

মুসলমান আক্রমণের পূর্বে বাঙালী স্বপ্নেশ্বর ভক্তি-শাস্ত্র 'শাণ্ডিল্যসূত্রে'র টীকা লিখেছিলেন। এই টীকা এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে প্রমাণিত হয় যে চৈতন্যের জন্মের দীর্ঘকাল পূর্বেই বাংলায় ভক্তি ধর্মের স্রোত প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ভক্তি ধর্মের প্রধান উৎস ছিল দক্ষিণ ভারত। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে তামিল দেশে বৈষ্ণব আলবার এবং শৈব আদিয়ার সম্প্রদায় ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিল। চৈতন্য যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন তখনও এই ভক্তিস্রোত শুকিয়ে যায় নি। এই দুই সম্প্রদায় শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি, মানুষের মনে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত ভক্তিস্রোতকে বাইরে টেনে এনেছিলেন। হয়তো দক্ষিণ ভারতে পর্যটন কালে চৈতন্য বৈষ্ণব আলবারদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী এই ভক্তদের প্রভাবেই মাধব সম্প্রদায়ের ভক্তিতত্ত্ব অসম্পূর্ণ মনে করেছিলেন, এমন অনুমানও বোধহয় সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়। দক্ষিণ ভারতে ভক্তি ধর্মের শাস্ত্রভিত্তিক ব্যাখ্যা করেছিলেন রামানুজ, নিম্বার্ক ও মাধব। চৈতন্য তাঁদের মত সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারার প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। 'শ্রীমদ্ভাগবত' গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি। এই মহাগ্রন্থ, সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতেই রচিত হয়েছিল।

উত্তর ভারতে ভক্তি ধর্মের আদি প্রচারক রামানন্দ সম্ভবতঃ লোকশিক্ষার জন্য মৌখিক উপদেশ দিতেন। তাঁর লেখা কোন বই বা ধর্মসঙ্গীত পাওয়া যায় নি,

তবে শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেবে' তাঁর রচনা বলে একটি কবিতা আছে। কবীর বহু দোহা রচনা করেন, তার মধ্যে অনেকগুলি 'গ্রন্থসাহেবে' পাওয়া যায়। রামানন্দের অন্যান্য শিষ্যদের রচিত কিছু ধর্মসঙ্গীত 'গ্রন্থসাহেবে' সংকলিত হয়েছিল। শিখগুরু নানকের রচিত প্রায় এক হাজার ধর্মসঙ্গীত 'গ্রন্থসাহেবে' সন্নিবেশিত হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী চার জন গুরু যে সকল ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন সেগুলিও 'গ্রন্থসাহেবে'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এ সব রচনা যাতে কোনরকমে পরিবর্তিত বা বিকৃত না হয় সেদিকে শিখ সমাজের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ফলে গুরুদের শিক্ষা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে শিখদের অধিগম্য রয়েছে। কবীর এবং শিখগুরুদের সকল ধর্মসঙ্গীতই লোকভাষায় রচিত। আসামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শংকরদেবও এই রীতি অনুসরণ করেন।

চৈতন্য তাঁর শিক্ষা কোন ধর্মগ্রন্থে বা ধর্মসঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করেন নি। তাঁর রচিত আটটি শ্লোক ('শিক্ষাষ্টক' নামে পরিচিত) পাওয়া গেছে; তাতে তত্ত্ব ব্যাখ্যা নেই। তিনি রূপ ও সনাতনকে ভক্তি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন, বাসুদেব সার্বভৌম ও রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ভক্তি ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু এসব কথোপকথনের বিবরণ পাওয়া যায় 'চৈতন্যচরিতামৃতে', তাঁর স্বলিখিত কোন বিবরণ নেই। তাঁর দেহাবসানের বহুকাল পরে কবিরাজ গোস্বামী এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন। রচনা কালে তিনি ছিলেন 'বৃদ্ধ জরাতুর অন্ধ বধির'—একথা তিনি নিজেই বলেছেন। বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের কাছে তিনি যা' শুনেছেন তার ভিত্তিতেই তিনি ঐ সব কথোপকথনের বিবরণ রচনা করেছেন। সুতরাং ঐ বিবরণ কতদূর প্রামাণ্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। মহাভক্ত কবিরাজ গোস্বামী জ্ঞাতসারে মহাপ্রভুর বাণীকে বিকৃত রূপ দিয়েছেন, একথা কল্পনারও অতীত। কিন্তু তিনি কখনও চৈতন্যের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসেন নি; তাঁর উপস্থিতিতে মহাপ্রভুর সঙ্গে বাসুদেব সর্বভৌম, রায় রামানন্দ, রূপ এবং সনাতনের কথোপকথন হয় নি, ঐ সব কথোপকথনের কোন লিখিত বিবরণ ছিল এবং সেই বিবরণ তাঁর হস্তগত হয়েছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই।

সোক্রাটিসের দর্শন যেমন প্লেটোর রচনার মাধ্যমে জানা যায়, চৈতন্যের দর্শনও বৃন্দাবনের তিন প্রধান গোস্বামীর (সনাতন, রূপ ও জীব) এবং তাঁদের অনুগামী কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে হয়। সনাতন ও রূপ চৈতন্যের নির্দেশে প্রেম ধর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন, বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত এই বিশ্বাস মেনে নিলেও বলতে হয়, জীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর কোন নির্দেশ লাভ করেন নি। এঁদের সকলের রচনাতেই চৈতন্যের মতামত সম্পূর্ণ ভাবে এবং অবিকৃত ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করা কঠিন। চৈতন্যের দেহাবসানের দীর্ঘকাল পরে, বাংলা ও পুরী থেকে বহু দূরে বৃন্দাবনে বসে তাঁরা বই লিখেছেন। চৈতন্যের নীলাচলে বাসের সময় যে সব ভক্তের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল তাঁদের কাছ থেকে তার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের

পক্ষে সহজ ছিল না। তাঁরা সংস্কৃতে বই লিখেছিলেন; 'চৈতন্যচরিতামৃত' সংস্কৃতগন্ধী বাংলায় লেখা এবং তাতে সংস্কৃত থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি আছে। চৈতন্য বাংলায় যে সব কথা বলতেন সেগুলি সংস্কৃতে, প্রাচীন দার্শনিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা সহজ ছিল না। তাঁর মুখের কথা বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে শুনেছেন এবং প্রকাশ করেছেন, অজ্ঞাতসারেও তাঁদের নিজেদের মতামত মিশ্রিত করেন নি, এটা ঐতিহাসিক বিচারে বিশ্বাস করা কঠিন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' মহাপ্রভুর যে সব উক্তি পাওয়া যায় তাদের ঐতিহাসিক মূল্য বিচারে গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিডিডিস (Thucydides) কর্তৃক রচিত বক্তৃতাগুলির কথা মনে পড়ে।

এই বিষয়ে সুশীল কুমার দের সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমরা চৈতন্য ধর্মের যে রূপের সঙ্গে পরিচিত সেটা প্রধানতঃ সনাতন, রূপ, জীব এবং তাঁদের শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের তৈরী ('The Chaitanyaism which we know to-day is mainly the product of Sanatana, Rupa and Jiva and their disciple Krishnadas Kaviraj, its metaphysics is mainly Jiva's contribution')।[১৪] তিনি অন্যত্র বলেছেন, সনাতন, রূপ এবং জীব যেভাবে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রত্যেকটি অংশের জন্য চৈতন্যকে দায়ী করা যায় না ('...to hold Chaitanya responsible for every fine point of dogma and doctrine elaborated by Sanatana and Rupa and Jiva would indicate an undoubtedly pious but entirely unhistorical imagination')।[১৫] এই শেষোক্ত মতটি বিমানবিহারী মজুমদার 'অযৌক্তিক' বলে মনে করেন নি।[১৬]

বৈষ্ণব গোস্বামীদের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা অতি জটিল, জনসাধারণের বোধগম্য নয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' বাংলায় লেখা হলেও অতি দুরূহ গ্রন্থ। অনেক বৈষ্ণব এটি প্রত্যহ ভক্তিভরে পাঠ করেন, কিন্তু এর মর্মগ্রহণ অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। অর্ধশিক্ষিত ব্রাহ্মণের গীতাপাঠের মতই এটা অনেকের পক্ষে অর্থহীন আচার মাত্র। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে বৈষ্ণব ধর্মের অর্থ নাম জপ, সংকীর্তন এবং রাধাকৃষ্ণের মূর্তিপূজা।

৩। বাংলা সাহিত্য

ষোড়শ শতকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে প্রবল জোয়ার এসেছিল তার ভগীরথ

১৪। S. K. De, *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal*, p. 150.

১৫। S. K. De, *Padyavali*, Introduction, pp. xxxv-vii.

১৬। বিমানবিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', ৯০৯ পৃষ্ঠা।

ছিলেন চৈতন্য। তিনি কাব্য রচনা করেন নি, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং ভাবকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব কাব্য বিকশিত হয়েছিল।

চৈতন্যের পূর্বেই বাংলা দেশে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী রচনার সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি ছিল প্রধানতঃ প্রণয় সঙ্গীত, তাতে আধ্যাত্মিক চিন্তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ছিল না। চৈতন্যের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে বাঙালী বৈষ্ণব-গীতিকারেরা প্রেমকে আধ্যাত্মিক সাধনার স্তরে উন্নীত করেন। তাঁরা কৃষ্ণলীলা বর্ণনাতেও নিজেদের রচনা আবদ্ধ রাখলেন না, চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার রূপে (এবং রাধা ও কৃষ্ণের যুগলাবতার রূপে) পদাবলীতে স্থান লাভ করলেন।

বৈষ্ণব পদাবলী সমগ্রভাবে অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় রচিত হয় নি, অনেক পদে 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত এক কৃত্রিম ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। পদাবলী সাহিত্যের 'বাক্-পরিমিতি ও ভাবানৈপুণ্য সংস্কৃত কবিতার সূত্রেই লব্ধ'। প্রধান সুরটি বিরহের; তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বাৎসল্য, অনুরাগ, মিলন। বিষয়বস্তু এবং রসের বৈচিত্র্য পদাবলী সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

ষোড়শ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুরারি গুপ্ত, নরহরি দাস সরকার, বাসুদেব ঘোষ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তম দাস ও বলরাম দাস। 'জ্ঞানদাসের পদগুলি রচনা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলির সমধর্মী; ইহাদের ভাব অত্যন্ত গভীর হইলেও ভাষা অত্যন্ত সরল ও প্রসাদগুণমণ্ডিত।' গোবিন্দদাস প্রধানতঃ ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করেছেন; তাঁর রচনায় 'প্রেমের সূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্য' সুপরিস্ফুটিত হয়েছে। সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে 'মানব-জীবনের প্রেম ও বেদনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলি অপার্থিব আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব শিল্পসুষমার মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।' কালের পরিবর্তন ঘটেছে, যে ভক্তিরস বৈষ্ণব কবিদের গীতি-কবিতাকে সঞ্জীবিত করেছিল তা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁদের রচনার সাহিত্যিক মূল্য ক্ষুণ্ণ হয় নি।

বৈষ্ণব সাহিত্যের অপর অংশ 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে পরিচিত আখ্যানকাব্য। চৈতন্য যুগের পূর্বেও 'কৃষ্ণমঙ্গল' রচিত হয়েছিল। চৈতন্য যুগে গোবিন্দাচার্য, মাধবাচার্য প্রভৃতি কবি 'কৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করেন। ষোড়শ শতকের শেষে রচিত কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহের 'গোপালবিজয়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য।

'কৃষ্ণমঙ্গলে' উন্নত কাব্যশিল্পরীতির পরিচয় নেই, আখ্যানভাগ একঘেয়ে, রচনা স্থানে স্থানে গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট। পদাবলী সুপ্রচলিত হলে 'কৃষ্ণমঙ্গলে'র জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

* * *

চৈতন্যের জীবনী অবলম্বন করে বাংলায় চারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য রচিত হয়েছিল। রচনাকালের দিক থেকে এগুলির মধ্যে প্রথম বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবত'। সম্ভবতঃ ১৫৪৮ সালে বইটি লেখা হয়েছিল। লেখক ভক্ত ও

সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁর কাব্যে নানা জায়গায় 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও 'গীতা' থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদও রয়েছে। ঐতিহাসিক বিচারে 'চৈতন্য ভাগবতে' নানা রকম ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ষোড়শ শতকের বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই কাব্যে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কাব্যটি সুরে তালে আবৃত্তি ও গান করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল, মাঝে মাঝে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের অন্ত্যলীলা বর্ণনা না করে কাব্যটি অসম্পূর্ণ রেখে যান—যদিও তিনি কাব্য রচনার পরে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। চৈতন্য-চরিতগুলির মধ্যে 'চৈতন্য ভাগবত' বৈষ্ণব সমাজে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল' সম্ভবতঃ আনুমানিক ১৫৬০ সালে রচিত হয়েছিল। কাব্যটি বৈষ্ণব সমাজে আদৃত হয় নি। তার প্রধান কারণ এই যে তিনি চৈতন্যের বন্দনা না করে 'শিবের নন্দনে'[১৭] বন্দনা করে গ্রন্থারম্ভ করেছিলেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর কাব্যে নানা ভাবে বৈষ্ণবীয় রীতি ও ভাব ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, চৈতন্য-জীবনের তথ্য সম্বন্ধে অনেক ভুল আছে। কিন্তু তিনি সেকালের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এমন কিছু তথ্য দিয়েছেন যা ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান। তাঁর 'সহজ কবিত্বশক্তি' ছিল। 'তাঁহার বর্ণনার অনেকস্থানেই কবি-হৃদয়ের উষ্ণতা সঞ্চারিত হওয়ায় গীতিকবিতার ঝংকার উঠিয়াছে।'

কালানুক্রম অনুযায়ী চৈতন্য-চরিত সম্বন্ধে তৃতীয় কাব্য লোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকে এটি লেখা হয়েছিল। তিনি 'শ্রীমদ্ভাগবত' এবং অন্যান্য নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে ভাবানুবাদে বিশের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল মুরারি গুপ্তের 'কড়চা'। তথ্যের দিক থেকে তাঁর কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য কম হলেও ভাববর্ণনায় তাঁর কৃতিত্ব আছে, কিন্তু এই কৃতিত্ব প্রধানতঃ চৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলাতে সীমাবদ্ধ—অন্ত্যলীলা মোটেই ফুটে উঠে নি। কাব্যটি গান করার জন্য লেখা হয়েছিল, তাই অনেক রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে।

চৈতন্য-চরিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত'। ঘটনাবর্ণনার দিক থেকে এই মহাকাব্য বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'র পরিপূরক। 'চৈতন্য ভাগবতে' চৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার বিস্তৃত বিবরণ আছে; তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার পুনরুক্তি না করে ঘটনাগুলি সূত্রাকারে বর্ণনা করেছেন। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ থেকে তাঁর জীবন 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই মহাগ্রন্থ কেবলমাত্র আখ্যান বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নয়; গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা এর অন্যতম প্রধান

১৭। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গণেশের পূজা প্রচলিত ছিল না।

বিশেষত্ব। রাধাগোবিন্দ নাথ লিখেছেন :

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জীবনাখ্যান অপেক্ষা দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাই বেশী। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের সমস্ত মূলতত্ত্ব এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিকে সমস্ত গোস্বামিশাস্ত্রের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্পুট। তাই এই অপূর্ব গ্রন্থখানি বৈষ্ণবের নিকট পরম আদরণীয়, বেদবৎ মান্য। ইহা বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাণ্ডারেরও একটি অপূর্ব রত্নবিশেষ; কবিত্বের সহিত দার্শনিক তত্ত্বালোচনার এমন সুন্দর ও সহজ সমাবেশ অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না; এই গৌর-লীলা-রস-নিবিক্ত গ্রন্থখানির আর একটি অদ্ভুত বিশিষ্টতা এই যে, ইহা যতই পাঠ করা যায়, ততই পাঠের আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হয়, ততই যেন অধিকতর রূপে ইহার মাধুর্য অনুভূত হইতে থাকে। ...এই বাঙ্গালা গ্রন্থখানির সংস্কৃত টীকা লিখিয়া শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইহার অপূর্ব-বিশেষত্বের একটা স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।'[১৮]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চৈতন্যচরিতামৃত' দুটি কারণে অনন্য। প্রথমতঃ, আজ পর্যন্ত কোন বাংলা কাব্যে নিগূঢ় ধর্মতত্ত্বের এমন গভীর আলোচনা হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা ভাষার সেই অপরিণত যুগে গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হয় নি, ভক্তিমূলক গীতি-কবিতাই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল; তত্ত্বালোচনার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। ভাষা ও সাহিত্যের সেই পরিবেশে, বাংলা দেশ থেকে বহু দূরে সংস্কৃত চর্চায় ব্যস্ত গোস্বামীদের সান্নিধ্যে থেকে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের বলে মাতৃভাষায় নতুন শক্তি সঞ্চার করলেন, জনগণের ভাষার ভাবপ্রকাশ-ক্ষমতা কতদূর প্রসারিত হতে পারে তা প্রমাণ করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারেন এমন লেখক আর বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করলেন না।

'চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতার সংস্কৃতে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, দুরূহ সংস্কৃত কবিতা রচনা করেছেন, সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা মুখে নানা স্থানে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। হিন্দী ও ফার্সী শব্দ ও বাক্যরীতি ব্যবহারেও তাঁর অসুবিধা হত না; এটা বোধ হয় দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাসের ফল। বাংলা ত্রিপদী অংশগুলিতে তাঁর কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ কবি বা আখ্যানগ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাত্ত্বিক। বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে তিনি তত্ত্বালোচনার উপযোগী জোরালো এবং তীক্ষ্ন রচনাভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে—যখন তিনি ছিলেন 'বৃদ্ধ জরাতুর অন্ধ বধির' তখন—এমন মহাগ্রন্থ রচনার আর কোন দৃষ্টান্ত নেই।

এই জটিল গ্রন্থ লেখা হয়েছিল পড়বার জন্য, গান করবার জন্য নয়। তবে ত্রিপদী ছন্দে লেখা কাব্যাংশগুলি সুর দিয়ে আবৃত্তি করা যেত।

১৮। রাধাগোবিন্দ নাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, ৩-৪ পৃষ্ঠা।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার অদূরে ঝামটপুরে সম্পন্ন বৈদ্য পরিবারে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম হয়েছিল। তাঁর জন্মকাল ও মৃত্যুকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তাঁর মহাগ্রন্থ রচনাকাল সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত আছে। এক মতে গ্রন্থসমাপ্তি ১৫৮১ সালে, অন্য মতে ১৬১২ সালে।

কাব্যরস এবং দার্শনিক তত্ত্ববিচারের দিক থেকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' অতি উচ্চস্তরের গ্রন্থ হলেও ঐতিহাসিক বিচারে এতে নানারকম ত্রুটি লক্ষ করা যায়। প্রধান ত্রুটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা এবং অতিশয়োক্তি। চৈতন্য-জীবনের উপাদান সংগ্রহে ত্রুটি আছে। দার্শনিক তত্ত্ববিচার প্রসঙ্গে রূপ-সনাতন-জীবের মত চৈতন্যের উপর আরোপ করা হয়েছে। তথাপি চৈতন্য-জীবনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার জন্য এই গ্রন্থই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান এবং বাংলাভাষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ব্যাখ্যার এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য আকর।

চৈতন্য যুগের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের বিষয় ছিল পৌরাণিক গল্প, দেবতার মাহাত্ম্য কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা। চৈতন্য-জীবনী রচনা বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন খাতে প্রবাহিত করল। 'এক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইল।' অতীত থেকে মানুষের মন বর্তমানের দিকে ফিরে এল, অথচ কৃষ্ণলীলার সঙ্গে গৌর-লীলার মিশ্রণে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র রক্ষা করা হল।

বৈষ্ণব সাহিত্যের বাইরে ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ কাব্য কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল'। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী রচিত এই কাব্য তাঁরই বন্দনাগীতি। তিনি 'উগ্রা, প্রচণ্ডা, ধ্বংসাত্মিকা শক্তি' রূপে মুকুন্দরামের কল্পনায় আবির্ভূতা হন নি; তিনি এসেছেন 'শমগুণপ্রধানা, ভক্তবৎসলা, কল্যাণরূপিণী' মাতার রূপে। তিনি অভয়া। কাব্যটির আসল নাম 'অভয়া মঙ্গল'।

মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী চণ্ডীমঙ্গলের কবি 'দ্বিজ' মাধবের কাব্যে বৈষ্ণব ভাব ও কাব্যরীতির প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'মুকুন্দরামে এই বৈষ্ণব ভাবপ্রাধান্য অনেকটা ক্ষীণ হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ তাঁহার চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রতি অনাস্থা বা পদাবলী সাহিত্যের মাধুর্যের প্রতি ঔদাসীন্য নহে। তিনি তাঁহার দেববন্দনার মধ্যে চৈতন্যদেবের অলৌকিক চরিত্র-মাধুর্য ও সর্বভূতে করুণার প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন।[১১] ...তাঁহার কাব্যের অন্যত্র বৈষ্ণবপ্রভাব লক্ষিত না হইলেও তাঁহার নায়িকার রূপবর্ণনার পদাবলীর কান্ত কোমল মাধুর্য সুপরিস্ফুট। ...গ্রন্থের অন্যান্য অংশে যে কবি যুগপ্রচলিত

১১। 'অবনীতে অবতরি / চৈতন্যরূপেতে হরি / বন্দিব সন্ন্যাসীশিরোমণি'।

বৈষ্ণবপ্রভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই তাহার কারণ তাঁহার পরিণত শিল্পজ্ঞান ও বিষয়ের স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর সঙ্গতিবোধ।'[২০]

চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগেও চণ্ডীমঙ্গল রচনার প্রথা ছিল; 'চৈতন্যভাগবতে' বৃন্দাবনদাস 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'আদ্য কবি' ছিলেন। ষোড়শ শতকে চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা রূপে 'দ্বিজ মাধব' এবং আরো কয়েকজন কবির নাম পাওয়া যায়; কিন্তু মুকুন্দরামের সঙ্গে তাঁদের তুলনা হয় না। 'চৈতন্য ভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' বাদ দিলে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ষোড়শ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা কাব্য। নিছক 'সাহিত্যের ও শিল্পের বিচারে' মুকুন্দরাম বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উপরে স্থান দাবি করতে পারেন। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, 'মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্যগোষ্ঠীর মধ্যে যে একখানি কাব্য সংকীর্ণ ধর্মগত প্রয়োজন ছাড়াইয়া সার্বভৌম রসস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তাহা মুকুন্দরামের কবিকংকণ - চণ্ডী'।

মুকুন্দরামের কাব্য সম্ভবতঃ ১৫৭৯ সালে রচিত; ইহা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র পূর্ববর্তী। কাব্যে মানসিংহের (বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার, ১৫৯৪—১৬০৫) উল্লেখ আছে, কিন্তু কাব্যটি যে তাঁর শাসনকালে রচিত হয়েছিল একথা স্পষ্টভাবে বলা হয় নি। কাব্যের এই অংশটি কবি কর্তৃক পরে সংযোজিত হতে পারে, পরবর্তী কোন লিপিকর কর্তৃক প্রক্ষিপ্তও হতে পারে।

কাব্যের অন্তর্ভুক্ত আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়, মুকুন্দরামের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যা বা দামিন্যা গ্রামে। স্থানীয় ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করেন এবং অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আরড়া গ্রামে উপস্থিত হন। পথে চণ্ডী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করতে আদেশ দেন। আরড়া গ্রামে তিনি ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে (১৫৭৩—১৬০৪) কাব্যটি রচিত হয়।

মুকুন্দরামের রচনা অনেকটা 'নাট্যধর্মী'। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি কবিসুলভ বর্ণনার পদ্ধতি ত্যাগ করে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে আখ্যায়িকাকে রূপ দিয়েছেন। এই রীতি চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। নারীচরিত্র এবং শঠ ও স্বার্থান্বেষী পুরুষের চরিত্র অঙ্কনে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন।

মুকুন্দরামের পাণ্ডিত্য ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলংকারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু তিনি সরল, অনাড়ম্বর ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর সহজ কবিত্বশক্তি প্রকাশের জন্য আলংকারিক কাঠামোর প্রয়োজন হয় নি। তিনি ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু মানবধর্ম তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রসারিত করেছিল। 'তাঁহার সহানুভূতি হইতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই - না বনের তুচ্ছতম পশু, না গ্রামের

২০। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত 'কবিকংকণ—চণ্ডী', ভূমিকা।

দুর্গততম মানুষ।' তিনি নিম্ন বর্ণের বিভিন্ন জাতির বর্ণনা করেছেন, ভদ্র মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক দিনকৃত্য সহৃদয়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, নগর পত্তন বর্ণনা উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চেহারা 'সামান্য রেখাঙ্কনে সমুজ্জ্বল' করে তুলেছেন। বর্ণনা উপলক্ষে মাঝে মাঝে 'পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে সব চেয়ে দুর্লভ' কৌতুক রস (humour) ফুটে উঠেছে।

মুকুন্দরামের পূর্বেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে বাস্তবতার প্রবাহ প্রবেশ করেছিল, কিন্তু তাঁর কাব্যেই বাস্তবতার 'শ্রেষ্ঠতম সাবলীলতম প্রকাশ'। তবে তাঁর বাস্তববোধের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-সাধনার আদর্শ' এবং 'কবিজন-সুলভ আদর্শ প্রীতি'র সংমিশ্রণ ছিল। তাঁর 'পরিবেষণ-নৈপুণ্য' এমনই ছিল যে তাঁর কাব্য থেকে 'সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায়'। কিন্তু তিনি সমাজের বাইরের ছবি অংকন করেই তৃপ্ত থাকেন নি, 'সমাজ-জীবনের স্বচ্ছন্দ-লীলায়িত গতিচ্ছন্দ, ইহার বহির্ঘটনার অন্তরালশায়ী মর্মস্পন্দন (তাঁর রচনায়) চমৎকার ভাবে' ফুটে উঠেছে। মধ্য যুগের কোন কাব্যে বাঙালী-জীবনের এমন পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। এদিক থেকে মুকুন্দরামের কাব্য ঐতিহাসিকের কাছে বিশেষ মূল্যবান।

'দুঃখের তীব্র নগ্ন রূপ' মুকুন্দরামের কাব্যে নানা স্থানে 'জীবন্ত ও উজ্জ্বল' ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হয়তো তাঁর নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা—শাসকের অত্যাচার ও দারিদ্র্যের পীড়ন—এভাবে কাব্যরচনাকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তাঁকে দুঃখবাদী কবি বলা যায় না, তাঁর বর্ণনায় 'দুঃখক্লিষ্ট মনের স্থিতিস্থাপকতা' বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণবদের রচিত পদাবলী ও নিবন্ধগুলিতে কোনরকম নতুন বা মৌলিক বিকাশের লক্ষণ দেখা যায় না। এই শতকের বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রাচুর্য আছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের অভাব; প্রতিভার স্ফুরণ নেই। পদাবলী সাহিত্যে গতানুগতিক রীতির আধিক্য সুস্পষ্ট।

ভারত-আখ্যান রচয়িতা কাশীদাস দেব (শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কায়স্থ) সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গি (সিদ্ধি ?) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মোটামুটি বলা যায়, তিনি সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক। তিনি সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নি।

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।

পরে একাধিক কবি তাঁর অসমাপ্ত রচনা সমাপ্ত করেন। বিভিন্ন কবির রচনার সংমিশ্রণে কাব্যটি অষ্টাদশ শতকের সূচনায় যে রূপ গ্রহণ করেছিল সেটি শ্রীরামপুর

মিশন প্রেসে ছাপা হয়েছিল ১৮০৩ সালে। সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮৩৬ সালে; সম্পাদক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকার (ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্যতম শিক্ষা গুরু)। বইটি জনপ্রিয় হয়েছিল, তাই বটতলার প্রকাশকেরা এটি ছাপিয়ে সস্তায় বিক্রয় করত। তারা শ্রীরামপুর মিশন সংস্করণের উপর নির্ভর না করে নানারকম পুথি ব্যবহার করেছিল। অপর একটি সংস্করণের সম্পাদক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য লিখেছেনঃ 'দোকানী পসারী পর্যন্ত সকলে কাশীদাসি মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করে তাহাতে ছাপাকারেরা বারম্বার ঐ মহাভারত ছাপিয়া অনেক লভ্য করিয়াছিলেন…মূলের প্রতি প্রায় কেহ দৃষ্টিপাত রাখিলেন না, তাহাতেই কাশীদাসি অভিপ্রায় সকল বিপরীত হইয়া উঠিল…।'

যে যুগে ইংরেজি শিক্ষার প্রচার সুরু হয়েছিল সেই যুগে মহাভারতের এই জনপ্রিয়তা বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। মহাভারত ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বাংলায় জনশিক্ষার এক নতুন ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

সপ্তদশ শতকে রামায়ণী কথা অবলম্বন করে কয়েকটি কাব্য রচিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিত্যানন্দ আচার্য—যিনি 'অদ্ভুত-আচার্য' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

ধর্মঠাকুরের পূজা ও কাহিনী অবলম্বন করে সপ্তদশ শতকে কয়েকটি কাব্য ও নিবন্ধ রচিত হয়েছিল। এই সব রচনার কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই, তবে লোক সংস্কৃতি এবং জনসাধারণের ধর্মজীবন সম্বন্ধে আলোচনায় এদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতাদের মধ্যে প্রথম রূপরাম চক্রবর্তী সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে এই 'গীত' লিখেছিলেন। সীতারাম দাস একটি ধর্মমঙ্গল এবং একটি মনসামঙ্গল রচনা করেন। সম্ভবতঃ বংশীদাস (বা বংশীবদন) চক্রবর্তীর 'পদ্মাপুরাণ' (মনসামঙ্গল) সপ্তদশ শতকে রচিত হয়েছিল। মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ।

মোগল আমলে মুসলমান কবিরা বাংলায় কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। তাঁদের কর্মস্থল ছিল চট্টগ্রাম ও আরাকান। সারিবিদ খাঁ (শাহ বরিদ খাঁ) প্রথম বিদ্যাসুন্দর কাব্য ('পাঞ্চালিকা') রচনা করেন। তিনি কিছু সংস্কৃত জানতেন; তাঁর কাব্যে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি এবং সংস্কৃত থেকে নেওয়া সাধু বাংলা শব্দের ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়।

আরাকান-রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় দৌলত কাজী এবং আলাওল 'অনুবাদাত্মক প্রণয়কাব্য' রচনা করেন। আরাকানীরা তাদের মাতৃভাষা—অর্থাৎ

স্থানীয় ভাষা—ব্যবহার করত। কিন্তু তাদের সঙ্গে বাংলার নানাভাবে যোগ ছিল; চট্টগ্রাম দীর্ঘকাল তাদের শাসনাধীন ছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমানেরা আরাকানে যেত, এবং অনেকে রাজকর্মচারীর পদ লাভ করত।[২১]

আরাকানের রাজা 'শ্রীসুধর্মা'র (১৬২২-৩৮) 'লস্কর-উজীর' আশরফ খাঁর অনুরোধে দৌলত কাজী 'সতী ময়না' বা 'লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। রচনা কাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের তৃতীয় দশক। এই কাব্যে কবিত্বশক্তির উল্লেখযোগ্য বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

আলাওল সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হাতে বন্দী হন। তারা তাঁকে আরাকানে নিয়ে বিক্রয় করে। সেখানে তিনি 'রাজ-আসোয়ার' (ঘোড়সওয়ার?) রূপে নতুন জীবন আরম্ভ করেন। পরে তিনি ক্রমান্বয়ে রাজমন্ত্রী সুলেমান, রাজকন্যার প্রধান ওমরাহ মাগন ঠাকুর এবং অপর এক রাজার অমাত্য আর এক সুলেমানের অনুগ্রহ লাভ করেন। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মাবতী পাঞ্চালী' রচনা করেন। এটি অযোধ্যার অন্তর্গত জায়স গ্রাম নিবাসী হিন্দী কবি মালিক মোহাম্মদের রচিত 'পদুমাবতি' কাব্যের (রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪০-১৫৪২) মোটামুটি স্বাধীন অনুবাদ। বিষয় চিতোরের রাণী পদ্মিনীর কাহিনী। সম্ভবতঃ আলাওলের কাব্য ১৬৫১ সালে রচিত হয়েছিল। তিনি আরো কয়েকটি কাব্য লিখেছিলেন।

আরাকানের বাইরে—চট্টগ্রামে—সৈয়দ সুলতান পদাবলী এবং মুসলমান ধর্ম নিবন্ধ রচনা করেন। আর একজন কবি 'মুহাম্মদ-হোসেন' কারবালার যুদ্ধ-কাহিনী ফার্সী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন।

মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ সপ্তদশ শতকের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। মোগল পাদশাহী শাসন সুসংবদ্ধ হবার পরে এটা ঘটেছিল, কিন্তু কোন মোগল সম্রাট বা রাজকর্মচারীর পৃষ্ঠপোষকতা এর পিছনে ছিল না। কবিদের কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং তৎসংলগ্ন আরাকানে। বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

দৌলত কাজী এবং আলাওলের রচনায় সূফী প্রভাব সুস্পষ্ট। আলাওল বিভিন্ন ভাষায়—আরবী-ফার্সী-সংস্কৃত-বাংলা-হিন্দীতে—অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবন-কাহিনী আলোচনা করলে স্বভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, আরাকান থেকে তিনি এ রকম শিক্ষালাভ করলেন কিভাবে? হয়তো তাঁর আদি বাসস্থান চট্টগ্রামেই এর সূত্রপাত হয়েছিল। তিনি আরবী-ফার্সী শব্দ খুবই কম ব্যবহার করেছেন। সৈয়দ সুলতানের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এক নতুন

২১। দ্রষ্টব্য: আবদুল করিম ও এনামুল হক, 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য'।

আলোর ইঙ্গিত দেয়। তিনি মুসলমান নবীদের সঙ্গে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-কৃষ্ণকেও নবী বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর রচনায় বেদের উল্লেখ আছে, কৃষ্ণের চমৎকার রূপবর্ণনা আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ধর্মের ক্ষেত্রে উদারতার এই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তগুলি 'কাফের' ও 'যবনের' মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারে নি।

৫

নবাবী আমল

১। মুর্শিদকুলি খাঁ

প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদারকে সাধারণ ভাবে বলা হত 'নবাব'। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) পর্যন্ত নবাবেরা বাদশাহের কর্তৃত্বাধীনে কাজ করতেন ; তাঁদের নিয়োগ, পদচ্যুতি, বদলি প্রভৃতি বাদশাহের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। ১৬৮৮ সালে আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে বাংলা থেকে আগ্রায় বদলি করেন। পরবর্তী সুবাদার খাঁ-ই-জহান নিয়োগের পর কয়েক মাসের মধ্যে পদচ্যুত হন। ইব্রাহিম খাঁ দীর্ঘকাল সুবাদারী করার পর শোভা সিংহ এবং রহিম খাঁর বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতার জন্য বরখাস্ত হন (১৬৯৭)। তাঁর পরবর্তী সুবাদার, আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ-শান, ১৬৯৭ সালে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭০৩ সালে সম্রাটের নির্দেশে বিহারও তাঁর শাসনাধীন হয় এবং তাঁর শাসনকেন্দ্র ঢাকা থেকে পাটনায় সরিয়ে নেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যুকাল (১৭১২) পর্যন্ত তিনি নামে বাংলার সুবাদার ছিলেন, কিন্তু কার্যভার ন্যস্ত ছিল ক্রমান্বয়ে দু'জন সহকারী সুবাদারের উপর। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর পুত্র ফররুখ-সিয়র (১৭১০ সাল পর্যন্ত), আর একজন খাঁ-ই-আলম। আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাট প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহের (১৭০৭-১২) পর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন তাঁর পুত্র জাহান্দার শাহ (১৭১২)। তিনি খাঁ-ই-আলমকে বাংলার স্থায়ী সুবাদার রূপে বহাল রাখেন। জাহান্দার শাহকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন ফররুখ-সিয়র (১৭১৩-১৯)। তিনি খাঁ-ই-আলমকে বরখাস্ত করে বাংলার সুবাদারী দিলেন তাঁর এক শিশু পুত্রকে, কিন্তু শাসনকার্যের দায়িত্ব দেওয়া হল মুর্শিদকুলি খাঁকে (১৭১৩)। কয়েক মাস পরে শিশুর মৃত্যু হল, সুবাদার নিযুক্ত হলেন মীর জুমলা, কিন্তু মুর্শিদকুলি তাঁর পূর্ব দায়িত্বে বহাল রইলেন। মীর জুমলা কখনও বাংলায় আসেন নি।

ফররুখ-সিয়র ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলিকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।

১৭১৭ সালের পরে দিল্লীর কোন সম্রাট বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন নি। বাংলার শাসনকর্তৃত্ব দখল করা হত বংশানুক্রমিক অধিকারে অথবা বাহুবলে; দিল্লীর সম্রাটকে তাঁর সার্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে প্রচুর নজরানা দিয়ে তাঁর অনুমোদন নেওয়া হত। মোগল পাদশাহীর অস্তগামী ছায়া দীর্ঘকাল পরে ইংরেজেরা সরিয়ে দিয়েছিল। মুর্শিদকুলি থেকে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত বাংলার পাঁচ জন নবাব স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু পাদশাহের সার্বভৌম অধিকার অস্বীকার করেন নি। মীরজাফর এবং মীর কাসিম ইংরেজের কর্তৃত্ব মানতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ ইংরেজের সাহায্যেই তাঁরা বাংলার মসনদ অধিকার করেছিলেন। মীর কাসিম কিছুকাল পর এই কর্তৃত্ব অস্বীকার করে রাজ্য হারালেন। মীর জাফরের বংশীয় নবাবেরা ছিলেন ইংরেজের হাতের পুতুল। ১৭৯০ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস মুর্শিদাবাদ থেকে নিজামত আদালত কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন এবং ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থায় নবাবের নামমাত্র কর্তৃত্বের বিলোপ করেছিলেন।

চল্লিশ বৎসর (১৭১৭-৫৭) বাংলার নবাবেরা কার্যতঃ স্বাধীন ছিলেন। এই যুগকে 'নবাবী আমল' বলা যায়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত ইংরেজেরা রাজনৈতিক কারণে নবাবীর কাঠামো বজায় রেখেছিল। এই যুগকেও নবাবী আমলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মুর্শিদকুলির নবাবী পদে নিয়োগের পর থেকে বাংলার যে স্বাধীনতা লাভ হল তার মূল কারণ ছিল মোগল পাদশাহীর ক্রমবর্ধমান দৌর্বল্য। এর সূত্রপাত হয়েছিল আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ জীবনের শেষ দিকে। প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহের সময় থেকেই সাম্রাজ্যের কাঠামোতে প্রকাশ্য ভাঙন আরম্ভ হয়। মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৭১৯-৪৮) ভাঙনের গতি অপ্রতিহত হল। নাদির শাহের আক্রমণ (১৭৩৮-৩৯) বাদশাহী মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দিল। মোগল সাম্রাজ্য কফিনে শায়িত একটি সুসজ্জিত মৃতদেহে পরিণত হল। নাদির শাহের অনুবর্তী হলেন আহম্মদ শাহ আবদালী। ১৭৪৮ সাল থেকে ১৭৬৭ সালের মধ্যে তিনি বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মোহাম্মদ শাহের পুত্র আহম্মদ শাহ (১৭৪৮-৫৪) তাঁর উজীরের ষড়যন্ত্রে রাজ্য ও প্রাণ হারালেন। পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের (১৭৫৪-৫৯) ক্ষেত্রেও ঠিক এই ঘটনাই ঘটল। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শাহ আলম উজীরের ভয়ে দিল্লী ত্যাগ করে অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। তাঁর কাছ থেকেই কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী নিয়েছিল (১৭৬৫)।

সাম্রাজ্যের এই অবস্থায় দিল্লীর পক্ষে প্রদেশগুলির উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। বাংলার মত অযোধ্যা এবং হায়দরাবাদেও স্বাধীন শাসক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সর্বত্রই আকবর-আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীকে

মৌখিক সম্মান দেখানো হত। কোন স্বাধীন প্রাদেশিক শাসক স্বাধীনতাসূচক উপাধি গ্রহণ করতেন না। সিংহাসন লাভের ব্যবস্থা আইনের দিক থেকে পাকা করার জন্য প্রাদেশিক শাসকেরা বাদশাহের অনুমোদন আবশ্যক মনে করতেন। সম্রাটেরা এই সুযোগ ব্যবহার করতেন তাঁদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য। যিনি বেশি টাকা দিতেন তাঁকেই সুবাদারীর জন্য বাদশাহী সনদ দেওয়া হত। একজনকে টাকা নিয়ে সনদ দিয়ে অন্যাকে আবার একই পদের জন্য সনদ দিতে বাদশাহী দরবারের আপত্তি থাকত না—যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি টাকা দিত। ১৭২২ সালে (অযোধ্যার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা) সাদাত খাঁকে মোহাম্মদ শাহ অযোধ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। সাদাত খাঁ হাতীর পিঠে চড়ে দিল্লী থেকে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু তিনি হাতীর লেজের দিকে মুখ রেখে হাওদায় বসলেন। তাঁর এক সঙ্গী এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, তাঁর পরবর্তী অযোধ্যার সুবাদার তাঁর পিছনে আসছেন কিনা তাই তিনি দেখছেন। এই কাহিনী থেকে বাদশাহী দরবারের কর্মপদ্ধতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিহাসের মুর্শিদকুলি খাঁর নাম ছিল মোহাম্মদ হাদি। মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর উপাধি। আরো কয়েকটি উপাধি ছিল: কারতলব খাঁ, জাফর খাঁ, আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নাসিরী নাসির জঙ্গ মুতমন-উল-মুল্ক। ইংরেজদের কাগজপত্রে ও বইতে তাঁকে সাধারণতঃ জাফর খাঁ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চপদস্থ মুসলমানদের ক্ষেত্রে অনেক সময় উপাধিকে ব্যক্তিগত নামের মত ব্যবহার করা হত।

মুর্শিদকুলি ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। ভারতে আগত পারস্য নিবাসী এক মুসলমান তাঁকে ক্রয় করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তাঁর নাম দিয়েছিলেন মোহাম্মদ হাদি। তিনি হাদিকে পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহানে নিয়ে যান এবং ফার্সী ভাষায় সুশিক্ষিত করেন। পরে পালক প্রভুর সঙ্গে হাদি ভারতে ফিরে আসেন। এই পালক প্রভু আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলায়, দক্ষিণ ভারতে এবং দিল্লীতে রাজস্ব বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অধীনে কাজ করে হাদি রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৬৯০ সালে তিনি পালক প্রভুর সঙ্গে আবার পারস্যে চলে যান, ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তাঁর মৃত্যুর পরে—সম্ভবতঃ ১৬৯৬ সালে। অল্পদিন পরে—সম্ভবতঃ ১৬৯৮ সালে—আওরঙ্গজেব তাঁকে হায়দরাবাদের দেওয়ান এবং একটি অঞ্চলের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। তাঁর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট ১৭০০ সালের নভেম্বর মাসে তাঁকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। মোগল সাম্রাজ্যের শাসনবিধি অনুযায়ী দেওয়ান ছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা। তিনি সুবাদারের অধীন

ছিলেন না ; তাঁকে জবাবদিহি করতে হত সমগ্র সাম্রাজ্যের দেওয়ানের কাছে—যাঁর অফিস ছিল দিল্লীতে। ক্রমে হাদির উপর দেওয়ানী ছাড়া অতিরিক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হল। তিনি মকসুদাবাদ, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলীর ফৌজদার হলেন এবং শ্রীহট্টের ফৌজদারী দেওয়া হল তাঁর মনোনীত এক ব্যক্তিকে। ফৌজদার রূপে তিনি বাংলার অর্ধাংশের উপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ফৌজদারী মামলার বিচারকের কাজ করতেন। ১৭০২ সালে তিনি মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধি লাভ করলেন (বাংলায় আসার আগেই তাঁর উপাধি হয়েছিল কারতলব খাঁ)। ১৭০৩ সালে তিনি উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার (পরে সুবাদার), ১৭০৪ সালে বিহারের দেওয়ান এবং ১৭০৭ সালে বাংলার সহকারী সুবাদার নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৭০৮—৯ সালে তাঁর ভাগ্য পরিবর্তিত হল। তিনি বাংলার দেওয়ানী এবং উড়িষ্যার সুবাদারী হারালেন, তাকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান নিযুক্ত করা হল। তখন আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়েছে, সিংহাসন অধিকার করেছেন প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহ।

১৭০৮-৯ সালে মুর্শিদকুলি ছিলেন দাক্ষিণাত্যে। ১৭১০ সালের প্রথম দিকে তিনি আবার দেওয়ান হয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করলেন। ১৭১১ সালে তাঁর এই পদের সঙ্গে যুক্ত হল মেদিনীপুর ও হুগলী বন্দরের ফৌজদারী। সম্রাট ফররুখ-সিয়রের রাজত্বকালে তিনি ক্রমান্বয়ে বাংলার সরকারী সুবাদারী (১৭১৩), উড়িষ্যার সুবাদারী (১৭১৪) এবং বাংলার সুবাদারী (১৭১৭) লাভ করলেন। ১৭১৭ সাল থেকে মৃত্যুকাল (১৭২৭) পর্যন্ত তিনি বাংলা এবং উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন।

অজ্ঞাতকুলশীল মুর্শিদকুলি নীল রক্তের অধিকারী ছিলেন না, তাঁর উন্নতির মূলে ছিল কর্মদক্ষতা। বাংলার রাজস্ব বিভাগে শৃংখলা প্রবর্তন করে তিনি সম্রাটকে প্রত্যেক বৎসর এক কোটি টাকা পাঠাতেন দাক্ষিণাত্যে তাঁর যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য। অর্থাভাবে জর্জর আওরঙ্গজেবের পক্ষে এটা ছিল এমন এক সুযোগ যা' পূর্ববর্তী কোন সুবাদার তাঁকে দিতে পারেন নি। তাই মুর্শিদ-কুলিকে তিনি 'জীবনরক্ষক-দেবদূত' ('life-saving angel') রূপে গণ্য করতেন। এই দেবদূতের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তাঁর দরবারে গ্রাহ্য হত না।

মুর্শিদকুলি যখন বাংলার দেওয়ানী গ্রহণ করেন তখন সুবাদার ছিলেন আজিম-উশ-শান। বাংলার শাসন সম্বন্ধে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন অলস ও লোভী। ব্যক্তিগত বিলাসের জন্য, এবং অদূর ভবিষ্যতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে তাঁর বংশধরদের মধ্যে যুদ্ধের যে নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল তার জন্য, বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি সুজা, মীর জুমলা এবং শায়েস্তা খাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসা সুরু করলেন। আওরঙ্গজেব এই 'পাগলামি'কে ('pure insanity') তিরস্কার করায় তিনি

নানাভাবে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করলেন। ফলে নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহ এবং সম্রাটকে বার্ষিক কর পাঠানো সম্বন্ধে মুর্শিদকুলির অসুবিধা হল। কড়া শাসক দেওয়ানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সুবাদার একদল সৈন্যকে প্ররোচিত করলেন ঢাকার রাজপথে তাঁকে আক্রমণ করার জন্য। আক্রমণ ব্যর্থ হল। মুর্শিদকুলি প্রকাশ্য দরবারে সুবাদারকে অভিযুক্ত করলেন, সম্রাটের কাছে ঘটনার বিবরণ পাঠালেন, এবং ঢাকায় বাস করা নিরাপদ হবে না জেনে মকসুদাবাদে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে দেওয়ানী বিভাগের সেরেস্তাও এখানে স্থানান্তরিত হল। পরে সম্রাটের অনুমতি নিয়ে এই নতুন শাসনকেন্দ্রের নাম হল মুর্শিদাবাদ। ইতিমধ্যে সম্রাটের নির্দেশে আজিম-উশ-শান ঢাকা পরিত্যাগ করে পাটনায় তাঁর দরবার স্থাপন করেছিলেন। ১৭০৬ সালে তিনি পাটনা থেকে বাদশাহী দরবারে চলে গেলেন; সঙ্গে নিয়ে গেলেন বাংলা থেকে লুণ্ঠিত আট কোটি টাকা। ১৭০৩ সাল থেকে বাংলায় তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন তাঁর পুত্র ফররুখ-সিয়র।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ মুর্শিদকুলির ভাগ্য প্রভাবিত করেছিল। প্রায় দুই বৎসর (১৭০৮-৯) তাঁকে বাংলা থেকে সরে গিয়ে দাক্ষিণাত্যে দেওয়ানী করতে হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে আসার পর (১৭১০) বাংলা কার্যতঃ তাঁর শাসনাধীন হল, যদিও তিনি কাগজে-কলমে সুবাদারী লাভ করলেন ১৭১৭ সালে। বাদশাহী সিংহাসন সংক্রান্ত বিরোধে তিনি কোন প্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করেন নি, যখন যিনি সিংহাসন দখল করতেন তাঁকেই তিনি কর দিতেন। দিল্লীর প্রতি তাঁর আনুগত্য শুধু মৌখিক ছিল না, আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটদের কোষাগারেও তিনি নিয়মিত ভাবে বার্ষিক এক কোটি টাকা পাঠাতেন। এই টাকার পরিবর্তে বাংলার মানুষ কিছুই পেত না, এটা ব্যয় হত বাদশাহদের বিলাসে ও যুদ্ধে। কোন প্রতিদান না পেয়ে কর দেবার এই ব্যবস্থা ইংরেজেরা মেনে নিয়ে ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত চালু রেখেছিল।

দেওয়ান মুর্শিদকুলি সুবাদার হয়ে মোগল শাসনবিধির এক মৌলিক পরিবর্তন করলেন। আকবরের সময় থেকে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক দেওয়ানেরা প্রায় স্বাধীনভাবে প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগ পরিচালনা করতেন। তাঁর উপরওয়ালা ছিলেন দিল্লীতে বাদশাহী দেওয়ান। মুর্শিদকুলির সুবাদারী আমলে তিনিই দেওয়ান নিযুক্ত করতেন। ফলে দেওয়ান বাদশাহের অধীন কর্মচারী না হয়ে সুবাদারের অধীন কর্মচারী হলেন। রাজস্ব বিভাগের পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে দিল্লীর সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল। শাসন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে সুবাদারের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। মুর্শিদকুলির পরবর্তী নবাবদের আমলেও এই রীতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

মোগল আমলের বড় বড় ওমরাহ, সুবাদার প্রভৃতি যুদ্ধে ও রাজনীতিক্ষেত্রে

অংশগ্রহণ করতেন এবং এই দুটি ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়ে জীবনে উন্নতিলাভ করতেন। মুর্শিদকুলি এই শ্রেণীর বাইরে ছিলেন। তিনি ছিলেন শুধু মসিজীবী, যুদ্ধের ক্ষেত্রে অথবা দরবারী ষড়যন্ত্রে তাঁকে দেখা যায় নি। সুবাদারী লাভের পরেও তিনি ছিলেন 'উঁচু স্তরের প্রশাসক' ('glorified civil servant') মাত্র, অযোধ্যার নবাব এবং হায়দরাবাদের নিজামের মত তিনি বাদশাহী রাজনীতি বা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন নি। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশ 'বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবে' ('disorder and revolution') বিধ্বস্ত হচ্ছিল, কিন্তু বাংলা দু'জন 'অসাধারণ দক্ষতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা' সম্পন্ন 'দীর্ঘজীবী' শাসকের ('two rulers of exceptional ability, strength of character and long life') অধীনে শান্তি ভোগ করেছিল।[১] মুর্শিদকুলি খাঁ এবং আলিবর্দি খাঁর শাসনকাল সম্বন্ধে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। আলিবর্দি খাঁর আমলে বিহার আফগানদের বিদ্রোহে এবং বাংলা বর্গীদের আক্রমণে উপদ্রুত হয়েছিল। মুর্শিদকুলির আমলে শান্তি বিঘ্নিত হয় নি, কিন্তু এজন্য তাঁর কোনই কৃতিত্ব ছিল না। মোগল পাদশাহীর বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছিল—মারাঠা, জাঠ, শিখ—তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলা থেকে অনেক দূরে। মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর নাদির শাহ এবং আহম্মদ শাহ আব্দালীর আক্রমণ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল দক্ষিণ ভারতে। কোন প্রবল বহিঃশত্রু বাংলা আক্রমণ করলে প্রজাদের রক্ষা করার মত শক্তি মুর্শিদকুলির ছিল কিনা সন্দেহ।

মুর্শিদকুলি যখন দেওয়ান ছিলেন তখন মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোনায় এবং পূর্ণিয়ার অন্তর্গত মোরাঙ্গে বিদ্রোহ দমন করা হয়, খুলনার অন্তর্গত ভূষণার সীতারাম রায়ের বিস্তৃত জমিদারী সুবাদারী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ত্রিপুরার রাজা এবং জয়ন্তিয়ার রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কোচবিহারের রাজা সন্ধিসূত্রে ফতেপুর, কাজিরহাট এবং কানাকিনা চাকলার অধিকার ছেড়ে দেন। সীতারামকে আচার্য যদুনাথ সরকার দক্ষিণ বাংলার অর্ধেকের অধিপতি এবং বাংলার শেষ হিন্দু রাজা রূপে বর্ণনা করেছেন।[২] এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত। তাঁর রাজধানী মোহাম্মদপুর সামরিক দিক থেকে সুরক্ষিত ছিল এবং এখানে তিনি বহু প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর শাসনকালে তাঁর অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছিল। ১৭১৩ সালে হুগলীর ফৌজদারকে নিহত করে তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৭১৪ সালে ভূষণার ফৌজদারের

১। যদুনাথ সরকার, *History of Bengal*, Vol. II, ৩১৭ পৃষ্ঠা।
২। তদেব, ৪১৬-১৭ পৃষ্ঠা।

নেতৃত্বে এক সুবাদারী ফৌজ তাঁকে বিধ্বস্ত করে। আচার্য যদুনাথের বর্ণনা সত্য হলে এত সহজে তাঁর পতন হত না। ইতিহাসের বিচারে তাঁকে বলতে হবে বিদ্রোহী জমিদার, যিনি কেবলমাত্র মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন নি, প্রতিবেশী জমিদারদের অধিকার জোর-জবরদস্তি করে হরণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসে 'এক মহান প্রজারঞ্জক নৃপতি' সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু নিজেই পাঠককে সতর্ক করেছেন: 'সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।'

* * *

মুর্শিদকুলির প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর আমলে প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে কোন সমসাময়িক দলিল, হিসাবের খাতা বা ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অনুমানিক ১৭৬৩ সালে লেখা সলিমুল্লার 'তারিখ-ই-বঙ্গালা' বইতে বিষয়টির কিছু বর্ণনা আছে। কোম্পানীর কর্মচারী জেম্‌স্ গ্র্যাণ্ট (James Grant) ১৭৮৬ সালে গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের কাছে এক রিপোর্ট দাখিল করেন: An Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal, chronologically arranged in different parts from the Mogul Conquest to the present time. তিনি বলেছেন যে এই রিপোর্ট সংকলনের জন্য তিনি ফার্সি ভাষায় লিখিত বহু 'ফর্দ' (ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবের খাতা) ব্যবহার করেছিলেন। এই রিপোর্টের প্রথম অংশে টোডর মলের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন (১৫৮২) থেকে মুর্শিদকুলির সংস্কার (১৭২২) পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের মোটামুটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

মুর্শিদকুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভূমি-রাজস্ব থেকে সরকারী আয় বৃদ্ধি করা। তাঁর পূর্ববর্তী সুবাদারদের আমলে বাংলার অধিকাংশ জমির আয় ভোগ করতেন জায়গীরদারেরা। পাদশাহী নীতি অনুযায়ী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নগদ বেতনের বদলে জায়গীর দেওয়া হত। সরকারী তহবিলে টাকা আসত প্রধানতঃ বাণিজ্য-শুল্ক থেকে। মুর্শিদকুলির পক্ষে দীর্ঘকালস্থায়ী জায়গীর প্রথার বিলোপ করা সম্ভব ছিল না। তিনি বাংলার অনেক জায়গীর (মোট আয় ১০,২১,৪১৫ টাকা) সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন করলেন, অর্থাৎ সেগুলি 'খালসা'র অন্তর্ভুক্ত করা হল।[৩] যারা এভাবে জায়গীর হারাল তাদের মধ্যে অনেকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উড়িষ্যায় জায়গীর লাভ করল। এ রকম ব্যবস্থা

৩। 'সকল কর্মচারীর জায়গীর' খালসায় পরিণত করা হল—আচার্য যদুনাথের এই মন্তব্য ঠিক নয় (দেখ, ৪০৯ পৃষ্ঠা)।

সম্ভব হল, কারণ মুর্শিদকুলি দীর্ঘকাল (১৭০৩-১০, ১৭১৪-২৭) উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের পরেও বাংলায় তেরটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত জায়গীর থাকল, তাদের মোট আয় ছিল ৩৩,২৭,৪৭৭ টাকা।

প্রশাসনের দিক থেকে বাংলা ৩২টি 'সরকারে' বিভক্ত ছিল। মুর্শিদকুলি এই ব্যবস্থা বাতিল করে বাংলাকে ১৩টি 'চাকলা'তে ভাগ করলেন। সাধারণতঃ একটি চাকলার ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ভার একজন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকত। তাঁকে কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক জমিদারের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হত। কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকে ইংরেজ শাসকেরা চাকলাকে 'জেলা' নাম দিয়ে প্রশাসনিক বিভাগ রূপে ব্যবহার করত। বাদশাহী আমলের 'পরগণা'র অস্তিত্ব মুর্শিদকুলি বজায় রেখেছিলেন। তাঁর সময়ে পরগণার সংখ্যা ছিল ১৬৬০। ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্রে সরকার ও পরগণা—এই দুটি নামের প্রচলন বহাল থাকল।

সুজার বন্দোবস্ত অনুযায়ী বাংলার রাজস্ব ছিল ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা। মুর্শিদকুলির আমলে হল ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা। মোট ৬৪ বৎসরে শতকরা সাড়ে তেরো বৃদ্ধি। শোষণ ও অত্যাচার ছাড়া এটা সম্ভব হয় নি। ১৭২২ সালে কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিল মন্তব্য করেছিল যে নবাব টাকার জন্য দেশটাকে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলছেন ('tearing the country to pieces')। ইংরেজেরা এবং তাদের আশ্রিত জমিদারেরা পরে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন।

সলিমুল্লা বলেছেন, মুর্শিদকুলি জরিপ করিয়ে চাষের জমির পরিমাণ ও খাজনা, অনাবাদী ও পতিত জমির পরিমাণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই মন্তব্য সাধারণভাবে সত্য হতে পারে, কিন্তু সমগ্র বাংলা জরিপ করানো হয় নি। সলিমুল্লা নিজেই বলেছেন যে বীরভূমের মুসলমান জমিদারের জমি জরিপ হয় নি, কারণ তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং ধর্মসংক্রান্ত কাজের জন্য জমি দান করতেন। এটি প্রশাসনের উপর ধর্মের প্রভাবের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। সেকালে অনেক হিন্দু জমিদার দেবতার নামে জমি দান করতেন। তাঁরা কেউ এই অজুহাতে জরিপ থেকে মুক্তি পেয়েছেন, এমন প্রমাণ নেই।

মুর্শিদকুলির আমলে ভূমি-রাজস্বের হার সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ প্রতি বিঘার খাজনা দশ আনার বেশি হত না। ধানের দামের হিসাবে এর অর্থ ছিল উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ। আওরঙ্গজেবের নিয়ম ছিল উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ। মুর্শিদকুলি 'সুবাদারী আবওয়াব' প্রবর্তন করে এই ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী নবাবেরা এই কুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। 'আবওয়াব' অর্থ জমির খাজনার বাইরে অতিরিক্ত কর। মুর্শিদকুলির আমলে জমিদারদেরও একটি বিশেষ আবওয়াব ('খাসনবিশী')

দিতে হত। তাঁরা নিজেদের সম্পদে হাত না দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে নানা-ভাবে এই টাকা আদায় করতেন। মুর্শিদকুলির কর্মচারীরা নানাভাবে প্রজাদের শোষণ করত। সংগৃহীত অর্থের কিছু অংশ সরকারী তহবিলে দিয়ে বাকিটা তারা আত্মসাৎ করত। এবিষয়ে তারা ছিল ইংরেজ আমলের জমিদারী নায়েব ও তহশিলদারদের পূর্বসূরী।

সলিমুল্লা বলেছেন, অনাবাদী ও পতিত জমি চাষের জন্য মুর্শিদকুলি আগ্রহী ছিলেন। গরীব কৃষকদের হাল, বলদ ও বীজধান ক্রয়ের জন্য সরকারী ঋণ দেবার ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থা কতখানি সফল হয়েছিল বলা যায় না। খরা-কবলিত আবাদী জমির চাষীদের উপকারের জন্য কিছু করা হত, এমন কোন প্রমাণ নেই।

উত্তর ভারতে সরকারী কর্মচারীরা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। বাংলায় এই প্রথা ('জাবতি') প্রবর্তিত হয় নি। এখানে সরকার ভূমি-রাজস্ব গ্রহণ করত জমিদারদের কাছ থেকে, তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। বিভিন্ন সময়ে প্রতিপত্তিশালী হিন্দু ও মুসলমান বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী লাভ করেছিলেন—রাজার অনুগ্রহে, কোন কোন ক্ষেত্রে বাহুবলে। ত দের উত্তরাধিকারীরা বংশানুক্রমে জমিদারী ভোগ করতেন। কালক্রমে তাঁদের মধ্যে অনেকেই অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলেন। খাজনা আদায়ে শৈথিল্য, কর্মচারীদের অসাধুতা প্রভৃতি কারণে অনেক সময় তাঁরা সরকারী রাজস্ব সময়-মত দিতে পারতেন না। মুর্শিদকুলি নিয়মিত ভাবে সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্য নতুন ব্যবস্থা করলেন। অকর্মণ্য জমিদারদের হাত থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল; প্রথমে তাঁদের ভরণপোষণের জন্য কিছু জমি ('ননকর' জমি) দেওয়া হল; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে এই জমিও সরকারের অধিকারভুক্ত হল। খাজনা আদায়ের ভার দেওয়া হল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ইজারাদারদের। তাদের কাছ থেকে জামিন নেবার ব্যবস্থা হল ('মাল জামিনী') —যাতে তারা সরকারের প্রাপ্য নির্দিষ্ট সময়ে মিটিয়ে দিতে বাধ্য থাকে। তাদের নগদ বেতন দেওয়া হত, অথবা তাদের সংগৃহীত রাজস্বের উপর কমিশন দেওয়া হত, অথবা সাময়িকভাবে জায়গীর দেওয়া হত, এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকে ইজারাদারী দেওয়া হত নীলামের মাধ্যমে, অর্থাৎ যে সব চেয়ে বেশি টাকা দিতে রাজি হত তাকেই কয়েক বৎসরের জন্য ইজারাদারী দেওয়া হত। মুর্শিদকুলি খুব সম্ভবতঃ এভাবে ইজারাদার নিয়োগ না করে নিজের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের ইজারা দিতেন। তারা মুর্শিদকুলি কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। মোটামুটি বলা যায়, ইজারাদারেরা ছিল সরকারী কর্মচারী, সরকারী কোষাগারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে নিজেদের ইচ্ছামত খাজনা আদায় করার অধিকার তাদের ছিল না।

রাজস্ব আদায়ের জন্য মুর্শিদকুলির আমলে জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের উপর কিরূপ বীভৎস নির্যাতন করা হত তার সুস্পষ্ট বর্ণনা সলিমুল্লার বইতে পাওয়া যায়। যারা নির্দিষ্ট দিনে সরকারের প্রাপ্য শোধ করতে পারত না, তাদের মুর্শিদাবাদে আটক রাখা হত, খাদ্য বা পানীয় দেওয়া হত না, প্রাকৃতিক কাজ করার অনুমতি দেওয়া হত না। জমিদারদের পা উপরে, মাথা নীচে দিয়ে টাঙিয়ে রাখা হত; নবাবের এক প্রিয় কর্মচারী তাঁদের সেই অবস্থায় লাঠি দিয়ে মারত এবং বেত্রাঘাতে জর্জরিত করত। যে শেষ পর্যন্ত টাকা দিতে পারত না তাকে সপরিবারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হত। মুর্শিদকুলির নাতনী-জামাই ও দেওয়ান সৈয়দ রাজি খাঁ অপরাধীদের জন্য আরো উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছিলেন। একটি গভীর গর্তে মানুষের মলমূত্র ঢেলে দেওয়া হত, সেখানে রাজস্ব পরিশোধে অপারগ জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের ডুবিয়ে রাখা হত। দেওয়ান সাহেবের রসবোধ ছিল। হিন্দুরা স্বর্গকে বলত বৈকুণ্ঠ, তাই এই নরককুণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছিল বৈকুণ্ঠ। সকল মুসলমান জমিদার এবং সরকারী কর্মচারী নিশ্চয়ই সততার আদর্শ ছিল না, তাদের মধ্যে অনেকেই সরকারী রাজস্ব দিতে গাফিলতি করত। কিন্তু তাদের কোনরকম শাস্তির ব্যবস্থা সলিমুল্লা উল্লেখ করেন নি।

সলিমুল্লা বলেছেন, মুর্শিদকুলি ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, কোরাণ নকল করতেন, সর্বপ্রকার বিলাস বর্জন করতেন। তিনি সারাজীবন এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। পারস্য দেশে শিক্ষালাভ এবং বসবাসের ফলে সেকালের উন্নত পারসিক সংস্কৃতি (Persian culture) তিনি অধিগত করেছিলেন। কিন্তু অর্থসংগ্রহের জন্য কাফেরের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার করতে তিনি সংকুচিত হন নি। আবার প্রশাসনিক স্বার্থের খাতিরে তিনি রাজস্ব বিভাগে স্বধর্মীদের বাদ দিয়ে কাফেরদের উচ্চ পদে নিয়োগ করতেন। সলিমুল্লা লিখেছেন, রাজস্ব সংগ্রহের কাজে তিনি বাঙালী হিন্দু ছাড়া অন্য কাকেও নিয়োগ করতেন না, কারণ শাস্তি দিয়ে খুব সহজেই তাদের অন্যায় কাজ জানা যেত এবং তাদের দুর্বলতার জন্য তাদের পক্ষে প্রতিরোধের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ('Murshid Quli Khan employed none but Bengali Hindus in the collection of the revenues, because they were most easily compelled by punishment to discover their malpractices ; and nothing was to be appre ended from their pusillanimity'.) দীর্ঘকাল মুসলমানের দাসত্ব স্বীকার করে হিন্দুরা হীনবীর্য এবং হীনচেতা হয়ে পড়েছিল। সুলতানী আমল থেকেই তারা বেতসবৃত্তি অবলম্বন করে আত্মরক্ষা করত এবং সুবিধামত জাগতিক স্বার্থ রক্ষা করত। তাদের কাছে এটাই যুগধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপরাধী মুসলমানকে শাস্তি দিলে মোল্লা-মৌলবীর অভিশাপ এবং মুসলমান সমাজে বিক্ষোভের ভয় ছিল, অপরাধী হিন্দুকে শাস্তি দিলে এমন কোন ভয় ছিল না। মুর্শিদকুলি একথা জানতেন। তিনি যে হিন্দুদের চাকুরি দিয়ে সাম্প্রদায়িক

উদারতার পরিচয় দেন নি, সেটা সলিমুল্লার উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায়।

মুর্শিদকুলির নতুন নীতি অন্য একটি কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সম্রাট প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহের মৃত্যুর (১৭১২) পর থেকে বাদশাহী দরবারে ষড়যন্ত্র এবং সংঘর্ষের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছিল। বাংলার সঙ্গে দিল্লীর শাসনসংক্রান্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সপ্তদশ শতকে যে সব মুসলমান ও হিন্দু উত্তর ভারত থেকে বাংলায় এসে রাজস্ব ও সামরিক বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করত তারা এই কার্যতঃ স্বাধীন সুবায় আসা বন্ধ করে দিল। বাঙালী হিন্দুরা সুলতানী আমল থেকেই ফার্সি ভাষা শিখে, রাজস্ব বিভাগে নীচু পদে কাজ করে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। নবাবী আমলে তারা উত্তর ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের শূন্য স্থান পূরণ করেছিল—সামরিক বিভাগে নয়, রাজস্ব বিভাগে। সামরিক বিভাগের কর্তৃত্ব নবাবেরা মুসলমানদের হাতেই রেখেছিলেন। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে এটা ছিল হিন্দুদের প্রতিভা ('talents') এবং ফার্সি ভাষায় দক্ষতার ফল।[৪] এই দুটি গুণ তাদের আগেও ছিল, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে অষ্টাদশ শতকে তারা নতুন সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করল।

মুসলমান কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে তহবিল তছরুপ করত, তাদের শাস্তি দেওয়া বা তাদের কাছ থেকে সরকারের প্রাপ্য টাকা আদায় করা কঠিন হত। এজন্য মুর্শিদকুলির নিযুক্ত ইজারাদারদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল হিন্দু। মধ্য যুগে সরকারী চাকুরিতে বংশানুক্রমিক অধিকার অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হত। ইজারাদারদের পদও ক্রমে বংশানুক্রমিক হয়ে গেল। মুসলমান আমলে বিধিবদ্ধ, সুশৃংখল ব্যবস্থা কম ছিল; অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কাজ চলত। ইজারাদারের পুত্রের ইজারাদার হওয়া আইনসঙ্গত কিনা, এরকম প্রশ্ন সেকালে ছিল অবান্তর। ইংরেজ আমলে যখন 'আইনের শাসন' (Rule of Law) প্রবর্তিত হল তখন ইজারাদারীর ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক অধিকার প্রায় পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লর্ড কর্নওয়ালিস এই ব্যবস্থাকে আইনের মুখোস পরিয়ে দিলেন। মুর্শিদকুলির আমলের ইজারাদারদের বংশধরেরা চিরকালের জন্য জমির মালিক বলে স্বীকৃত হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইজারাদারী ব্যবস্থাকে জমিদারী ব্যবস্থায় পরিণত করল (১৭৯৩)।

ইজারাদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে এক নতুন শ্রেণীর জমিদারের উদ্ভব হল। কিন্তু বাদশাহী আমলেই এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল। বর্ধমানের মহারাজার পূর্বপুরুষ ছিলেন ইজারাদার। 'জমিদার' শব্দটি মোগল আমলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হত। অনেক সময় জমিদার এবং ইজারাদারের মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম ছিল যে ব্যবহারিক জীবনে তার বিশেষ কোন অর্থ ছিল না।

৪। তদেব, ৪১০ পৃষ্ঠা।

নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হল বটে, কিন্তু সাবেক জমিদার শ্রেণী বিলুপ্ত হল না। কয়েকটি প্রাচীন জমিদার বংশ মুর্শিদকুলি খাঁর অত্যাচারে ধ্বংস হল, বড় জমিদারদের ক্ষমতা নানা রকমে খর্ব করা হল। রাজসাহীর প্রাচীন জমিদারের এলাকা ছিল ইংরেজ আমলের রাজসাহী জেলার তিন গুণ। উদয় নারায়ণের মৃত্যুর পর এই বিশাল জমিদারী ভাগ করে কয়েকজন নতুন লোককে দেওয়া হল। তবু কয়েকটি প্রাচীন জমিদার বংশ বেঁচে রইল। বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজা, বীরভূমের মুসলমান রাজা, কৃষ্ণনগরের রাজা, তাহিরপুর এবং পুটিয়ার জমিদার তাঁদের জমিদারী হারালেন না। প্রাচীন ব্যবস্থার উচ্ছেদ হল না, বরং নতুন রক্তের আমদানির ফলে তা' জোরালো হল।

নতুন জমিদারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নবাবের কর্মচারী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রঘুনন্দন রাজস্ব বিভাগে সাধারণ কর্মচারী রূপে কর্মজীবন সুরু করেন। পরে কর্মদক্ষতা এবং অবিচলিত আনুগত্যের ফলে তিনি মুর্শিদকুলির অনুগ্রহ লাভ করেন এবং রাজসাহী জেলায় নাটোরের বিশাল জমিদারীর পত্তন করেন। সীতারামের পতনের পর ভূষণা পরগণা তাঁর দখলে এসেছিল। তাঁর সুদক্ষ কর্মচারী, তিলি জাতীয় দয়ারাম রায়, রাজসাহী জেলায় দীঘাপতিয়া জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। জমিদারদের দমন কার্যে এবং রাজস্ব সংগ্রহে কৃতিত্ব দেখিয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ হালদার নামে এক কানুনগো মুর্শিদকুলির আমলে ময়মনসিংহ জেলায় এক বিরাট জমিদারীর পত্তন করেন। ঐ জেলায় মুক্তাগাছা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী প্রথম জীবনে নবাব সরকারের রাজস্ব বিভাগে কর্মচারী ছিলেন। সীতারামের পিতাও ভূষণার ফৌজদারের অধীনে রাজস্ব-সংগ্রাহক ছিলেন। অত্যধিক লোভে সীতারামের পতন হল। তিনি যদি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতেন, নবাবের অনুগ্রহের আড়ালে কাজ করতেন, তবে তিনিও স্থায়ী জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রূপে ইতিহাসে বেঁচে থাকতেন।

মুর্শিদকুলির আমলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও কৌশলী হিন্দু রাজকর্মচারীরা যেভাবে ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন, মোটামুটি সেভাবেই ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে নবকৃষ্ণ এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ জমিদারীর পত্তন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের নতুন জমিদারদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন তিলি জাতীয় কাসিমবাজারের রাজবংশ এবং দীঘাপতিয়ার জমিদার বংশ। অব্রাহ্মণ জমিদারেরা অর্থবলে এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন সামাজিক মর্যাদা লাভ করতেন।

* * *

মুর্শিদকুলির শাসন সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকার কিছু কিছু স্ববিরোধী মন্তব্য করেছেন।[৫] একবার বলেছেন, মুর্শিদকুলি কেবলমাত্র নিয়মিত এবং যুক্তি-

৫। তদেব, ৪১০, ৪১৭-১৮ পৃষ্ঠা।

যুক্ত খাজনা ('regular or legitimate amount of revenue,' 'the standard revenue') আদায় করতেন এবং বেআইনী কর ('illegal cesses or extra-revenue exactions') নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী সুবাদারদের মত একচেটিয়া বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন নি। তাঁর সঞ্চিত অর্থ পরিমাণে অপেক্ষাকৃত কম ছিল, এবং তিনি প্রশাসনে ব্যয়সংকোচ করে এবং ব্যক্তিগত বিলাসিতা বর্জন করে এই অর্থ বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর শাসনকালে দেশে শান্তি ছিল, প্রজাদের খাজনা দেবার ক্ষমতা বেড়েছিল। তাই তাঁর শাসনকালের শেষ দশ বৎসরে তাঁর আয় বেড়েছিল, কর বৃদ্ধির ফলে নয়।

অন্যত্র আচার্য যদুনাথ বলেছেন, ১৬৩২ সালে টাকায় চার থেকে পাঁচ মন চাউল পাওয়া যেত, নব্বই বৎসর পরে—মুর্শিদকুলির আমলে—চার মন চাউলের দাম ছিল এক টাকা। তার অর্থ এই যে সাধারণ মানুষের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পায় নি—যদিও আবাদী জমির পরিমাণ বেড়েছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। ('This fact proves that the circulating medium had not increased in a century's time, in spite of the growth of production and trade. The common people had no economic staying power, no capital, because they could not accumulate any true money or sliver coins as savings though the area under tillage had increased.') ভূমি-রাজস্ব থেকে নবাবের আয় বাড়ানো হয়েছিল কৃষকদের নিষ্করুণ ভাবে শোষণ করে এবং ইজারাদারদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে ('by the heartless squeezing of the peasantry and inhuman torture of the contractor collectors')। ইজারাদারদের উপর যখন টাকার জন্য চাপ দেওয়া হত তখন তারা প্রজাদের শোষণ করত, ফলে কোন রকমে বেঁচে থাকার মত সম্বল ('bare means of subsistence') ছাড়া তাদের হাতে কিছুই থাকত না। মুর্শিদকুলি যখন তাঁর কোষাগারে প্রচুর অর্থ মজুত করছিলেন তখন সাধারণ মানুষ পশুর মত অসহায় ভাবে মারা যাচ্ছিল ('died like human sheep')। মুর্শিদকুলির পরবর্তী নবাবেরাও এভাবে কোষাগার পূর্ণ করেছিলেন। এই সঞ্চিত অর্থ—সোনা, মণিমুক্তা—পলাশীর পরে ইংরেজরা লুটে নিয়েছিল। ('The whole of this surplus national stock for sixty years was whisked away to Britain in the days of Mir Jafar and Mir Kasim.') মুর্শিদকুলি এবং তাঁর পরবর্তী নবাবেরা দিল্লীতে নামসর্বস্ব বাদশাহদের বিলাসের জন্য যে বার্ষিক কর পাঠাতেন সেটাও বাংলার কৃষকের রক্ত শোষণ করেই সংগৃহীত হত এবং এই আর্থিক আনুগত্যের প্রতিদানে বাংলার কিছুই পাওনা ছিল না।

২। সুজাউদ্দীন মোহাম্মদ খাঁ

মুর্শিদকুলি খাঁ জন্মসূত্রে ভারতীয় হলেও তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছিল পারস্যে, মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন পারস্যের সন্তান। পাদশাহী প্রভুত্বের প্রতিভূ রূপে তিনি বাংলায় এসেছিলেন, বাংলার মানুষের সঙ্গে তাঁর কোন আত্মিক সংযোগ ছিল না। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর নবাব হলেন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন (১৭২২-৩৯)। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে এই ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন। ইতিপূর্বে কোন সুবার শাসন-কর্তৃত্বে বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অযোধ্যার প্রথম নবাব সাদাত খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা নবাব হয়েছিলেন ১৭৩৯ সালে। হায়দারাবাদে প্রথম স্বাধীন শাসক নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির জঙ্গ তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন ১৭৪৮ সালে।

সুজাউদ্দীন তাঁর শাসনকালে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৩৮ (অন্য মতে, ১১, ৩১,৪০,৩৩৮) টাকা দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এর প্রতিদানে বাংলা কিছুই পায় নি। তবে মোহাম্মদ শাহ তাঁকে পুরস্কার দিয়েছিলেন বিহারের সুবাদারী (১৭৩৩)। মুর্শিদকুলি খাঁ মৃত্যুকালে বাংলা এবং উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও বিহারের সুবাদার বা সহকারী সুবাদার ছিলেন না। তিনি কিছুকাল বিহারের দেওয়ান ছিলেন, কিন্তু এই সম্বন্ধ ১৭০৬ সালে ছিন্ন হয়েছিল। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রশাসনিক ঐক্য স্থাপিত হল সুজাউদ্দীনের আমলে। এই ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন হয়েছিল আলিবর্দির শাসনকালে।

সুজাউদ্দীন জাতিতে ছিলেন তুর্কী। তাঁর পিতা দাক্ষিণাত্যে মোগল সরকারের কর্মচারী ছিলেন। সেইখানেই মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে সুজাউদ্দীনের পরিচয় হয়েছিল। মুর্শিদকুলি তাঁকে কন্যা দান করলেন এবং সঙ্গে করে বাংলায় নিয়ে এলেন। ১৭২৪ সাল পর্যন্ত সুজাউদ্দীন তাঁর প্রতিনিধি (সহকারী সুবাদার) রূপে উড়িষ্যা শাসন করেন। ১৭২৭ সালে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসে তিনি ক্রমান্বয়ে দুজন সহকারী সুবাদারের উপর উড়িষ্যার ভার দিয়েছিলেন। বিহারে তাঁর প্রতিনিধি রূপে সহকারী সুবাদার ছিলেন আলিবর্দি খাঁ (১৭৩৩-৩৯)।

সুজাউদ্দীনের অনেক গুণ ছিল। তিনি দানশীল, ধর্মভীরু এবং ন্যায়-বিচারক ছিলেন। কিন্তু ভোগবিলাসে আসক্তি এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তাঁকে অলস এবং রাজকার্য সম্বন্ধে উদাসীন করে রেখেছিল। ফলে তিনি ক্রমশঃ তিন জন পরামর্শদাতার হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন হিন্দু—রাজস্ব বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আলম চাঁদ এবং মহৈশ্বর্যশালী জগৎ-শেঠ ফতে চাঁদ। বাকি একজন ছিলেন মুসলমান—হাজী আহম্মদ; তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁর ভাই, বিহারের সহকারী সুবাদার আলিবর্দি খাঁ (আদি নাম মির্জা বন্দে অথবা মির্জা মোহাম্মদ আলি)।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন হীরানন্দ শাহ রাজস্থানের অন্তর্গত নাগর থেকে সপ্তদশ শতকের শেষে পাটনায় এসে টাকা লেন-দেনের গদি খুলেছিলেন। ক্রমে তাঁর ব্যবসার প্রসার হল; তিনি দিল্লী, আগ্রা, ঢাকা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে গদি স্থাপন করলেন। তাঁর পুত্র মানিক চাঁদের পরিচালনায় ঢাকার গদির খুব উন্নতি হল। ঢাকায় থাকার সময় দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর সাধুতা ও কর্মদক্ষতায় প্রীত হয়েছিলেন, তাই তিনি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আসার সময় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ক্রমে তাঁর ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল। মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল স্থাপিত হলে মানিক চাঁদকে তার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হল। তিনি কেবল টাকার কারবার না করে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। মুর্শিদকুলি খাঁকে সুবাদার নিযুক্ত করার জন্য তিনি দিল্লীতে তদ্বির করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর ভাগিনেয় ও দত্তক পুত্র ফতে চাঁদ। সরকারী টাঁকশাল তুলে দিয়ে তাঁর উপর মুদ্রা তৈরীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল। মোহাম্মদ শাহ তাঁকে 'জগৎশেঠ' উপাধি দিলেন। এই উপাধি বংশানুক্রমিক অধিকারে পরিণত হল। নবাবের রাজস্ব-ব্যবস্থায় ও মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণে এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে জগৎশেঠ পরিবারের প্রভূত প্রভাব ছিল।

অন্যান্য অনেক বিদেশী ভাগ্যান্বেষীর মত মির্জা আহম্মদ এবং মির্জা মোহাম্মদ আলির পিতামহ আওরঙ্গজেবের সময়ে মনসবদার শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি জাতিতে ছিলেন আরব। তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেবের এবং তাঁর পুত্র আজম শাহের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জাতিতে ছিলেন তুর্কী। এই মহিলার সঙ্গে সুজাউদ্দীনের আত্মীয়তা ছিল। তাঁর দুই পুত্র মির্জা আহম্মদ এবং মির্জা মোহাম্মদ আলি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে আজম শাহের অধীনে চাকুরি আরম্ভ করলেন। ১৭০৭ সালে প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহের সঙ্গে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধে আজম শাহের পরাজয় ও মৃত্যু হল। এই বিপর্যয়ের পর মির্জা আহম্মদ এবং মির্জা মোহাম্মদের আর বাদশাহী দরবারে স্থানলাভের আশা ছিল না। মির্জা আহম্মদ গেলেন মক্কায়। মির্জা মোহাম্মদ আলি আত্মীয়তার সূত্র ধরে চলে এলেন কটকে—উড়িষ্যার তৎকালীন শাসক সুজাউদ্দীনের দরবারে (১৭২০)। প্রশাসনে এবং সামরিক ব্যাপারে দক্ষতা দেখিয়ে তিনি সুজাউদ্দীনের অনুগ্রহ লাভ করলেন। মক্কা থেকে মির্জা আহম্মদ ফিরে এলেন 'হাজী' হয়ে। তিনিও কটকে এসে সুজাউদ্দীনের অধীনে চাকুরিতে নিযুক্ত হলেন। কর্মদক্ষতা ও কুটকৌশল মির্জা মোহাম্মদ আলির উন্নতির পথ প্রসারিত করল। নবাবী লাভের পরে ১৭২৮ সালে সুজাউদ্দীন তাঁকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করলেন এবং 'আলিবর্দি খাঁ' উপাধি দিলেন। ১৭৩৩ সালে তিনি হলেন বিহারের সহকারী সুবাদার। দিল্লী দরবার থেকে তাঁর জন্য 'মহাবৎ জঙ্গ' উপাধি আনা হল এবং তিনি পাঁচ-হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হলেন। হাজী আহম্মদ নবাবের পরামর্শদাতা

রূপে রইলেন মুর্শিদাবাদে। তাঁর তিন পুত্রকে উচ্চ পদে নিয়োগ করা হল। নওয়াজীশ মোহাম্মদ হলেন 'বক্সী' (সৈন্যদের বেতন দেবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) এবং মুর্শিদাবাদে শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষ। সৈদ আহম্মদ খাঁ হলেন রংপুরের ফৌজদার। আলিবর্দি বিহারের সহকারী সুবাদার হলে জৈনুদ্দীন আহম্মদ খাঁ রাজমহলের ফৌজদারের শূন্য পদ গ্রহণ করলেন। এই তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে অপুত্রক আলিবর্দি তাঁর তিন মেয়ের বিয়ে দিলেন।

একটি পরিবারের হাতে প্রচুর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল। সুজাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁ ছিলেন দেওয়ান, কিন্তু দেওয়ানীর কাজকর্ম দেখতেন আলম চাঁদ। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ তকি খাঁ ছিলেন উড়িষ্যার শাসনকর্তা। তাঁর মৃত্যুর (১৭৩৪) পর সেই পদে নিযুক্ত হলেন সুজাউদ্দীনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খাঁ—যিনি এতদিন ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা। হাজী আহম্মদ এবং আলিবর্দি নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সরফরাজ খাঁ এবং মোহাম্মদ তকি খাঁর মধ্যে কলহের ইন্ধন জোগাতেন।

আলিবর্দির উন্নতির মূলে ছিল তাঁর কর্মদক্ষতা। প্রথমে উড়িষ্যায়, পরে রাজমহলে, সর্বশেষে বিহারে তিনি তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সুজাউদ্দীনের উপর হাজী আহম্মদের যে প্রভাব ছিল তার মূলে ছিল নবাবের ভোগলালসা নিবৃত্তির ইন্ধন জোগানো। 'স্ত্রীলোক জোগানদার' বলে তাঁর অখ্যাতি ছিল।[৬]

সুজাউদ্দীনের আমলে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য বিশাল বাংলা সুবাকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল: (১) বাংলার পশ্চিম ও মধ্য অংশ এবং উত্তর বাংলার কিছু অংশ। এই অঞ্চল নবাবের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে ছিল। (২) পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা, উত্তর বাংলার একটি অংশ, শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রাম। এই অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র ছিল ঢাকা। নবাবের কর্তৃত্বাধীনে এক শাসনকর্তা এই অঞ্চল শাসন করতেন। (৩) বিহার। (৪) উড়িষ্যা। এই দুই অঞ্চলে নবাবের কর্তৃত্বাধীনে দু'জন শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁরা অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেতেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় সুজাউদ্দীন কোন মৌলিক পরিবর্তন প্রবর্তন করেন নি। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল যে মুর্শিদকুলির নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেওয়া প্রজাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল না এবং তাঁর সুশাসনে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। তাই তিনি প্রজাদের উপর আবওয়াব চাপিয়ে সরকারী তহবিলে বেশি টাকা আমদানির ব্যবস্থা করেছিলেন। আবওয়াব আদায়ের ব্যবস্থার

৬। দ্রষ্টব্য: কালীকিঙ্কর দত্ত, *Alivardi and His Times*, ৫-৬ পৃষ্ঠা।

প্রচলন করেছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। ভোগবিলাসে এবং অট্টালিকা নির্মাণে সুজাউদ্দীন প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। তাই তাঁর পক্ষে আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা আবশ্যক ছিল। বর্ধিত আয়ের কোন অংশ যে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অথবা কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হত এমন কোন প্রমাণ নেই। সিংহাসনে আরোহণের সময় সুজাউদ্দীন নগদ টাকায় এবং মণিমাণিক্যে এক কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। এটা মুর্শিদকুলি খাঁর সঞ্চয়। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুকালে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল আরো বেশি। কৃষকদের মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে রাজকোষ সমৃদ্ধ হয়েছিল।

সুজাউদ্দীন কর্তৃক প্রবর্তিত আবওয়াবগুলি ('আবওয়াব সুজা খানী') চার ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ ('নজরানা মোকররী') আদায় হত জমিদারদের কাছ থেকে। দ্বিতীয় ভাগ ('জর মাথোট') আদায় হত খালসা মহালে নির্ধারিত খাজনার সঙ্গে শতকরা ১½ টাকা হারে। তৃতীয় ভাগ ('মাথোট ফিলখানা') আদায় হত নবাব ও দেওয়ানের হাতীর খরচ নির্বাহের জন্য। চতুর্থ ভাগ ('ফৌজদারী আবওয়াব') আদায় হত প্রধানতঃ সীমান্ত অঞ্চল থেকে। মোট নয়টি ফৌজদারী এলাকা ছিল। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকম 'ফৌজদারী আবওয়াব' আদায় করা হত। আবওয়াবের মোট পরিমাণ ছিল ১৯,১৪,০৯৫ টাকা।

জমিদারদের সঙ্গে সুজাউদ্দীন সদয় ব্যবহার করতেন। মুর্শিদকুলি খাঁ যে সব জমিদারকে আটক রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন—যাঁরা কোনরকম অপরাধে অপরাধী ছিলেন না। যাঁরা জগৎশেঠের মাধ্যমে রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁরাও মুক্তি পেয়েছিলেন। (অর্থাভাবে কোন জমিদার নবাবের রাজস্ব দিতে অক্ষম হলে জগৎশেঠ তাঁকে টাকা ধার দিতেন।)। সাধারণতঃ তিনি জমিদারদের মাধ্যমে খাজনা আদায় করতেন। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে তাঁর আমলে জমিদারী ব্যবস্থার ভিত্তি পাকা হল। বিদ্রোহী জমিদারের রেহাই ছিল না। বীরভূমের মুসলমান জমিদার বিদ্রোহী হলে (১৭৩৯) তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হল। তিনি বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং পূর্বনির্দিষ্ট রাজস্বের সঙ্গে অতিরিক্ত তিন লাখ টাকা প্রতি বৎসর দিতে স্বীকৃত হয়ে জমিদারী ফিরে পেলেন। স্থানীয় শাসনকর্তারা সময় সময় জমিদারদের উপর উৎপীড়ন করতেন। বর্তমান বাংলা দেশের ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের মুসলমান জমিদারকে হত্যা করে ঢাকার শাসনকর্তার প্রধান সহকারী মীর হাবিব তাঁর ধনরত্ন আত্মসাৎ করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা সুজাউদ্দীনের সুশাসনের প্রশংসা করেছেন। ১৭৮৯ সালে তাঁদের কথার প্রতিধ্বনি করেন কোম্পানীর সুদক্ষ কর্মচারী জন শোর (পরবর্তী কালে গভর্নর-জেনারেল Sir John Shore)। কিন্তু তিনিই আবার মন্তব্য করেছেন : রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি এমন ছিল যে

তাতে রায়ত ও জমিদার উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হত ('mode of imposition was fundamentally ruinous, both to the ryots and the zamindars; and the direct tendency of it was to force the latter into extortions, and all into fraud, concealment and distress.'

সুজাউদ্দীনের আমলে জৈন কবি নিহাল বাংলায় বাস করে 'বংগালদেশকী গজল' নামে যে কবিতা লিখেছিলেন[৭] তাতে সুজাউদ্দীনের শাসনের প্রশংসা আছে।

ইহবিধ রহৈ রেয়ত সুখী
দেখা কোউ নাহি দুখী।

এই গতানুগতিক উক্তিকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যায় না। বাংলার সর্বত্র 'রেয়ত সুখী' ছিল, 'দুখী' কেউ ছিল না—এটা কল্পিত রামরাজ্যের ছবি। নিহালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভবতঃ গঙ্গাতীরবর্তী সমৃদ্ধ অঞ্চলে—রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে—সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি দেবমন্দির, মসজিদ ও মিনার এবং কারুকার্যভূষিত প্রাসাদের উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখেছেন নানা মতের বহু যতী, যোগী ও ভক্ত। কাঁসারি এবং তাঁতিদের উৎপাদন-দক্ষতা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কাসিমবাজার, সয়দাবাদ ও খাগড়া ছিল জনবহুল এলাকা। সেখানে বহু টুপিওয়ালা বিদেশীর বাস—গুজরাটী, আরব, আর্মানী, হাবসী, সীদী, পাঠান, মোগল, 'হুরমজী' (অহুর মজদার উপাসক—পার্শী), ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান। বিদেশী কুঠিয়াল কোম্পানীর লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার কারবার চলত। অনেক মহলযুক্ত বাগান বাড়ীতে কোম্পানী নানা বন্দরের মাল আমদানি-রপ্তানি করছিল। বেশি চলত রেশমের কারবার।

এই বিদেশী বণিকের সমারোহ পরবর্তী কালের কলকাতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঙালী কৃষক ও শ্রমিক হাড়ভাঙা পরিশ্রম করত শুধু মজুরির জন্য, লাভের কড়ি চলে যেত বিদেশীর হাতে। ধর্মনিষ্ঠ মুর্শিদকুলি খাঁ অথবা কামতাড়িত সুজাউদ্দীনের এদিকে দৃষ্টি ছিল না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কৃষক ও শ্রমিকের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব টাকা আদায় করা। এ ব্যাপারে তাঁদের সহযোগী ছিলেন জমিদারেরা। ক্ষুৎপীড়িত কৃষক ও শ্রমিক চেষ্টা করত তাদের সামান্য আয়ের সঠিক পরিমাণ গোপন রাখতে। শোর একে বলেছেন, জুয়াচুরি এবং গোপনতা ('fraud and concealment')। কিন্তু অর্থলোভী সরকারী কর্মচারী এবং জমিদারী নায়েব-তহশিলদারের শ্যেন দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার কি সত্যি আর কোন উপায় ছিল?

৭। সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড; অপরার্ধ, ৩৪৯-৫১ পৃষ্ঠা।

৩ আলিবর্দি খাঁ

মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলায় এসেছিলেন মোগল বাদশাহের কর্মচারী রূপে, কিন্তু সুজাউদ্দীন নবাবী লাভ করলেন উত্তরাধিকার সূত্রে—যখন বাদশাহী সাম্রাজ্যে ভাঙন সুরু হয়েছে। তিনি ছিলেন বিদেশী, তাঁর আমলে যাঁরা বাংলার শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করতেন তাঁরাও বিদেশী। তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ উত্তরাধিকার সূত্রে নবাবী লাভ করলেন; কিন্তু এক বৎসর (মার্চ ১৭৩৯—এপ্রিল ১৭৪০) পরেই তাঁর নবাবী গেল, প্রাণও গেল। উত্তরাধিকার প্রথা বাতিল করে বাহুবলে মসনদ অধিকার করলেন এক বিদেশী—যিনি মাত্র বিশ বৎসর আগে বাংলায় এসেছিলেন দিল্লীতে আশ্রয় না পেয়ে এবং রুটির সন্ধানে কটকে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলা তখন ছিল বিদেশী মুসলমান ভাগ্যান্বেষীদের শিকারের ক্ষেত্র, যেমন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা ছিল বিদেশী ইউ-রোপীয় বণিকের লুণ্ঠনের ক্ষেত্র। ঐশ্বর্যশালী জমিদারেরা অর্থসঞ্চয়ের নোংরা খেলায় মত্ত ছিলেন, বাংলার শোষিত মানুষ নির্বিবাদে ক্রমবর্ধমান হারে খাজনা দিয়ে যাচ্ছিল। এই নীতিহীন, অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ নিয়েছিল ইংরেজ বণিক। যে দেশে ধর্ম মানুষকে তৃণাদপি সুনীচ এবং তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হতে শিক্ষা দেয়, অথবা পঞ্চমকার মাধ্যমে সাধনার উত্তেজনা সঞ্চার করে, সে দেশের পক্ষে এ রকম শোচনীয় অবস্থা অস্বাভাবিক নয়। দীর্ঘকাল রাজদণ্ড পরি-চালনা করে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটেছিল। শক্তিমান বিদেশীর আক্রমণ ঠেকাবার মত মানসিক ও সামরিক বল তারা হারিয়েছিল।

সরফরাজ খাঁ পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন অপরিমিত ইন্দ্রিয়াসক্তি; রাজ্য শাসনের জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন হয় তার কোনটিই তাঁর চরিত্রে ছিল না। তাঁর রাজ্যলাভের পর হাজী আহম্মদ, আলিবর্দি, আলম চাঁদ এবং ফতে চাঁদ জগৎশেঠের প্রতিপত্তি বজায় রইল। সুজাউদ্দীন যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিলেন মূর্খ তরুণ নবাব তার মূল উৎপাটন না করে নিজের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করলেন।

বাংলার মসনদ অধিকার করতে পাটনায় প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন আলিবর্দি। হাজী আহম্মদ তাঁকে প্ররোচনা দিলেন এবং মুর্শিদাবাদে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। আলম চাঁদ এবং ফতে চাঁদ তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। একজন প্রবীণ ঐতিহাসিক বলেছেন, সরফরাজ এই দুজনের কোন ক্ষতি করেন নি ('had not wronged them in any way')।[৮] কিন্তু নিখিলনাথ রায় তাঁর 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে' লিখেছেন: 'নবাব শিবিকা পাঠাইয়া জগৎশেঠের গৃহলক্ষ্মীকে নিজ ভবনে আনয়ন করেন এবং প্রাণ ভরিয়া

৮। কালীকিংকর দত্ত, *Alivardi and His Times*, ১৪ পৃষ্ঠা।

সেই পুণ্যের অখণ্ড ফলের ন্যায় তাঁহার রূপসুধা পান করিয়া তাঁহাকে গৃহে যাইতে অনুমতি দেন।'[৯]

হাজী আহম্মদ এবং আলিবর্দি কিছুদিন মিথ্যা আশ্বাসে সরফরাজকে ভুলিয়ে রাখলেন। যখন তাঁর চৈতন্যোদয় হল তখন আর সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার সুযোগ ছিল না। আলিবর্দি পাটনা থেকে সসৈন্যে বাংলায় প্রবেশ করলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায়, ভাগীরথীর পূর্ব তীরে, জঙ্গীপুরের মাইল পাঁচেক উত্তর-পশ্চিমে, গিরিয়া নামক স্থানে যুদ্ধ হল (১০ এপ্রিল ১৭৪০)। উভয় পক্ষেই আনুমানিক ৩০,০০০ সৈন্য ছিল। বিলাসী নবাব রণক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করলেন। আলিবর্দি মুর্শিদাবাদে গিয়ে সিংহাসনে বসলেন। মৃতপ্রায় মোগল সাম্রাজ্যের পুতুল বাদশাহ মোহাম্মদ শাহ অর্থের বিনিময়ে তাঁকে বাংলার সুবাদার রূপে স্বীকৃতি দিলেন। সম্রাটকে দেওয়া হল নগদ ৪০ লক্ষ টাকা এবং ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের মণিমাণিক্য ও তৈজসপত্র। সঙ্গে দেওয়া হল বাংলার রাজস্ব বাবদ এক কোটি টাকা। বাদশাহী দরবারের কয়েকজন আমলাও যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ এবং সুজাউদ্দীনের সঞ্চিত অর্থের স্রোত দিল্লীতে প্রবাহিত হল। প্রমাণিত হল যে পাদশাহীর সুবিস্তৃত ছায়া তখনও বাংলা থেকে অপসারিত হয় নি।

এই ঘটনাকে একজন ঐতিহাসিক 'বাংলায় ১৭৩৯-৪০ সালের বিপ্লব' (Bengal Revolution of 1739-40) আখ্যা দিয়েছেন।[১০] বাহুবলে সেনাপতি বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা যখন সিংহাসন অধিকার করেন, যখন শাসন-ব্যবস্থায় অথবা অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটে না, তখন তাকে 'বিপ্লব' বলা যায় না। বখতিয়ার খলজীর আক্রমণে—এমন কি, মোগলের বাংলা বিজয়ের ফলে—বাংলায় যে পরিবর্তন ঘটেছিল, আলিবর্দির সিংহাসন দখলের ফলে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছুই ঘটে নি। নবাব বদল আর 'বিপ্লব' এক নয়।

সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে নবাবী মসনদ দখল করার অপরাধে মীরজাফর ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। আলিবর্দি একই অপরাধে অপরাধী। যে সুজাউদ্দীন তাঁর চরম দুর্দিনে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ দিয়েছিলেন, তাঁর পুত্রকে তিনি হত্যা করেছিলেন। হাজী আহম্মদ সরফরাজের হারেম অধিকার করে ১৫০০ স্ত্রীলোকের মালিকানা হস্তগত করেছিলেন। সমসাময়িক কালের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা আলিবর্দির এই ঘৃণ্য অপরাধ মার্জনা করেন নি। অবশ্য তাঁরা আলিবর্দির মৃত্যুর পরে বই লিখেছিলেন—যখন সত্য কথা বলার অপরাধে শাস্তির ভয় ছিল না। আলিবর্দির দৃষ্টান্ত

৯। উদ্ধৃত: সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, 'বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা', ১৮৯ পৃষ্ঠা।
১০। কালীকিঙ্কর দত্ত, *Alivardi and His Times*, ৩৫ পৃষ্ঠা।

অনুসরণ করে তাঁর নয়নের মণি সিরাজউদ্দৌলা একবার বিহারের স্বাধীন শাসন-কর্তৃত্ব লাভের জন্যে বিদ্রোহী হয়েছিলেন (১৭৫০)।

আলিবর্দির সঙ্গে মীর জাফরের তুলনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে এই কারণে যে ১৭৩৯-৪০ সালের 'বিপ্লবের' সঙ্গে কোন বিদেশী শক্তি জড়িত ছিল না। কিন্তু ১৭৫৭ সালে যারা ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক নবাবকে সরিয়ে অন্য নবাবকে মসনদে স্থাপন করা। এই পরিবর্তনের ফলে যে বাংলা ইংরেজ কোম্পানীর হাতে চলে যাবে, এমন সম্ভাবনার কথা তাদের চিন্তা করার কোন কারণ ঘটে নি। ইংরেজরা তখন ভারতের কোন অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করে নি, বাংলার শাসন-কর্তৃত্ব অধিকারের পরিকল্পনা নিয়ে তারা ষড়যন্ত্রকারী-দের সাহায্য করে নি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের বাংলা থেকে সরিয়ে দেওয়া। বাংলার দেওয়ানী গ্রহণের কল্পনা ক্লাইভের মাথায় ঢুকেছিল ১৭৫৯ সালে।

* * *

মুর্শিদকুলি খাঁ এবং সুজাউদ্দীনের শাসনকালে বাংলায় শান্তি ছিল, কিন্তু আলিবর্দির আমলে বারবার যুদ্ধের ফলে বাংলায় অশান্তি ঘটেছিল। প্রথমতঃ, গিরিয়ার যুদ্ধ (১৭৪০); মসনদ অধিকারের জন্য এ রকম যুদ্ধ জাহাঙ্গীরের সময় থেকে বাংলায় আর ঘটে নি। দ্বিতীয়তঃ, সুজাউদ্দীনের জামাতা রুস্তম জঙ্গকে উড়িষ্যা থেকে উৎখাত করার জন্য আলিবর্দিকে দুবার যুদ্ধ করতে হয়েছিল (১৭৪১)। তৃতীয়তঃ, ১৭৪২ সাল থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত মারাঠা আক্রমণ পশ্চিম বাংলার এক বড় অংশ বিধ্বস্ত করেছিল। চতুর্থতঃ, ১৭৪৫ সাল থেকে ১৭৪৮ সাল পর্যন্ত বিহার আফগানদের বিদ্রোহে উপদ্রুত হয়েছিল। ১৭৫১ সালে উড়িষ্যার অধিকার ত্যাগ করে আলিবর্দি মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। তাঁর রাজত্বের শেষ পাঁচ বৎসর (১৭৫১-৫৬) বাংলায় শান্তি ছিল। জন শোরের মতে, এই সময়েই বাংলার প্রশাসন দেশের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হয়েছিল—যেমন হয়েছিল সুজাউদ্দীনের আমলে।

আলিবর্দি নিজে অভিজ্ঞ প্রশাসক এবং নিপুণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি সুজাউদ্দীনের মত অলস ও ভোগবিলাসে আসক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর দুই জামাতাকে ঢাকা ও বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। সামরিক বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছিলেন বিশ্বস্ত মুসলমান কর্মচারীদের উপরে। কিন্তু ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের মতে, তাঁর সৈন্যদলে কয়েকজন উচ্চপদস্থ হিন্দু সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে সাতহাজারী মনসব দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি কয়েকজন সুদক্ষ হিন্দু কর্মচারীর উপর অনেকটা নির্ভর করতেন। ঐতিহাসিক অর্মে (Orme) বলেছেন যে আলি-বর্দির শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দু কর্মচারীদের প্রভাব ছিল, কিন্তু সামরিক ব্যাপারে তাঁরা কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতেন না। জানকীরাম, দুর্লভরাম,

দর্পনারায়ণ, রামনারায়ণ, কিরাট চাঁদ, উমেদ রায়, বীরু দত্ত, রামরাম সিংহ এবং গোকুল চাঁদ উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। জগৎশেঠ বংশের প্রভাব ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। ফতে চাঁদের মৃত্যুর (১৭৪৪) পর তাঁর পৌত্র মহতাব চাঁদ 'জগৎশেঠ' হন এবং খুল্লতাতপুত্র স্বরূপ চাঁদের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করেন। পাঞ্জাবী বণিক আমীরচাঁদের (Omichand) সঙ্গে আলিবর্দির সদ্ভাব ছিল। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য আলিবর্দির পক্ষে বিত্তশালী হিন্দু বণিকদের সহযোগিতা আবশ্যক ছিল।[১১]

কয়েকজন হিন্দুকে বড় চাকুরি দেওয়া নতুন রীতি নয়। এটা সুলতানী আমল থেকেই চলে আসছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ হিন্দুদের ইজারাদারী দিতেন। রঘুনন্দন ছিলেন তাঁর অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী। সুজাউদ্দীনের সময়ে আলম চাঁদ ছিলেন প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী। গিরিয়ায় সরফরাজের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি আহত হন এবং অল্পকাল পরে এই আঘাতের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। আলিবর্দির হিন্দু কর্মচারীরা কখনও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন নি।

কয়েকজন অনুগ্রহভোগী হিন্দু কর্মচারীর আনুগত্য লাভ এক কথা, সমগ্র হিন্দু সমাজের শুভেচ্ছা অর্জন আর এক কথা। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এবং গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণে' আলিবর্দির আমলে হিন্দুদের অসন্তোষের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭৫৪ সালে ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান ইঞ্জিনীয়ার স্কট তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, হিন্দু রাজারা এবং জনসাধারণ মুসলমান-শাসনে অসন্তুষ্ট এবং এই শাসনের অবসান চায়।[১২] 'সিয়ার-উল-মুতাখ্খরীন' বইতে গোলাম হোসেন কয়েকজন পণ্ডিত, কবি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির নাম দিয়েছেন—যাঁরা আলিবর্দির অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই মুসলমান, হিন্দু একজনও নেই।

* * *

আলিবর্দির বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধূমায়িত অসন্তোষ সম্বন্ধে ইংরেজ

১১। "...the Gentoo connection became the most opulent influence in the government of which it pervaded every department with such efficacy, that nothing of moment could move without their participation or knowledge, nor did they ever deceive their benefactor but co-operated to strengthen his administration and to relieve his wants; and it is said that the Seats (Jagat Seths) alone gave him in one present the enormous sum of three millions of rupees as a contribution to support the expences of the Maratha war". (Orme).

১২। "The Gentue (Hindu) rajahs and inhabitants were very much disaffected to the Moor (Muslim) Government and secretly wished for a change and opportunity of throwing off their yoke." (S.C. Hill, *Bengal in 1756-57*, তৃতীয় খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা)।

ইঙ্গিনীয়ার যে মন্তব্য করেছেন তার কারণ পাওয়া যাবে তাঁর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায়। দিল্লীর বাদশাহী দরবারের দাবি মেটাতে গিয়ে তিনি সুজাউদ্দীনের সঞ্চিত বিপুল অর্থ প্রায় নিঃশেষ করেছিলেন। তার পরবর্তী দশ বৎসরে উড়িষ্যায় রুস্তম জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধে এবং বিহারে আফগানদের বিদ্রোহ দমনে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। 'বর্গীর হাঙ্গামা'য় উপদ্রুত অঞ্চলে হিসাবমত খাজনা আদায় হত না। মারাঠাদের বিরুদ্ধে বাদশাহের সহায়তা লাভের জন্য আলিবর্দি তাঁকে বার্ষিক ৫২ লক্ষ টাকা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উড়িষ্যা হাতছাড়া হবার ফলে মোট ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ কমে গেল। শুধু তাই নয়; ১৭৫১ সালের সন্ধি অনুসারে বাংলার চৌথ বাবদ মারাঠা রাজাকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দেবার ব্যবস্থা হল।

আর্থিক সংকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য আলিবর্দি নানা ভাবে অর্থ সংগ্রহ করতেন। বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে 'সাময়িক সাহায্য' ('casual aids') আদায় করা হত। বিত্তশালী জমিদারদের নিয়মিত রাজস্বের বাইরে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হত। কিন্তু এভাবে সরকারী আয়ের স্থায়ী বৃদ্ধি হত না। আলিবর্দি দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। প্রথমতঃ, 'চৌথ মারাঠা' নামে এক নতুন কর স্থাপন করা হল। তার পরিমাণ ছিল ১৫,৩১,৮১৭ টাকা। এটা এক রকমের আবওয়াব। দ্বিতীয়তঃ, আরো দুটি আবওয়াব আদায়ের ব্যবস্থা করা হল। আলিবর্দির শাসনকালে মোট ২২,২৫,৫৫৪ টাকা আবওয়াব হিসাবে আদায় করা হয়েছিল। ১৭২২ সাল থেকে ১৭৫৫ সাল পর্যন্ত, সুজাউদ্দীন এবং আলিবর্দির শাসনকালে, আদায়ীকৃত মোট আবওয়াবের পরিমাণ ছিল ৪১,৩৯,৬৪৯ টাকা। কৃষকেরা এই ভার বহন করতে পারবে কিনা সেটা ভেবে দেখা হত না।

সুজাউদ্দীনের আমলের ব্যবস্থা অনুসারে আলিবর্দি জমিদারদের মাধ্যমে ভূমি-রাজস্ব আদায় করতেন। সাধারণতঃ তাঁদের দেয় রাজস্বের ('মালগুজারি') পরিমাণ অত্যধিক হত না। জন শোরের মতে, এটা সেকালের জমিদারদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণ; তা'ছাড়া তাঁদের জমিদারীর প্রশাসনিক দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল, ব্যবস্থাপনা ভাল ছিল। তাঁদের ঐশ্বর্যের কথা মনে রেখেই আলিবর্দি মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করতেন। প্রজাদের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন ছিলেন না। প্রজারা কোন কারণে বিপন্ন হলে তাঁরা খাজনা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করতেন না, নিজেদের তহবিল থেকে নবাব সরকারে রাজস্ব দিতেন—দরকার হলে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করতেন। এভাবে মহাজনেরা জমিতে টাকা লগ্নী করার সুযোগ পেত।

বাংলার বড় বড় জমিদারদের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের জন্য আলিবর্দি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। সেকালের বিশাল রাজসাহী জমিদারী পশ্চিমে রাজমহল থেকে পূর্বে বগুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, মালদহ, যশোহর ও নদীয়া জেলার বিভিন্ন অংশ এই

জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। জমিদার রাজা রামকান্ত (রাণী ভবানীর স্বামী) রাজস্ব বাকি রেখেছিলেন। আলিবর্দি তাঁর জমিদারী স্বত্ব খারিজ করে তাঁর আত্মীয় দেবীপ্রসাদ রায়কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। বহু আবেদন-নিবেদন করে, রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, জগৎশেঠের সহায়তায় রামকান্ত জমিদারী ফিরে পেয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকে দেখা যায় যে জমিদারের পদ সাধারণ ভাবে বংশানুগত হলেও গুরুতর গাফিলতির জন্য নবাব তা' কেড়ে নিতে পারতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলেও নির্দিষ্ট দিনে কোম্পানীর রাজস্ব পরিশোধ না করলে জমিদারী নীলাম করা হত। রামকান্তের আত্মীয়কে জমিদারী দিয়ে আলিবর্দি পরোক্ষভাবে বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকার করেছিলেন।

নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে ১২ লক্ষ টাকা নজরানা দাবি করা হয়েছিল এবং টাকা আদায় না হওয়াতে তাঁকে নজরবন্দী করা হয়েছিল। এই ঘটনা ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক চৈৎসিংহের কাছে রাজস্বের অতিরিক্ত টাকা দাবির সঙ্গে তুলনীয়।

৪। 'বর্গীর হাঙ্গামা'

"ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥"

এই ছড়ায় আলিবর্দির শাসনকালে বাঙালী চিত্তের আর্তনাদ মর্মন্তুদ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'বর্গীর হাঙ্গামা' বাঙালীর মনকে দীর্ঘকাল ত্রাসের ছায়ায় আচ্ছন্ন রেখেছিল।

বাঙালীদের কাছে মারাঠা সৈন্য "বর্গী" নামে পরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে 'বর্গী' শব্দটি 'বার্গীর' শব্দের বিকৃতি। নিম্ন শ্রেণীর যে সকল সৈন্যকে মারাঠা সরকার থেকে ঘোড়া ও অস্ত্র দেওয়া হত তাদের নাম ছিল 'বার্গীর'। মারাঠা বাহিনীতে 'শিলাদার' নামে পরিচিত আর এক শ্রেণীর সৈন্য ছিল; তারা নিজেদের ঘোড়া ও অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত। বাঙালী এই পার্থক্য জানত না, তাই বাংলায় সকল মারাঠা সৈন্যকেই "বর্গী" বলা হত।

বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামার মূলে ছিল মারাঠা সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি। শিবাজীর পৌত্র শাহুর রাজত্বকালে (১৭০৮-৪৯) মারাঠাদের আধিপত্য দক্ষিণ ভারতে, মধ্য ভারতে এবং পশ্চিম ভারতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল। শাহু রাজ্যশাসনের ভার প্রকৃতপক্ষে 'পেশোয়া' যা প্রধান মন্ত্রীর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর আমলে পেশোয়ার পদ বংশগত হয়ে পড়েছিল। মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন করেন দু'জন পেশোয়া—প্রথম বাজী রাও (১৭২০-৪০) এবং তাঁর পুত্র বালাজী বাজী রাও (১৭৪০-৬১)। শাহু এবং পেশোয়া মারাঠা সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানে ছিলেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে কম-বেশি ক্ষমতার

অধিকারী আঞ্চলিক শাসক ছিলেন। বেরারে রঘুজী ভোসলা প্রায় স্বাধীনভাবেই তাঁর রাজ্যখণ্ড শাসন করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল নাগপুরে। শাহুজী রাওকে দুর্বল করে শাহুর উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। উত্তর ভারতে এবং পশ্চিম ভারতে তাঁর রাজ্য সম্প্রসারণের পথ পেশোয়ারা রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। দক্ষিণে নবগঠিত হায়দরাবাদ রাজ্য, তার প্রতিষ্ঠাতা ও শাসক কৌশলী যোদ্ধা এবং কূটনীতিবিদ আসফ জাহ নিজাম-উল-মুল্‌ক। সুতরাং রঘুজীর দৃষ্টি পড়ল পূর্ব দিকে। আলিবর্দির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উড়িষ্যা তাঁর রাজ্যের সংলগ্ন ছিল। সেখানে নিজের আধিপত্য স্থাপন করতে (১৭৪০-৪১) আলিবর্দিকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। সরফরাজ খাঁর কয়েকজন আত্মীয় এবং সমর্থক দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নিয়েছিল। আলিবর্দির শাস্তিবিধানের জন্য তারা রঘুজীকে উড়িষ্যা আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করল। নিজের রাজ্য থেকে রঘুজীর দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে নিজাম-উল-মুল্‌কও তাঁকে এই পরামর্শ দিলেন। ফল হল আলিবর্দির রাজ্যে এক দশক ব্যাপী বর্গীর হাঙ্গামা।

সমসাময়িক তিন জন হিন্দু (কবি ভারতচন্দ্র, গঙ্গারাম, বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালংকার) এবং দু'জন মুসলমান—ঐতিহাসিক সলিমুল্লা এবং গোলাম হোসেন সলিম—তাঁদের রচনায় বর্গীর হাঙ্গামার বিবরণ দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র রচনাকাল ১৭৫২-৫৩ সাল। বর্গীদের রাজার সঙ্গে আলিবর্দির সন্ধি হয়েছিল ১৭৫১ সালে। সুতরাং ভারতচন্দ্র বর্গীর হাঙ্গামার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তিনি তাঁর কাব্যে এই হাঙ্গামার ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি, কিন্তু যেটুকু বলেছেন তার গভীর তাৎপর্য আছে। তাঁর মূল বক্তব্য: আলিবর্দি পুরী ও ভুবনেশ্বরে মন্দির লুণ্ঠন করে হিন্দুর মনে আঘাত দিয়েছিলেন; তাই শিবভক্ত সাতারার রাজা যবনদের দমন করার জন্য নন্দীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন, এবং এর ফলে রঘুরাজা ভাস্কর পণ্ডিতকে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। এখানে আলিবর্দি সম্বন্ধে হিন্দুদের বিরূপতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। স্বধর্ম রক্ষায় অক্ষম হিন্দু 'বর্গীর আক্রমণের মধ্যে আহত মর্যাদার প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজিয়া পাইয়াছিল।'

তর্ক উঠেছে: ভারতচন্দ্র নিরপেক্ষ সাক্ষী নন, কারণ তাঁর অন্নদাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আলিবর্দি নজর না দেবার অপরাধে আটক রেখেছিলেন, তাই নবাবের সম্বন্ধে তাঁর অনুকূল ধারণা ছিল না। কিন্তু তিনি আলিবর্দির রাজত্বকালেই 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন এবং কাব্যটি সেই সময়েই যথেষ্ট প্রচার লাভ করে। ভারতচন্দ্র সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং বৈষয়িক ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিলেন। যে বিষয় প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর কাব্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয় সেটা নবাবের রোষের ভয় উপেক্ষা করে তিনি উল্লেখ করতে যাবেন কেন?

গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণে' মোটামুটি একই মন্তব্য পাওয়া যায়। তিনি

বলেছেন ঃ শিবের নির্দেশে নন্দী শাহু রাজার মাধ্যমে পাপীদের দমনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু যারা মুক্তিদাতা রূপে বাংলায় প্রবেশ করল তারা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে অত্যাচারে লিপ্ত হল। ফলে বাঙালীর মন পরিবর্তিত হল, মুসলমান-শাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হল। সম্ভবতঃ গঙ্গারাম পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের সাময়িক মত পরিবর্তনের কথাই বলেছেন। বর্গীদের অত্যাচার তাদের আশাভঙ্গ করেছিল, এটা তারই প্রতিক্রিয়া।

মারাঠা আক্রমণের সূরু হয়েছিল ১৭৪২ সালে, শেষ হয়েছিল ১৭৫১ সালে। ভোঁসলা রাজার বাংলা আক্রমণের সুযোগ নিয়ে অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গ বিহার দখল করার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে পাটনাতে উপস্থিত হলেন (১৭৪২-৪৩)। তার পরেই বিহার অতিক্রম করে বাংলায় প্রবেশ করলেন পেশোয়া বালাজী বাজী রাও তাঁর বাহিনী নিয়ে (১৭৪৩)। বিহারে আফগানদের বিদ্রোহ ঘটল (১৭৪৫-৪৮)। নবাবের আদরের নাতি সিরাজউদ্দৌলা বিহারের শাসনকর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী হলেন (১৭৫০)। বৃদ্ধ নবাব অবিরত যুদ্ধ করে চললেন, কিন্তু চার দিকে বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য যে সামরিক বল ও অর্থবল আবশ্যক তা' তাঁর ছিল না। মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করালেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ১৭৫১ সালের সন্ধির শর্ত অনুসারে উড়িষ্যা ভোঁসলা রাজার অধিকারভুক্ত হল, সুবর্ণরেখা নদী বাংলা সুবার সীমা রূপে নির্দিষ্ট হল এবং নবাব প্রতি বৎসর এই সুবার 'চৌথ' হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা ভোঁসলা রাজাকে দিতে চুক্তিবদ্ধ হলেন।

গঙ্গারামের বর্ণনায় বর্গীর হাঙ্গামার বীভৎস চিত্র ফুটে উঠেছে ঃ

মাঠ ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া ॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারা বধএ পরাণ ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া জাএ।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে ॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া ॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ ॥

* *

কারুকে বাঁধে বরগি দিআ পিঠ মোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া ॥

রূপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগি পথইরে ডুবাএ।
ফাফর হইঞা তবে কারু প্রাণ জাএ॥

বাণেশ্বর বিদ্যালংকার লিখেছেন : বর্গীরা বহু লোককে নাক কান হাত কেটে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছে, অকথ্য নির্যাতন করে অনেককে পুড়িয়ে মেরেছে, অনেক পরিবারের সম্মান নষ্ট করেছে। নাক কান হাত কাটার কথা হলওয়েলও বলেছেন। স্ত্রীলোকদের স্তন কেটে ফেলার কথাও তিনি বলেছেন।

প্রজাদের রক্ষা করতে অক্ষম নবাবের রাজ্যে তাদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ছিল পলায়ন। গঙ্গারাম বলেছেন :

তবে সব বরগী গ্রাম লুটিতে লাগিল।
যত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি হরপি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া যত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক-নড়ি।
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল-দড়ি ···॥
ভালমানুষের স্ত্রীলোক যত হাঁটে নাই পথে।
বরগীর পেলানে পেঠারি লইল মাথে॥
ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলবারের ধনী।
তলয়ার ফেলাইঞা তারা পলাএ অমনি॥
গোসাঞি মহান্ত যত চোপালাএ চড়িয়া।
বোচকাবুচকি লয় যত বাহুকে করিয়া···॥
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল।
বরগীর নাম সুইনা সব পলাইল ··॥
সিকন্দার পাটআরি যত গ্রামে ছিল।
বরগীর নাম সুইনা সব পলাইল···॥
দশবিশ লোক আইসা পথে দাঁড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগী কোথাএ দেখিলা॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেখিয়া আমরা পলাই॥

কেবল যে সাধারণ মানুষ 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' নীতি অনুসরণ করেছিল তা' নয়। বর্ধমানের মহারাজা তিলক চাঁদের মা সপুত্রক নদীয়ার মহারাজার কাছ থেকে গঙ্গার পূর্ব তীরে মূলাজোড় ইজারা নিয়ে সেখানে কিছুকাল বাস

করলেন। স্বয়ং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগর ত্যাগ করে ইছামতী নদীর তীরে সাময়িক আবাস স্থাপন করলেন। বহু লোক কলকাতায় ইংরেজদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। জগৎশেঠ ধনরত্ন নিয়ে ঢাকায় চলে যান।

মোগল-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর বাংলায় এমন বিভীষিকার ছায়া আর পড়ে নি। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, মারাঠা আক্রমণ ছিল একটা সাময়িক ঝড় ('passing blast') এবং এটা বাংলার একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল ('fringe') মাত্র স্পর্শ করেছিল।[১৩] উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যে গঙ্গারাম বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর—এই সকল জেলার অন্তর্গত অনেক জায়গার নাম উল্লেখ করেছেন। মারাঠারা হুগলী দখল করে সেখানে প্রশাসক নিযুক্ত করেছিল এবং গঙ্গা পার হয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কলকাতার ইংরেজ কুঠির কর্তাদের সতর্কতায় তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ শহর লুণ্ঠিত হয়েছিল (১৭৪২) লুণ্ঠিত হয়েছিল জগৎশেঠের বাড়ী থেকে নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং নানা রকম জিনিসপত্র। বাংলার প্রাণকেন্দ্র রাঢ় অঞ্চলে নবাবের কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল। এই কর্তৃত্ব ফিরে পাবার জন্য তাঁকে উড়িষ্যা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আচার্য যদুনাথ এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন নি। উড়িষ্যায় বাঙালী জমিদার ছিল, দক্ষিণ মেদিনীপুরের অনেক চাষীর বালেশ্বর অঞ্চলে জমিজমা ছিল। তাদের উপর মারাঠা-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলার নবাবের কোষাগার ক্ষতিগ্রস্ত হল।

বর্গীদের দশ বৎসরব্যাপী তাণ্ডবে পশ্চিম বাংলার যে ক্ষতি হয়েছিল সেটা আলিবর্দি এবং সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে পূরণ হয়নি। তারা যে কেবল শহরাঞ্চল লুণ্ঠন করত তা' নয়; বর্ষাকালে যখন যুদ্ধ করা সম্ভব হত না তখন তারা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। কৃষক ও গ্রামীণ শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রে সর্বস্বান্ত হল। অনেকে পৈতৃক ভিটা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে পালিয়ে গেল। ফলে গ্রামীণ সমাজ ভেঙে পড়ল ('village community falling to pieces'), কৃষি ও গ্রামীণ শিল্প বিপন্ন হল। গঙ্গারাম বলেছেন: বর্গীদের ভয়ে কেউ ঘরের বাইরে যেত না, কোথাও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত না, নবাবী সৈন্যেরা—এমন কি স্বয়ং নবাব পর্যন্ত—কলাগাছের মূল সিদ্ধ করে তাই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত। বর্ধমান থেকে কাটোয়া যাবার পথে নবাবী সৈন্যেরা তিন দিন প্রায় উপবাসে কাটিয়েছিল। ঐতিহাসিক ইউসুফ আলি এক সেরেরও কম ওজনের খিচুরি সংগ্রহ করে অন্য সাত জনের সঙ্গে ভাগ করে তা' খেয়েছিলেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের খাদ্য ছিল কলাগাছের মূল ও ঘাস। শস্যশ্যামলা বর্ধমান জেলার এই অবস্থা হয়েছিল।

বীরভূমে নগর (রাজনগর) ছিল বর্গীদের ঘাটি। সেখান থেকে তারা সমৃদ্ধ গ্রামে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ত। অজয় নদের তীরবর্তী অঞ্চল

১৩। Sir J. N. Sarkar, *History of Bengal*, Vol. II, ৪০৬ পৃষ্ঠা।

বিধ্বস্ত হয়েছিল। জমিদার শ্রেণীর মানুষ সর্বস্বান্ত হল। প্রজারা কৃষিকাজ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

উড়িষ্যার সংলগ্ন মেদিনীপুরে লোকসংখ্যা কমে গেল। ১৭৬৪ সালে কোম্পানীর এক কর্মচারী লিখেছেন: শাহপুর ও কাশীজোড়া পরগণায় মানুষের অভাবে অধিকাংশ জমিতে চাষ হত না। ১৭৬৭ সালে কোম্পানীর আর একজন কর্মচারী লিখেছেন: রায়ত সংগ্রহ করতে না পারলে ঐ জেলায় প্রচুর জমিতে ('vast quantities of land') চাষ হবে না। মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধির (১৭৫১) দীর্ঘকাল পরেও মেদিনীপুরের এই অবস্থা ছিল।

শুধু কৃষি নয়, বাংলার শিল্পও মারাঠাদের রোষদৃষ্টির ফলে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারা গঞ্জ, বাজার ও হাট লুঠ করত। বিদেশী কোম্পানীর বাণিজ্যপণ্যও রেহাই পেত না। তাঁতি ও কারিগরেরা অনেক সময় পালিয়ে যেত। যখন তারা কোনরকমে কাজ করত তখনও আতঙ্কের ফলে তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের উচ্চ মান রক্ষা করতে পারত না। উৎপাদনের মানের অবনতি আরম্ভ হলে সেটা রোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অরাজকতার ফলে বাংলার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হল, বিদেশে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ কমে গেল, উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযোগ ব্যাহত হবার ফলে সেদিকে পণ্যদ্রব্য চালান দেবার ব্যবস্থা বানচাল হল।

আলিবর্দি তার রাজত্বকালের শেষ পাঁচ বৎসরে (১৭৫১-৫৬) তাঁর রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য কোন চেষ্টা করেন নি। দ্রব্য মূল্য বাড়তে থাকল বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে; ফলে সাধারণ মানুষের কষ্ট উচ্চ সীমায় পেঁছে গেল। বাংলার যে ঐশ্বর্যের বর্ণনা সেকালের কোন কোন বিদেশী লেখকের লেখায় পাওয়া যায় সেটা অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য, কিন্তু করপ্রপীড়িত এবং বর্গীদের দ্বারা লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষ সেই সমৃদ্ধির অংশীদার ছিল না। ধনের অসম বণ্টন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার চিরকালীন ব্যাধি। বর্গীর হাঙ্গামার ফলে এই ব্যাধি মারাত্মক রূপ নিয়েছিল। সাধক কবি রামপ্রসাদের যে বংশে জন্ম হয়েছিল তাকে তিনি বলেছেন 'ধনহেতু মহাকুল'। তিনি নিজেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। মাতৃভক্ত কবি মাকে অনুযোগ দিয়েছেন:

জানি গো জানি তারা তোমার কেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,
    কারু পেটে ভাত গেঁটে সোনা॥
কেহ যায় মা পাল্কী চড়ে, কেহ তারে কাঁদে করে।
কেহ গায় দেয় শাল দোশালা
    কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥

স্বাধীনতার তিন দশক পরে আমাদের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই

বৈষম্যের কোন পরিবর্তন ঘটে নি, বরং নানা দিকে এটা বেড়েছে। নবাবী আমলে যারা দিনান্তরে খেতে পেত না তাদের দিকে মুর্শিদাবাদের দৃষ্টি ফিরবে, এমন কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু কয়েক বৎসর সেকালের কায়দা মাফিক শাসন ও শৃংখলা বজায় থাকলে প্রকৃতির স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী বর্গীদের সৃষ্ট রোগের অন্ততঃ আংশিক উপশম হত, কৃষকেরা নির্ভয়ে চাষ করত, গ্রামীণ শিল্পীরা আতংকমুক্ত হয়ে কাজ করত। আলিবর্দির মৃত্যুর (১৭৫৬) পর থেকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭২) পর্যন্ত নানারকম রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে এই সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছিল।

বর্গীর হাঙ্গামায় সাধারণ বাঙালীর দারিদ্র্য তীব্রতর হয়েছিল, কিন্তু তার আগেও সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা, ধন ধান্য পুষ্পে ভরা বাংলার সন্তানেরা সুখে ছিল না। কবি রামেশ্বর 'শিবায়নে' লিখেছেন ঃ

> গরিবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
> বার করে সকল বেচিয়া লয় রাজা॥

এটা মুর্শিদকুলি খাঁর আমলের কথা। তাঁর রাজস্ব-ব্যবস্থার ফলে অনেক জমিদারের উপর নির্যাতন ঘটেছিল। স্বভাবতঃই কৃষকেরা পরোক্ষভাবে সেই নির্যাতনের আওতায় এসেছিল, কারণ জমিদারেরা তাদের নিপীড়ন করেই নবাবের দাবি পূরণ করতেন। আলিবর্দি নাটোরের জমিদারীর রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে নজরানা দাবি করেছিলেন। জমিদারদের উপর এই ক্রম-বর্ধমান চাপ শেষ পর্যন্ত প্রজাদেরই বহন করতে হয়েছিল। মীর কাসিম রাজস্বের হার অত্যধিক বৃদ্ধি করেছিলেন। ইংরেজের শোষণে বাঙালী রক্তহীন হয়েছিল, এই প্রচলিত ধারণার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যাচাই করতে হলে নবাবী আমলে বাঙালীর অবস্থা স্মরণ করা দরকার।

বর্গীর হাঙ্গামার ফলে বহু লোক পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব বাংলা ও উত্তর বাংলায় চলে গিয়েছিল। তারা অনেকেই পূর্ব বাসভূমিতে ফিরে আসে নি। পূর্ব বাংলার বহু উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারের আদি বাস ছিল পশ্চিম বাংলায়। মারাঠাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য রাঢ় অঞ্চল থেকে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পূর্ব বাংলায় গিয়েছিল। কৃষক শ্রেণীর লোকও অনেকেই গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে সংখ্যাতত্ত্বভিত্তিক বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পারিবারিক কাহিনী থেকে এই পলায়িত জনসমষ্টি সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। স্বভাবতঃই পূর্ব বাংলার সামাজিক গঠন খানিকটা পরিবর্তিত হল, পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা কমে গেল। স্বাভাবিক নিয়মে জনসংখ্যার হ্রাস পূরণ হবার আগেই উপস্থিত হল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

ইংরেজ বণিকদের পক্ষে বর্গীর হাঙ্গামা শাপে বর হয়েছিল। উপদ্রুত অঞ্চল থেকে অনেক নিরাশ্রয় মানুষ কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিল। ইংরেজেরা চাঁদার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে এবং স্বেচ্ছাসেবক রক্ষীদল গঠন করে কলকাতার নিরাপত্তা

রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। ১৭৪৩ সালে কলকাতার উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে ছোট খাল (Maratha Ditch) খনন করা হল। খরচ বাবদ স্থানীয় অধিবাসীরা দিয়েছিল ২৫ হাজার টাকা। কলকাতা বর্গীদের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকায় বাঙালীদের মনে ইংরেজদের শক্তি, দৃঢ়তা এবং প্রজার নিরাপত্তা রক্ষায় আগ্রহ সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা জন্মাল।

৫। সিরাজউদ্দৌলা

১৭৫৬ সালের জুন মাসে ৮২ বছর বয়সে আলিবর্দি পরলোকগমন করেন। অপুত্রক নবাবের তিন কন্যা ছিল, হাজী আহম্মদের তিন পুত্রের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয়েছিল। জ্যেষ্ঠা ঘসিটি বেগম ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর স্বামী নওয়াজিস মোহাম্মদ খাঁ ঢাকার শাসনকর্তা (নবাব) ছিলেন। ১৭৫৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া কন্যার স্বামী ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা (নবাব)। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৭৫৬ সালে—আলিবর্দির মৃত্যুর তিন মাস আগে। তাঁর এক প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র শওকৎ জঙ্গ তাঁর মৃত্যুর পর পূর্ণিয়ার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। তৃতীয়া কন্যা আমিনা বেগমের স্বামী জৈনুদ্দীন আহম্মদ ১৭৪৮ সালে পাটনায় আফগান বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর দুই পুত্র সিরাজউদ্দৌলা এবং মির্জা মাহদি।

১৭৩৩ সালে, আলিবর্দির বিহারের 'নায়েব সুবা' পদ লাভের ঠিক আগে, সিরাজের জন্ম হয়েছিল। এই দৌহিত্রের জন্ম থেকেই তাঁর উন্নতির সূচনা, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁকে নয়নের মণি করে পালন করেছিলেন। মাতামহের অতিরিক্ত আদরে বাল্যে ও কৈশোরে সিরাজের চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার সূত্রপাত হল, পরে সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। আলিবর্দি তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন, কিন্তু রাজ্য শাসনের গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য যে শিক্ষা আবশ্যক তার কোন ব্যবস্থা করলেন না।

১৭৪৮ সালে আলিবর্দি সিরাজকে বিহারের 'নায়েব সুবা' নিযুক্ত করলেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হল রাজা জানকীরামকে। ১৭৫০ সালে সিরাজ তাঁকে সরিয়ে বিহারের শাসনকর্তৃত্ব হস্তগত করার উদ্দেশ্যে পাটনা আক্রমণ করলেন। আলিবর্দি পাটনায় গিয়ে সিরাজ ও জানকীরামের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করলেন; বিহারের শাসনভার জানকীরামের উপরই ন্যস্ত থাকল।

সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধে ইংরেজ বণিকেরা যা' লিখেছে তা' স্বভাবতঃই পক্ষ-পাতদুষ্ট বলে মনে হবে। ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী শওকৎ জঙ্গের শিক্ষক ছিলেন; সুতরাং সিরাজ সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মন্তব্য গ্রাহ্য না হতে পারে। কিন্তু কাশিম বাজারে ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জাঁ লা (Jean Law) সিরাজের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। একবার তিনি সিরাজের প্রাণ রক্ষার জন্য

নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছিলেন। তিনি তাঁকে সাহায্য করার জন্য এক ফরাসী সহকর্মীকে পলাশীতে পাঠিয়েছিলেন। সিরাজের মসনদে আরোহণ কাল থেকে এক বৎসর কালের অনেক ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন: সিরাজ ছিলেন অতি দুশ্চরিত্র এবং নিষ্ঠুর। তিনি গঙ্গাস্নানার্থী সুন্দরী হিন্দু স্ত্রীলোকদের ধরে নিয়ে যেতেন। তাঁর আদেশে গঙ্গায় নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হত, তিনি অসহায় পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের মৃত্যুর দৃশ্য দেখে নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করতেন। সকলেই তাঁর নামে ভয়ে কাঁপত।[১৪]

এই অত্যাচারী লম্পটকে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী বাঙালীর কল্পনা স্বাধীনতাসংগ্রামী বলে চিত্রিত করেছে—যদিও পলাশীর যুদ্ধ ছিল সেকালের রীতি অনুযায়ী ব্যক্তি-বিশেষের রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ এবং সেই ব্যক্তি ছিল বাংলার মানুষের আতঙ্ক। এই অনৈতিহাসিক, বিকৃত জাতীয়তাবাদের সূচনা করেছিলেন কবি নবীন চন্দ্র সেন তাঁর 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে (১৮৭৫)। সিরাজের অত্যাচার সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন।

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল-নিশীথিনী,
নীরবে নবাব-ভয়ে করিছে রোদন,
নীরবে কাঁদিছে আহা! বঙ্গবিষাদিনী,
নীহার-নয়নজলে তিতিছে বসন।
নীরব ঝিল্লির রব; স্তব্ধ সমীরণ;
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতী শয্যায়,
পতি প্রাণভয়ে, সতী সতীত্ব কারণ,
ভাবিছে অনন্য মনে কি হবে উপায়।
বিরামদায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়
কোথায় গিয়াছে, ডরি নবাব নিদয়।

১৪। "The character of Siraj-ud-Daulah was reputed to be one of the worst ever known. In fact he had distinguished himself not only by all sorts of debaucheries, but by a revolting cruelty. The Hindu women are accustomed to bathe on the bank of the Ganges. Siraj-ud-daulah, who was informed by his spies which of them were beautiful, sent his satellites in little boats to carry them off. He was often seen···causing the ferry boats to be upset or sunk, in order to have the cruel pleasure of seeing the confusion of a hundred people at a time, men, women and children, of whom many, not being able to swim, were sure to perish···Every one trembled at the name of Siraj-ud-daulah". (S. C. Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. III, ১৬২ পৃষ্ঠা)।

নাটোরের রাণী ভবানী 'ইন্দ্রিয়-লালসা-মত্ত' সিরাজের রাজ্যচ্যুতিতে 'অমত' করেন নি, কিন্তু তিনি বিদেশী ইংরেজের সাহায্য না নিয়ে অন্য উপায় অবলম্বন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে…

কিন্তু বাংলার 'নৃপতি-সমাজ' (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি) 'সম্মুখরণে' প্রবৃত্ত হবার কথা চিন্তাও করতে পারেন নি। বহু শতাব্দীর দাসত্ব তাঁদের হীনবীর্য করে রেখেছিল ; রাজ্যশাসনে মুসলমানের অধিকার তাঁরা ঐশ্বরিক বিধি (divine right) বলে মনে করতেন। সুতরাং তাঁরা স্থির করলেন 'কসাইতে সৈন্যাধ্যক্ষে (মীর জাফরকে) সিংহাসনোপরে'।

কাব্যের শেষ কয়েক পংক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

…নামিল যখন
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল

*　　　*　　　*

নিবিল গৃহের দীপ ; নিখিল তখন
ভারতের শেষ-আশা, হইল স্বপন।

সিরাজের মৃত্যুতে 'ভারতের শেষ-আশা' কিভাবে 'স্বপন' হল তা' কবি বলেন নি। ১৭৫৭ সালে মারাঠাদের বিশাল সাম্রাজ্য ছিল, দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। বাংলায় মীর জাফরের আমলে যে ইংরেজ-শাসনের সূচনা হবে তা সেই সময়ে কেউ জানত না। নবীন চন্দ্র পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্‌উক্তি করেছেন :

যেই শক্তি স্রোতস্বতী, ভেদি বঙ্গদেশ
নির্গত হইল আজি, ভ্রমি অবিশ্রাম
হিমাচল হতে বেগে করিবে গমন
কুমারীতে, লঙ্কা দ্বীপে লঙ্ঘি পারাবার।
প্রতিদিন ইহার বাড়িবে আয়তন,
হইবে তাহাতে ভীম ঝটিকা সঞ্চার।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কালো ছায়া নবীন চন্দ্রকে মুসলমান শাসনের প্রকৃতি সম্বন্ধে নীরব রাখে নি।

ভারতের নহে আজি অসুখের দিন
আজি হতে যবনেরা হল হতবল ;
কিবা ধনী, মধ্যবিত্ত কিবা দীন হীন
আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।

নবীন চন্দ্র সিরাজের পতনে 'বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন' (বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি) কাব্য রসে সিঞ্চিত করেন। সিরাজ জন্মসূত্রে বাঙালী ছিলেন না, বাংলা তাঁর মাতৃ-

ভাবা ছিল না, যে নবাবী পরিবেশে তিনি বাস করতেন তার সঙ্গে বাঙালীর সমাজ-জীবনের কোন যোগসূত্র অথবা সাদৃশ্য ছিল না। স্বভাবতঃই বাংলা ও বাঙালীর জন্য তাঁর কোন মমত্ব বোধ ছিল না, তারা ছিল তাঁর ভোগের ও ক্ষমতার উপকরণ যোগাবার যন্ত্র। তাঁর পতনে 'রোদন' করার বাঙালীর কোনই কারণ ছিল না।

নবীন চন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় গিরিশ চন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে (১৯০৫)। এখানে সিরাজ প্রজাপালক নবাব। তিনি বলছেন ঃ

রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার ;
নবাব রাজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে
প্রজার মঙ্গল কার্য সতত সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।

সিরাজকে আদর্শ শাসক রূপে চিত্রিত করেই গিরিশ চন্দ্র ক্ষান্ত হন নি; তিনি তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছেন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নায়কের কারুকার্য-খচিত পোশাক। বাঙালী অতি আগ্রহে নাট্যকারের সৃষ্ট এই পুতুলকে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। কংগ্রেসের মধ্যে গরমপন্থী দল (Extremists) শক্তিশালী হয়েছে। এই দলের অন্যতম সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। সন্ত্রাসবাদীরা বিদেশী শাসকদের উদ্ব্যস্ত করেছে। বঙ্গভঙ্গের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। বাঙালীর প্রাণে তখন প্রবল উত্তেজনা। এই পরিবেশে সিরাজ-চরিত্র কলংকমুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে গিরিশ চন্দ্র তাঁকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করলেন। বাঙালীর প্রাণে সাড়া জাগল।

গিরিশ চন্দ্র বাঙালী ঐতিহাসিকদের দ্বারা ভুল পথে চালিত হয়েছিলেন। নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন ঃ 'বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারী লাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধীজন অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী'।

এই লেখকেরা সকলেই স্বাদেশিকতার প্রভাবে প্রকৃত ঐতিহাসিকের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রচিত 'সিরাজদৌল্লা' এবং নিখিল নাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' ও 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'সিরাজদ্দৌলা' বইর সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'সিরাজদ্দৌলা যদিও উন্নতচরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি (রাজমর্যাদাভিমানী নবাবের সহিত ধনলোলুপ বিদেশী বণিকের) এই দ্বন্দ্বের হীনতা-মিথ্যাচার-প্রতারণার উপরে তাঁহার সাহস ও সরলতা, বীর্য ও ক্ষমা,

রাজোচিত মহত্বে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে।' কিন্তু এই 'রাজোচিত মহত্ব' বুদ্ধির প্রাখর্য এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। লেখক সম্বন্ধে কবি বলেছেন, তিনি 'ইতিহাসের চিরাপরাধী অপবাদগ্রস্ত দুর্ভাগ্য সিরাজদ্দৌলার জন্য পাঠকের করুণা উদ্দীপন' করেছেন, কিন্তু 'একটা বিষয়ে তিনি ইতিহাস-নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন'—তিনি 'সিরাজচরিত্রের কোন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ উদ্যম সহকারে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।' ফলে 'সত্যের শান্তি নষ্ট হইয়াছে এবং পক্ষপাতের অমূলক আশংকায় পাঠকের মনে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে।'[১৫] 'পক্ষপাতের আশংকা' যে 'অমূলক' নয় কবি পরোক্ষে সেটা স্বীকার করেছেন 'ইতিহাস-নীতি লঙঘনের' সুস্পষ্ট অভিযোগের মধ্য দিয়ে।

জাতীয়তাবাদ যখন বন্যার রূপ গ্রহণ করে নি তখন লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর 'নবাব সেরাজুদ্দৌলা' নাটকে (১৮৭৬ সালে প্রকাশিত) বলেছিলেন:

> গর্ভিনী রমণী ধরে বিদরে উদর,
> লোকপূর্ণ নৌকা সব জলে ডুবাইয়া,
> দেখেছে কৌতুকে দুষ্ট, করতালি দিয়া।

নবীন চন্দ্র এবং লক্ষ্মীনারায়ণের রচনায় ইতিহাসের প্রতি কিছু নিষ্ঠা আছে; গিরিশ চন্দ্রের নাটকে তার একান্ত অভাব। তবু বাঙালী স্বাদেশিকতার উত্তেজনায় ইতিহাসের এই বিকৃতিকে মহোৎসাহে গ্রহণ করেছিল। 'বঙ্গভঙ্গের মুহূর্ত বলেই বিনা বাধায় গিরিশ চন্দ্রের সিরাজ শহীদের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।'[১৬] বাঙালীর মনে এই 'শহীদে'র আকস্মিক প্রভাব ইংরেজ সরকারকে বিচলিত করেছিল।

দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর পরে শচীন সেন গুপ্ত তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে (১৯৩৮) এই কল্পিত 'শহীদের' বেদীতে নতুন কারুকর্ম সংযোজন করলেন। তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতি চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সর্ব-ভারতীয় স্তরে তার প্রধান নায়ক মহাত্মা গান্ধী, আর তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতা বাংলার যৌবনের প্রতীক সুভাষ চন্দ্র। এই বাঙালী নেতার 'প্রতিচ্ছবিতে' শচীন সেনের সিরাজ বাঙালীর কাছে উপস্থিত হলেন। নাট্যকার দাবি করেছেন, তিনি 'সত্যাশ্রয়ী ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানের ফল' গ্রহণ করে সিরাজকে 'ফুটিয়ে তুলতে' চেয়েছেন। তাঁর মতে: 'সিরাজ ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। তাই তাঁর পরাজয়ে বাঙ্গালীরও পরাজয় হল। তাঁর পতনের সঙ্গে বাঙ্গালীও হল পতিত।' সেই যুগসন্ধিকালে বাঙালী খুঁজেছিল ইংরেজ-বিরোধিতার এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত; তাই ইতিহাসের চরম বিকৃতি তাদের করতালি লাভ করেছিল।

রাজনৈতিক কারণে ১৯০৫ সালে এবং ১৯৩৮ সালে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের

১৫। 'আধুনিক সাহিত্য', 'সিরাজউদ্দৌলা' প্রবন্ধ।
১৬। সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, 'বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা', ২৬৪ পৃষ্ঠা।

বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই গিরিশ চন্দ্রের সিরাজ উভয় সম্প্রদায়কে আহ্বান করে বলছেন ঃ

এস করি পরস্পর মার্জনা এখন ;
হই বিস্মরণ পূর্ব বিবরণ।

মুসলমান এই আহ্বানে সাড়া দিল না ; স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ করে দাঙ্গার যুগ আরম্ভ হল। শচীন সেন গুপ্তের সিরাজ উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা করছেন ঃ 'বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়। মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা।' কিন্তু ততদিনে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষ ফলে পুষ্পে সুশোভিত হচেছ, 'গুলবাগে' শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করে মুসলমান আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। দশ বৎসরের মধ্যেই 'গুলবাগ' দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। অত্যাচারী মুসলমান রাজার স্মৃতিপূজা করেও বাঙালী হিন্দু মুসলমানের চিত্ত জয় করতে পারল না।

আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজ বিনা বাধায় সিংহাসনে আরোহণ করলেন (এপ্রিল ১৭৫৬), কিন্তু এর আগেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর হয়েছিল। সিংহাসনের জন্য তাঁর প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁর মাসতুতো ভাই, পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎ জঙ্গ। তিনি থাকতেন দূরে। রাজধানীর উপকণ্ঠে মোতিঝিলে সুরক্ষিত দুর্গে বাস করতেন সিরাজের প্রবল শত্রু - তাঁর জ্যেষ্ঠা মাসী ঘসিটি বেগম। তিনি ছিলেন আলিবর্দির প্রিয়তমা কন্যা। তাঁর স্বামী নওয়াজিস মোহাম্মদ খাঁ ঢাকার নবাব ছিলেন। অকর্মণ্য স্বামীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঘসিটি বেগম নিজের প্রিয় পাত্র হোসেন কুলি খাঁর মাধ্যমে শাসন-কার্য পরিচালনা করতেন। প্রচুর অর্থ তাঁর নিজস্ব ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল। আলিবর্দির জীবিত কালে সিরাজ হোসেন কুলিকে মুর্শিদাবাদের রাজপথে হত্যা করেন (এপ্রিল ১৭৫৪)। হোসেন কুলির প্রভাব ও ঐশ্বর্য তাঁর হিংসা উদ্রেক করেছিল। হোসেন কুলি তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন—এটাই ছিল তাঁর প্রকাশ্য অভিযোগ। এই হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকায় প্রশাসনে হোসেন কুলি খাঁর স্থান অধিকার করলেন রাজবল্লভ। ঘসিটি বেগমের কাজকর্মের তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁকে দেওয়া হল। তিনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য, তাঁর নিবাস ছিল ঢাকার অন্তর্গত রাজনগরে। তিনি নৌবাহিনীর প্রশাসক রূপে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নওয়াজিস মোহাম্মদের মৃত্যুর (ডিসেম্বর ১৭৫৫) পর রাজবল্লভকে নবাবী তহবিল তছরূপের অপরাধে মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ করা হল (মার্চ ১৭৫৬) এবং তাঁর সম্পত্তি ও পরিবারস্থ লোকজনকে আটক করার জন্য ঢাকাতে লোক পাঠানো হল। এটা ঘটেছিল সিরাজের নির্দেশে; আলিবর্দি

তখন মৃত্যুশয্যায়। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সমূহ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সপরিবারে সমস্ত ধনরত্ন সহ পুরীতে তীর্থযাত্রার অজুহাতে জলপথে কলকাতায় পৌঁছলেন এবং ইংরেজ কোম্পানীর গভর্নর ড্রেককে ঘুষ দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় লাভ করলেন (মার্চ ১৭৫৬)। এদিকে মোতিঝিল থেকে ঘসিটি বেগম সিরাজের পরিবর্তে শওকৎ জঙ্গকে সিংহাসনে বসাবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

সিরাজের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আলিবর্দির প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলি খাঁ। ঘসিটি বেগম স্ত্রীলোক, কূটকৌশলে দক্ষ হলেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল না। শৌকত জঙ্গ ছিলেন সিরাজের মতই রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। কিন্তু মীরজাফর মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে কিছু সাফল্য লাভ করেছিলেন। আলিবর্দি তাঁর সঙ্গে নিজের বৈমাত্রেয় বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি নবাবের নিকট আত্মীয় হলেন, তাঁর সামাজিক মর্যাদা বেড়ে গেল।

নবাবী আমলে বাংলা বিদেশী মুসলমান ভাগ্যান্বেষীদের ক্রীড়াক্ষেত্র হয়ে পড়েছিল। মীর জাফর ছিলেন আরব বংশীয়। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা কিছুই ছিল না। সুজাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি কপর্দকহীন অবস্থায় বাংলায় এসেছিলেন। গিরিয়ার যুদ্ধে (১৭৪০) তিনি আলিবর্দির পক্ষে অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় তিনি কিছুকাল (১৭৪৫) উড়িষ্যার প্রশাসক ছিলেন। মেদিনীপুর এবং হুগলীর ফৌজদার পদেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

প্রভুদ্রোহিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা সেকালের রাজনীতির স্বাভাবিক অঙ্গ ছিল। বিশেষতঃ যাঁরা বিদেশী ভাগ্যান্বেষী, এই দেশের সঙ্গে যাঁদের নাড়ীর টান ছিল না, তাঁরা ছলে-বলে-কৌশলে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করাই জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। ১৭৪৭ সালে মীর জাফর আর এক মুসলমান সেনানায়কের সহযোগিতায় আলিবর্দিকে হত্যা করে মসনদ অধিকার করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আলিবর্দি ব্যাপারটা জানতে পারলেন, কিন্তু পদচ্যুতি ছাড়া অপরাধীদের আর কোন শাস্তি দিলেন না। অল্পদিন পরেই মীর জাফর আবার নবাবের অনুগ্রহ লাভ করলেন। প্রবীণ আলিবর্দি দুধ দিয়ে কালসর্প পোষণ করেছিলেন; সেই কালসর্পের দংশনে তাঁর আদরের দুলাল সিরাজের সর্বনাশ হল। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন: আলিবর্দির যদি তাঁর পরমোপকারী প্রভু সুজাউদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবার অধিকার থেকে থাকে, তবে আলিবর্দি অথবা তাঁর উত্তরাধিকারীকে হত্যা করে মসনদ দখল করার 'নৈতিক অধিকার' ('moral right') মীর জাফরও দাবি করতে পারতেন। এখানে 'নৈতিক' শব্দের পরিবর্তে 'রাজনৈতিক' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। মীর জাফরের কৃতঘ্নতার সঙ্গে তুলনীয় ঘটনা মুসলমান আমলে ভারতের নানাস্থানে বারবার ঘটেছে। বাংলায় তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বখ্‌তিয়ার খলজীকে হত্যা

করেছিলেন তাঁর অনুচর আলী মর্দান। অষ্টাদশ শতকে সম্রাট ফররুখসিয়র ও দ্বিতীয় আলমগীরকে হত্যা করেছিলেন তাঁদের মন্ত্রীরা। মীর জাফর ইতিহাসে কুখ্যাতি লাভ করেছেন এবং তাঁর নামটি কৃতঘ্নতার সঙ্গে স্থায়ী ভাবে যুক্ত হয়েছে এই কারণে যে জাতীয়তাবাদী বাঙালী লেখকেরা সিরাজকে 'শহীদ' রূপে বরণ করেছিলেন।

আলিবর্দি'র মৃত্যুকালে মীর জাফর ছিলেন বার্ধক্যপীড়িত; ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং আফিমের নেশা তাঁর কর্মক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু মসনদে বসার লোভ তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। সিরাজের দুর্বলতা, তাঁর প্রতি ঘসিটি বেগমের বিজাতীয় আক্রোশ এবং শওকৎ জঙ্গের উচ্চাভিলাষ বাংলায় যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল মীর জাফর তার সুযোগ নিতে প্রস্তুত হলেন। তিনি ঘটনার গতি লক্ষ্য করতে লাগলেন, আকস্মিক ভাবে আগুনে ঝাঁপ দিলেন না।

সিরাজ সিংহাসনে আরোহণের পর এক মাসের মধ্যেই ঘসিটি বেগম এবং মীর জাফরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন (মে ১৭৫৭)। ঘসিটি বেগমের সম্পত্তি সহ মোতিঝিল দখল করা হল এবং তাঁকে আটক রাখা হল। মীর জাফর পদচ্যুত হলেন; নবাবী ফৌজের অধিনায়ক হলেন মীর মদন নামে এক কাশ্মীরী যুদ্ধব্যবসায়ী। মোহন লাল নামে আর এক কাশ্মীরী কার্যতঃ প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করলেন। তাঁকে 'মহারাজা' উপাধি দেওয়া হল। এ'রা দুজনেই সিরাজের অনুগত এবং কর্মদক্ষ ছিলেন।

অতঃপর সিরাজ তৎপরতার সঙ্গে সসৈন্যে পূর্ণিয়ার দিকে যাত্রা করলেন— শওকৎ জঙ্গের বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে। পথে রাজমহলে তিনি কলকাতার ইংরেজদের অবাধ্যতার সংবাদ পেয়ে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করলেন (মে ১৭৫৭)। কলকাতা অধিকার করে তিনি সগৌরবে মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন (জুলাই ১৭৫৭)। ইতিমধ্যে শওকৎ জঙ্গ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং দিল্লীর বাদশাহী দরবার থেকে বাংলার মসনদ দখল করার জন্য অনুমতি পেয়েছিলেন। সিরাজ বর্ষার শেষে সসৈন্যে পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। মনিহারিতে যুদ্ধ হল; শওকৎ জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হলেন।

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেছেন, ইংরেজের পরাজয় এবং শওকৎ জঙ্গের পতন সিরাজের সৌভাগ্য-সূর্যকে মধ্যাহ্ন গগনে নিয়ে এল। আবার দিল্লী থেকে এল বাদশাহী 'ফর্মান'—সিরাজকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার রূপে স্বীকৃতি দিয়ে। কিন্তু সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হতে দেরি হল না, ইংরেজদের রণ-সজ্জার সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছল (ডিসেম্বর ১৭৫৬)। কয়েক মাস পরে সিরাজ রাজ্য ও প্রাণ হারালেন (জুন ১৭৫৭)।

৬

বণিকের মানদণ্ড

১। বাণিজ্যের আদি যুগ

সুরাটে, মসুলিপটমে ও মাদ্রাজে ইংরেজ কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের কথা আগেই বলা হয়েছে। মাদ্রাজে কুঠি স্থাপনের কয়েক বৎসর পূর্বে মসুলিপটম কুঠির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বাংলা ও উড়িষ্যার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সুতী বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করার অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে উড়িষ্যার মোগল সুবাদারের কাছে দূত পাঠালেন (১৬৩৩)। সুবাদার ইংরেজ বণিকদের বিনা শুল্কে উড়িষ্যায় বাণিজ্যের অনুমতি দিলেন। বালেশ্বরে এবং হরিহরপুরে কুঠি স্থাপিত হল। কিন্তু পর্তুগীজ জলদস্যু এবং ওলন্দাজ বণিকদের শত্রুতায় এবং অন্যান্য কারণে উড়িষ্যায় আশানুরূপ বাণিজ্য বিস্তার হল না।

গেব্রিএল বাউটন (Gabriel Boughton) নামক এক ইংরেজ চিকিৎসক সুরাট থেকে আগ্রায় এসে পাদশাহী দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং শাহ জাহানের পুত্র, বাংলার সুবাদার সুজার প্রীতিভাজন হন। সুজার সঙ্গে তিনি বাংলার রাজধানী রাজমহলে উপস্থিত হন। তখন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে মাদ্রাজ অঞ্চলে ইংরেজদের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল; উড়িষ্যাতেও অবস্থা অনুকূল ছিল না। বাংলায় তখন মোগল-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত; সর্বত্র শান্তি, আর্থিক ক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত। শাসন-সংক্রান্ত দলিলপত্রে বাংলাকে বলা হত 'হিন্দুস্তানের বেহেশ্‌ত্‌' (স্বর্গ)। স্বভাবতঃই ইংরেজেরা বাংলায় বাণিজ্য বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হল। তাদের সহায়ক হলেন বাউটন। ১৬৫০ সালে শাহ জাহান এক 'ফর্মান' দিয়েছিলেন যে ইংরেজ কোম্পানী অযোধ্যা, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বাণিজ্যদ্রব্য 'রাহাদারী' শুল্ক (পথ কর) না দিয়ে পশ্চিম উপকূলে—সুরাট প্রভৃতি বন্দরে—পাঠাতে পারবে সমুদ্রপথে রপ্তানির জন্য। ইংরেজেরা এই 'ফর্মানে'র ভিত্তিতে দাবি করল যে তাদের বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার

অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হলেও সুজা তিন হাজার টাকা উপঢৌকন পেয়ে এটা মেনে নিলেন; পিছনে ছিল বাউটনের প্রভাব। ১৬৫১ সালে সুজা এক 'নিশান' (সুবাদারী নির্দেশ) জারি করলেন। ইংরেজদের ব্যাখ্যা অনুসারে এই 'নিশানে'র বলে তারা বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকা দিয়ে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকারী হল। এই 'নিশান' ব্যক্তিগত ভাবে বাউটনকে দেওয়া হয়েছিল—কোম্পানীকে নয়, এ রকম ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। তা' ছাড়া সুবাদারী 'নিশান' এবং বাদশাহী 'ফর্মান' আইনের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মোটের উপর কোম্পানী যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দাবি করতে লাগল সুজার শাসন-কর্তৃত্বের অবসান হলে তার কোন আইনসিদ্ধ ভিত্তি ছিল না।

হুগলীতে কোম্পানীর কুঠি স্থাপিত হল ১৬৫১ সালে। পরে ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটি কুঠি স্থাপিত হল: কাশিম বাজার (১৬৫৮), ঢাকা (১৬৬৮), মালদহ (১৬৭৬-৭৯), কলকাতা (১৬৯০)। বাংলায় নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বাড়তে লাগল: ৭,০০০ পাউণ্ড (১৬৫২), ২৩,০০০ পাউণ্ড (১৬৫৮); গড়ে ১১০,০০০ পাউণ্ড (১৬৭৮-৮০) থেকে ২৪০,০০০ পাউণ্ড (১৭০৯)।

সুজার পতন এবং আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের (১৬৫৮) পরে ইংরেজদের নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল। সুবাদার মীর জুমলা (১৬৫৯—৬৩) একবার কাশিম বাজারে কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আসামে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তিনি বাংলায় সরকারী কর্মচারীদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। তারা ইংরেজ বণিকদের কাছ থেকে নানাভাবে টাকা আদায় করত। সুবাদার শায়েস্তা খাঁর সুদীর্ঘ শাসনকালে (১৬৬৪-৭৮, ১৬৮০-৮৮) ফরাসী এবং দিনেমার বণিকেরা বাংলায় এসে ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করেছিল। মোগল রাজকর্মচারীদের আর্থিক দাবি মেটাতে গিয়ে ইংরেজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। শায়েস্তা খাঁর মতে ইংরেজ বণিকেরা ছিল 'নীচ, ঝগড়াটে এবং অসৎ'।

১৬৮২ সালে উইলিয়ম হেজেস (William Hedges) বাংলায় কোম্পানীর কুঠিগুলির পরিচালক রূপে হুগলীতে উপস্থিত হন। তখন মোগল রাজকর্মচারীদের জোরজুলুমের ফলে হুগলীতে ইংরেজের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হেজেস প্রতিকারের আশায় ঢাকাতে গিয়ে শায়েস্তা খাঁর মৌখিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে হুগলীতে প্রত্যাবর্তন করলেন, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। মোগল রাজকর্মচারীরা কোম্পানীর নৌকা আটক করে মালপত্র বাজেয়াপ্ত করত, কারণ ইংরেজেরা সুজার 'নিশানে'র দোহাই দিয়ে শুল্ক দিত না।

এতদিন পর্যন্ত কোম্পানীর নীতি ছিল মোগল শাসকদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে শান্তিতে বাণিজ্য করা। আবশ্যকমত উপহার, অর্থাৎ উৎকোচ, দিয়ে

ইংরেজেরা নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিত। সেকালে রাজকর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ সমাজের দৃষ্টিতে অপরাধ বলে গণ্য হত না, ইংরেজ বণিকদলও এই কুপ্রথার সুযোগ নিতে দ্বিধা করত না। কিন্তু হেজেস স্থির করলেন, এভাবে আর কাজ চালানো যাবে না, প্রয়োজন হলে মোগল শাসকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে। তিনি প্রস্তাব করলেন, আত্মরক্ষার জন্য হুগলী নদীর মুখে সাগর দ্বীপে একটি সুরক্ষিত কুঠি নির্মাণ করা আবশ্যক। কোম্পানীর লণ্ডনস্থ কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন না। তাঁদের মনে হল কোম্পানীর অধিকারভুক্ত বোম্বাই থেকে সমুদ্রপথে মোগলদের আক্রমণ করা অথবা বাংলায় চট্টগ্রাম অধিকার করা বেশি সুবিধাজনক হবে।

বোম্বাই আগে পর্তুগীজদের অধিকারে ছিল। ১৬৬১ সালে পর্তুগালের রাজকন্যার সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিয়ে হয়। এই বিয়েতে বোম্বাই রাজকন্যাকে যৌতুক দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর পরে দ্বিতীয় চার্লস বার্ষিক দশ পাউন্ড খাজনায় বোম্বাই কোম্পানীর হাতে সমর্পণ করেন। ১৬৬৮ সালে কোম্পানী বোম্বাইর দখল নিয়েছিল।

হেজেসের পরামর্শের পরিণতি হল কোম্পানীর সঙ্গে মোগল সম্রাটের যুদ্ধ। কোম্পানীর লণ্ডনস্থ কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের সম্মতি নিয়ে হুকুম দিলেন, মোগল অধিকারভুক্ত সুরাট থেকে কুঠি বোম্বাইতে সরিয়ে নিতে হবে, সমুদ্রে মোগল জাহাজ ছিনিয়ে নিতে হবে। ইংলণ্ড থেকে সৈন্য বোঝাই জাহাজ ভারতে প্রেরিত হল। বাংলায় পৌঁছে গেল তিনটি জাহাজ এবং অল্পসংখ্যক সৈন্য।

প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সূত্রপাত হল হুগলীতে (১৬৮৫-৮৬)। হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ জোব চার্নক (Job Charnock) হুগলী থেকে পালিয়ে গিয়ে (এপ্রিল ১৬৮৬) দূরে থেকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিলেন। পরে ইংরেজেরা তাদের সম্পত্তি নিয়ে হুগলী ত্যাগ করে (ডিসেম্বর ১৬৮৬) গঙ্গার পূর্ব তীরে সুতানুটি গ্রামে আশ্রয় নিল। সেখান থেকে জোব জার্নক থানা নামক স্থানে (বর্তমান কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে গার্ডেন রীচ) মোগল দুর্গ অধিকার করলেন (ফেব্রুয়ারী ১৬৮৭)। কয়েকদিনের মধ্যেই মেদিনীপুরের অন্তর্গত হিজলি অধিকৃত হল। তারপর বালেশ্বরে মোগল দুর্গ দখল করে শহর পুড়িয়ে দেওয়া হল (মার্চ ১৬৮৭)। তিন মাস পরে শায়েস্তা খাঁর প্রেরিত সৈন্যদলের আক্রমণে এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ইংরেজেরা হিজলি ত্যাগ করতে বাধ্য হল (জুন ১৬৮৭)।

শায়েস্তা খাঁ শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোম্পানীকে উলুবেড়িয়ায় (কলকাতার ২০ মাইল দক্ষিণে, হাওড়া জেলায়) দুর্গ নির্মাণ করতে এবং হুগলীতে বাণিজ্য করতে অনুমতি দিলেন (আগস্ট ১৬৮৭)। কিন্তু বোম্বাইর নিকটবর্তী সমুদ্রে ইংরেজেরা মোগলদের জাহাজ আক্রমণ করায় তিনি এই অনুমতি

প্রত্যাহার করলেন। ইংরেজেরা সুতানুটি ত্যাগ করল (নভেম্বর ১৬৮৮)। জোব চার্নকের বদলে তাদের নতুন নায়ক হলেন কাপ্তেন হীথ। তিনি বালেশ্বর অধিকার করলেন এবং পরে সমুদ্রপথে যাত্রা করলেন চট্টগ্রাম অধিকার করার উদ্দেশ্যে (নভেম্বর—ডিসেম্বর ১৬৮৮)। কিন্তু চট্টগ্রাম অধিকার করা সহজসাধ্য ছিল না। তাই তিনি জলপথে মাদ্রাজে চলে গেলেন (ফেব্রুয়ারী ১৬৮৯)।

ইতিমধ্যে শায়েস্তা খাঁ আগ্রায় চলে যান (জুন ১৬৮৮) এবং কিছুকাল পরে (জুন ১৬৮৯) সুবাদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইব্রাহিম খাঁ। ইংরেজদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। তিনি যখন পাটনায় ছিলেন তখন জোব চার্নক তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ইংরেজ বন্দীদের মুক্তি দিলেন এবং ইংরেজদের বাংলায় ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে মাদ্রাজে চিঠি পাঠালেন (জুলাই ১৬৯০)। জোব চার্নক মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষকে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্যের দায়িত্ব নিয়ে সুতানুটিতে উপস্থিত হলেন (২৪ আগস্ট ১৬৯০)।

ইব্রাহিম খাঁর অহৈতুকী বদান্যতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ বণিকেরা—যারা বাংলা থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত হয়েছিল—আবার এদেশে উপস্থিত হল। তবে এ ব্যাপারে আওরঙ্গজেবেরও প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইংরেজ-মোগল সংঘর্ষের অবসান হয়েছিল, সুরাটের ইংরেজ বণিকেরা তাঁকে সাড়ে চার লাখ টাকা দিয়েছিল। তিনি দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে পশ্চিম উপকূলে এবং পূর্ব ভারতে যুদ্ধে তাঁর অর্থব্যয় হচ্ছিল, তা' ছাড়া বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটায় রাজস্বের দিক থেকে ক্ষতি হচ্ছিল। তাই তিনি ইব্রাহিম খাঁকে হুকুম দিলেন ইংরেজদের আবার বাণিজ্যের অধিকার দেবার জন্য (এপ্রিল ১৬৯০)। কিছুকাল পরে (ফেব্রুয়ারী ১৬৯১) এক বাদশাহী নির্দেশ (হাস্‌ব-উল-হুকম) জারি হল: ইংরেজেরা বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিয়ে বাংলায় অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে, তাদের আর কোনরকম শুল্ক দিতে হবে না। সুজার আমল থেকে ইংরেজেরা যে অধিকার দাবি করে আসছিল সেটা তাঁর পরম শত্রু আওরঙ্গজেব কায়েম করে দিলেন। এই ব্যবস্থার সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা করার মত রাজনৈতিক বিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। তাঁর পুত্র আজমকে লিখিত শেষ চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, 'দৃষ্টির ক্ষীণতা আশাভঙ্গ ছাড়া অন্য কোন ফল দেয় না।' এই মন্তব্য যে ইংরেজরূপী কালসর্প পোষণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য তা' তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি।

*　　*　　*

মোগল সরকারের বিরুদ্ধে ইংরেজ বণিকদের তিনটি প্রধান অভিযোগ ছিল। (১) সুজার 'নিশান' অগ্রাহ্য করে তাদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনুযায়ী শুল্ক নেওয়া হত, বার্ষিক তিন হাজার টাকা নিয়ে রেহাই দেওয়া হত না;

কিন্তু কোন প্রাদেশিক সুবাদারের 'নিশান' সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তাঁর পরবর্তী সুবাদারদের শাসনকালে বলবৎ থাকত না। সুজার 'নিশান' অনুযায়ী বার্ষিক তিন হাজার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা আওরঙ্গজেব অনুমোদন করেছিলেন ১৬৯১ সালে। সুতরাং সুজার ক্ষমতাচ্যুতির (১৬৫৮) পরে এই ব্যবস্থার কোন আইনগত মূল্য ছিল না। আরও দুটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। প্রথমতঃ, সুজার 'নিশান' বাউটনকে ব্যক্তিগত অধিকার দিয়েছিল, অথবা কোম্পানীকে বিশেষ অধিকার দিয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু অনিশ্চয়তা আছে। দ্বিতীয়তঃ, সুজার সময়ে কোম্পানীর বাণিজ্যের পরিমাণ খুব কম ছিল, পরে বাণিজ্য প্রসারলাভ করেছিল। সুতরাং যে শুল্ক নিয়ে সুজা সন্তুষ্ট ছিলেন সেটা পরবর্তী কালে মোগল রাজস্বের দিক থেকে পর্যাপ্ত ছিল না।

(২) ১৬৬৪ সালে শিবাজীর সুরাট আক্রমণকালে সেখানকার ইংরেজ এবং ওলন্দাজ বণিকেরা যে সাহস দেখিয়েছিল তার পুরস্কার হিসাবে আওরঙ্গজেব তাদের ক্ষেত্রে শুল্কের হার কমিয়ে শতকরা আড়াই থেকে শতকরা দুই টাকা করেছিলেন। ১৬৭৯ সালে এই সুযোগ প্রত্যাহার করা হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে খৃস্টান বণিকদের স্বাভাবিক হারে (শতকরা আড়াই টাকা হারে) শুল্কের সঙ্গে জিজিয়ার পরিবর্তে অতিরিক্ত শতকরা এক টাকা (অর্থাৎ শতকরা মোট সাড়ে তিন টাকা) দিতে হবে। (১৬৭৯ সালে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল।) এই বর্ধিত হারে শুল্ক কেবলমাত্র সুরাটে নেওয়া হত। ১৬৮০ সালে আওরঙ্গজেব এক 'ফর্মান' জারি করেন যে, যে সকল বাণিজ্য-দ্রব্যের উপর সুরাটে ঐ বর্ধিত হারে শুল্ক আদায় করা হবে সেগুলি দেশের অভ্যন্তরে বিনা শুল্কে ইংরেজেরা বিক্রয় করতে পারবে। ইংরেজেরা দাবি করল যে এই 'ফর্মান' অনুসারে যে সব বাণিজ্যদ্রব্য সুরাট ছাড়া অন্য বন্দরে আমদানি করা হবে (যার উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা শুল্ক দেওয়া হয় নি) সেগুলি তারা দেশের অভ্যন্তরে বিনা শুল্কে বিক্রয় করবে। এই দাবি ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

(৩) মোগল সরকারের কর্মচারীরা বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্যদ্রব্যের উপর নানারকম কর আদায় করত—যেমন 'রাহাদারী', কেরানীর পাওনা, ইত্যাদি। তাদের উপহার ('পেশকাশ') দিতে হত, তাদের 'ফরমায়েস' মত উপহার দিতে হত। সুবাদার এবং ফৌজদার অনেক সময় তাঁদের ইচ্ছামত জিনিস খুব কম দামে কিনে নিতেন তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অথবা বাজারে চড়া দামে বিক্রয় করে লাভবান হবার জন্য। এসব কুপ্রথা মোগল শাসন-পদ্ধতির অঙ্গ ছিল। ইংরেজদের অভিযোগ সত্য হলেও তাদের পক্ষে প্রতিকার লাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ইংরেজদের বাণিজ্যের প্রসার থেকেই প্রমাণিত হয় যে মোগল শাসকদের নানারকম অন্যায় দাবি পূরণ করেও তারা প্রচুর লাভ করত।

* * *

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজদের বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রধান ছিল ওলন্দাজেরা। ফরাসীরা বাংলায় প্রথম কুঠি স্থাপন করেছিল চন্দননগরে (১৬৯০)। ইংরেজদের মধ্যে অনেক বেআইনী অনুপ্রবেশকারী (interlopers) ছিল—যারা এলিজাবেথের সনদ অগ্রাহ্য করে, কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার ভঙ্গ করে, এদেশে বাণিজ্য করত। ভারতীয় বণিকেরাও বাণিজ্যের বড় অংশীদার ছিল। তারা নানাভাবে অর্থোপার্জন করত। নিজ নিজ মূলধন তারা নানারকম পণ্যদ্রব্য কেনা বেচায় বিনিয়োগ করত। তারা মুদ্রাবিনিময়কারী (shroff) হিসাবে কাজ করত। তারা টাকা আমানত নিত, লগ্নী করত। তারা হুণ্ডীর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যের ব্যবস্থা চালু রাখত। তারা ইউরোপীয় বণিকদের দালালী করত, দেশীয় উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে তাদের জন্য পণ্যদ্রব্য কিনত।

বাংলায় ভারতীয় বণিকদের মধ্যে বহিরাগত গুজরাটি এবং রাজস্থানী শ্রেষ্ঠীদের প্রাধান্য ছিল। কোম্পানীর কাগজপত্রে দেখা যায়, ওলন্দাজদের পণ্যদ্রব্য (রেশম ও সুতী বস্ত্র) সরবরাহকারী ১৯ জন প্রধান বণিকের মধ্যে ৯ জন ছিল গুজরাটি। বালেশ্বরের খেমচাঁদ শাহ এবং চিন্তামন শাহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করত। হুগলীর মথুরাদাসের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে। কাশিম বাজারের প্রধান বণিকদের মধ্যে ছিল সুকানন্দ শাহ এবং চতুরমল শাহ। চাঁদ সদাগরের দিন তখন সুখস্মৃতি মাত্র। মোগল শাসনের ফলে উত্তর ভারতের বণিকেরা বাংলায় স্থায়ী আসন দখল করেছিল।

ইংরেজ কোম্পানীর কার্য পরিচালনা সম্বন্ধে দুটি আভ্যন্তরীণ অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রাজার সনদের (Charter) উপর নির্ভরশীল ছিল। কয়েক বৎসর পর পর সনদের নবীকরণ (renewal) করা হত এবং নানারকম সর্ত আরোপ করা হত। এই ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে কোম্পানীর ভাগ্য জড়িত হয়ে পড়ত। প্রথম চার্লসের সনদ নিয়ে আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী গঠিত হয়েছিল। এর নাম ছিল Courten's Association বা Assada Merchants। প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ডের (১৬৪৯) পর প্রজাতন্ত্র (Commonwealth) শাসনকালে পার্লামেণ্টের নির্দেশে দুটি কোম্পানীর সংযুক্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে (১৬৮৯-১৭০২) আর একটি কোম্পানী (New East India Company) স্থাপিত হয়। দুটি রাজনৈতিক দলের (Whig এবং Tory) প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুই কোম্পানীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করত। দুই কোম্পানীর মধ্যে ঝগড়ার ফলে ভারতে তাদের কর্মচারীদের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছিল। ১৭০২ সালে ইংলণ্ডে দুই কোম্পানীর সংযুক্তির প্রাথমিক ব্যবস্থা করা হয়। এই

ব্যবস্থা পাকাপাকি হল ১৭০৮ সালে। দুই কোম্পানীর সংযুক্তির ফলে United Company গঠিত হল। এই শক্তিশালী কোম্পানীর পরিচালনায় ভারতে ইংরেজদের বাণিজ্য ও রাজনৈতিক স্বার্থ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে কোম্পানীর বাণিজ্য পরিচালনার জন্য কোন কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা ছিল না। প্রথমে কর্তৃত্ব ছিল জাভার অন্তর্গত বানটামে অবস্থিত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের হাতে। তারপর ক্রমশঃ সুরাট, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিভিন্ন সময়ে 'প্রেসিডেন্সী' রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। 'প্রেসিডেন্সী' (Presidency) শব্দের অর্থ একজন 'প্রেসিডেণ্ট' (President) এবং কয়েকজন সদস্য দ্বারা গঠিত একটি 'কাউন্সিল' (Council) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল। এই নিয়ন্ত্রণ বাণিজ্য, রাজনৈতিক ব্যাপার এবং যুদ্ধ—সকল বিষয়েই প্রযোজ্য ছিল। প্রেসিডেণ্ট সাধারণতঃ 'গভর্নর' আখ্যায় পরিচিত হতেন। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীর গভর্নর ও কাউন্সিল স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করতেন, বিভিন্ন প্রেসিডেন্সীর মধ্যে কোন আইনগত যোগাযোগ ছিল না। সকল প্রেসিডেন্সীই কোম্পানীর লণ্ডনস্থ কর্তৃপক্ষের, অর্থাৎ 'ডিরেক্টর সভার' (Court of Directors), কর্তৃত্বাধীন ছিল। ডিরেক্টরদের নির্বাচন করত কোম্পানীর অংশীদারেরা। আর একটি সভা ছিল, তার নাম 'অংশীদার সভা' (Court of Proprietors)। এই সভার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। ডিরেক্টর সভার কর্তৃত্বও অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর হত না, কারণ লণ্ডন থেকে ভারতে চিঠি পৌঁছাতে কয়েক মাস সময় লাগত, গভর্নর ও কাউন্সিল সাময়িক প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করতেন। ইংলণ্ডের রাজা ও মন্ত্রীদের ডিরেক্টর সভার উপর কোন প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ছিল না, তবে সনদ নবীকরণের সময় তাঁরা কোম্পানীর অধিকার প্রসারিত বা সংকুচিত করতে পারতেন।

বাংলায় কোম্পানীর কুঠিগুলি দীর্ঘকাল মাদ্রাজের গভর্নর ও কাউন্সিলের কর্তৃত্বাধীন ছিল। স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী রূপে বাংলা স্বীকৃতি লাভ করে ১৭০০ সালে। তখন কোম্পানী কলকাতায় জমিদারী স্বত্ব লাভ করেছে, 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গের নির্মাণকার্য সুরু হয়েছে। নতুন প্রেসিডেন্সীর নাম হল 'বাংলায় ফোর্ট উইলিয়ম' (Fort William in Bengal)। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর তুলনায় বাংলা প্রেসিডেন্সী অধিকতর গুরুত্ব লাভ করল দীর্ঘকাল পরে—১৭৭৩ সালে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ 'নিয়ন্ত্রণ আইন' (Regulating Act) অনুসারে।

ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংরেজদের শক্তির প্রধান উৎস ছিল নৌবল। এই নৌবল তারা ব্যবহার করত প্রধানতঃ বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের (পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী) বিরুদ্ধে। প্রয়োজন হলে মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধেও নৌবল ব্যবহার করতে তারা সংকুচিত হত না। তাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি (সুরাট, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা) বন্দর হিসাবে ব্যবহার করার

পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। বোম্বাইর উপযোগিতা ছিল সব চেয়ে বেশি, কারণ এটি ছিল মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ এবং মোগল সাম্রাজ্যের সীমার বাইরে। এখানে ইংলণ্ডের রাজার সার্বভৌম অধিকার (sovereignty) ছিল, এখানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন বা দুর্গ নির্মাণ মোগল সরকারের অনুমতিসাপেক্ষ ছিল না। সপ্তদশ শতকের সত্তরের দশকে ইংরেজরা বোম্বাইকে ভারতের মধ্যে সর্বাধিক সুরক্ষিত বন্দরে পরিণত করেছিল এবং এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল ষাট হাজার।

মোগল সম্রাটেরা রাজ্যবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন—কেবল ভারতে নয়, তাঁদের পিতৃভূমি মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু নৌবল সম্বন্ধে তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না; আরব সাগরে, ভারত মহাসাগরে এবং বঙ্গোপসাগরে ইউরোপীয় বণিকদের আধিপত্য স্থাপনের সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন ছিলেন। জলপথে মক্কাযাত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তাঁরা পর্তুগীজ ও ইংরেজদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করতেন।

ইংরজেরা মোগল সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল বলেই তারা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সাহস করেছিল। জলপথে হুগলীর সঙ্গে তারা মাদ্রাজের যোগাযোগ রক্ষা করত, মোগল শাসকেরা তাতে বাধা দিতে পারত না। জোব চার্নক বাংলা থেকে মাদ্রাজে গিয়ে বাংলায় যুদ্ধের পরিণতির উপর দৃষ্টি রেখেছিলেন। সুরাটে এবং বোম্বাই অঞ্চলে ইংরেজদের নৌবল আওরঙ্গজেবকে বিব্রত করেছিল। শেষ জীবনেও তাঁর দৃষ্টি স্থলযুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির প্রতি নিবদ্ধ ছিল, নৌবল সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন নি।

২। কলকাতা

জোব চার্নকের সুতানুটিতে আগমনের (২৪ আগস্ট ১৬৯০) পূর্ববর্তী কালে কলকাতার ইতিহাস এবং কলকাতা নামের অর্থ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা চলছে।[১] কিন্তু ইতিহাসের মঞ্চে কলকাতার প্রবেশ ঐ তারিখেই ঘটেছিল।

বাংলায় সামরিক দিক থেকে সুরক্ষিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইংরেজেরা ১৬৯০ সালের আগেই অনুভব করেছিল। হুগলীতে মোগল রাজকর্মচারীদের আইনসঙ্গত এবং বেআইনী নানারকম কাজকর্মে তাদের অবস্থা অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। হেজেস সাগর দ্বীপে সুরক্ষিত বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। চট্টগ্রাম দখলের চেষ্টা সফল হয় নি, হলেও গাঙ্গেয় অঞ্চল থেকে বহু দূরে অবস্থিত ঐ বন্দর বাণিজ্যের দিক থেকে ইংরেজদের পক্ষে সুবিধাজনক হত না। বিহারে পাটনায় তাদের একটি প্রধান কুঠি ছিল, জোব চার্নক কয়েক বৎসর এখানে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। কাশিম বাজারে এবং

১। এই অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বালেশ্বরে তাদের কুঠি ছিল। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যায় কোম্পানীর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য হুগলীর কাছাকাছি কোন নতুন কেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজন ছিল। শায়েস্তা খাঁ উলুবেড়িয়ায় কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের অনুমতি দিয়ে পরে তা' প্রত্যাহার করেন। সাগর দ্বীপ ওলন্দাজ ও ফরাসীদের আক্রমণে বিপন্ন হতে পারত। তা' ছাড়া দ্বীপটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সুবিধাজনক ছিল না। উলুবেড়িয়া পশ্চিম দিক থেকে স্থলপথে মোগল সৈন্যদল কর্তৃক আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। হিজলি মোগল সৈন্যদলের আক্রমণের আওতার বাইরে ছিল না, তা' ছাড়া জায়গাটি ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছিল। সুতানুটি ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গা ; পশ্চিমে গঙ্গা, দক্ষিণে আদি গঙ্গা, পূর্বে জলাভূমি—মোটা-মুটিভাবে মোগল স্থলবাহিনীর পক্ষে দুর্গম। বর্তমানে যেখানে কলকাতা বন্দর সেখানে গঙ্গার গভীরতা লক্ষ্য করে পর্তুগীজেরা ১৫৩০ সাল থেকে সেখানে তাদের জাহাজ রাখত। সপ্তদশ শতকের শেষেও জোয়ারের সময় বড় বড় জাহাজ গঙ্গার এই অংশে প্রবেশ করতে পারত।

ইউল (Yule) বলেছেন, ১৬৭৫ সালে সুতানুটি (Chuttanuttee) এবং গোবিন্দপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়, কলকাতার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬৮৮ সালে। সম্ভবতঃ নতুন বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের ব্যাপারে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী এই অঞ্চলের উপযোগিতা ১৬৯০ সালের আগেই ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৬৮৬ সালে, মোগলদের হুগলী আক্রমণকালে, জোব চার্নক সুতানুটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৬৮৭ সালে তিনি আবার সেখানে এসে-ছিলেন এবং সেখানে কুঠি স্থাপনের উদ্যোগ করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানী তাঁকে পদচ্যুত করে কাপ্তেন হীথকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করল। চট্টগ্রাম অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টার পর জোব চার্নক এবং হীথ মাদ্রাজে চলে গেলেন (১৬৮৯)। সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর আহ্বানে জোব চার্নক বাংলায় প্রত্যাবর্তন করলেন, মোগল সরকারের থাবার মধ্যে হুগলীতে না গিয়ে তাঁর 'মধ্যাহ্নের বিশ্রামস্থল' ('Midday halt') রূপে নির্বাচন করলেন সুতানুটি। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি ভারতের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। কিন্তু হুগলীর বাইরে সুরক্ষিত বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন তাঁর মৌলিক চিন্তার ফল নয় ; স্থান নির্বাচনে তিনি অন্যের চিন্তা দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তা' বলা যায় না।[২]

জঙ্গলাকীর্ণ, বৃষ্টিপ্লাবিত সুতানুটিতে ভবিষ্যতের বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্ম হল। কয়েকমাস পরে (১০ ফেব্রুয়ারী ১৬৯১) আওরঙ্গজেবের হুকুমে বাংলায় ইংরেজের বাণিজ্যের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হল। নতুন বাণিজ্যকেন্দ্রের

২। 'The idea was not the discovery of an individual mind, it was the common thought of the English in Bengal'.

শ্রীবৃদ্ধির সূচনা হতে না হতেই জোষ চার্নকের মৃত্যু হল (জানুয়ারী ১৬৯৩)।

শক্তিশালী মোগল সরকারের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে ইংরেজেরা গঙ্গার পশ্চিম তীর থেকে পূর্ব তীরে সরে এসে সুতানুটিতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু বিপদ দেখা দিল অন্য দিক থেকে—মোগল সরকারের দুর্বলতার ফলে। এই বিপদের ফলে বাংলায় কোম্পানীর সামরিক শক্তির ভিত্তি স্থাপনের অভাবিত সুযোগ পাওয়া গেল। আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের শেষ দিকে নানা কারণে উত্তর ভারতে বাদশাহী শাসনের কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছিল। ইংরেজদের বন্ধু সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ (১৬৮৯-৯৮) যুদ্ধে এবং শাসনকার্যে অপটু ছিলেন। মেদিনীপুরের অন্তর্গত চেতো-বরদার জমিদার শোভা সিংহ ১৬৯৫-৯৬ সালে তাঁর প্রতিবেশীদের এলাকা লুণ্ঠন করেন। তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে বর্ধমানের ইজারাদার রাজা কৃষ্ণরাম নিহত হন। (তিনি ছিলেন পাঞ্জাবী ক্ষত্রী। মোগল আমলে উত্তর ভারত থেকে বাংলায় এসে যাঁরা ঐশ্বর্য ও ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন।) শোভা সিংহ বর্ধমান শহর এবং মৃত শত্রুর ধনরত্ন অধিকার করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেন এবং 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করলেন। তাঁর লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি বেড়ে গেল। তাঁর সহযোগী হলেন উড়িষ্যার আফগান-নায়ক রহিম খাঁ। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম পালিয়ে গিয়ে ঢাকায় ইব্রাহিম খাঁকে সংবাদ দিলেন, কিন্তু অলস সুবাদার বিদ্রোহ দমনের জন্য কড়া ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি এক ফৌজদারকে পাঠালেন শোভা সিংহের বিরুদ্ধে। ফৌজদার হুগলীর দুর্গে বসে থাকলেন; কিছুদিন পরে শোভা সিংহ হুগলী আক্রমণ করায় তিনি পলায়ন করলেন। ওলন্দাজ বণিকেরা শোভা সিংহকে হুগলী থেকে তাড়িয়ে দিল, কিন্তু হুগলী-চুঁচুড়া অঞ্চলে বিস্তৃত এলাকায় তার লুটপাট অব্যাহত থাকল। অল্প দিনের মধ্যেই কৃষ্ণরামের কন্যার সম্মান হানি করতে গিয়ে শোভা সিংহ তাঁর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন। তখন তাঁর সৈন্যদের নায়ক হলেন রহিম খাঁ। তিনি 'শাহ' উপাধি ধারণ করে, ১০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৬০,০০০ পদাতিক সৈন্য নিয়ে নদীয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন। মুখসুদাবাদ (পরবর্তী কালের মুর্শিদাবাদ) অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হল, বাণিজ্যকেন্দ্র কাশিম বাজার থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হল, ক্রমে রাজমহল ও মালদহ দখল করা হল (১৬৯৭)।

সুদূর দাক্ষিণাত্যে এই সব ঘটনার খবর পেয়ে আওরঙ্গজেব অপদার্থ ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করলেন। নতুন সুবাদার নিযুক্ত হলেন সম্রাটের পৌত্র আজিম-উশ-শান। ১৬৯৭ সালের শেষদিকে তিনি বর্ধমানে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম খাঁর পুত্র রহিম খাঁকে বারবার পরাজিত করে তাঁকে মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোনার জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিলেন। কিছুকাল পরে

আজিম-উশ-শানের প্রেরিত সৈন্যদল রহিম খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে (১৬৯৮)।

বাংলায় ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপনের ইতিহাসে শোভা সিংহ এবং রহিম খাঁর বিদ্রোহ (১৬৯৫-৯৮) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হুগলী-চুঁচুড়া অঞ্চলে মোগল-শাসন বিপর্যস্ত হবার ফলে চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ, চন্দননগরে ফরাসী এবং সুতানুটিতে ইংরেজ বণিকেরা বিপন্ন হল। তারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য ইব্রাহিম খাঁর অনুমতি প্রার্থনা করল। সুবাদারের দায়িত্ব পালনে অক্ষম ইব্রাহিম খাঁ অনুমতি দিলেন। এই অনুমতির সুযোগ নিয়ে তারা নিজ নিজ এলাকায় দুর্গ নির্মাণের প্রাথমিক ব্যবস্থা করল। চুঁচুড়ায় সুদৃঢ় প্রাচীর (ramparts) নির্মিত হল। চন্দননগরে মার্টিন (Francois Martin) একটি ছোট দুর্গ (Fort D' Orleans) নির্মাণ করলেন (১৬৯৬—৯৭)। কলকাতায় ইংরেজেরা তাদের কুঠির চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ করল, প্রাচীরের উপরে কামান রাখার ব্যবস্থা হল, বাঁশের তৈরী যে গুদামে মালপত্র রাখা হত তার বদলে মাটি ও ইটে তৈরী ঘর তৈরী হল। এই সুরক্ষিত স্থানটির নাম দেওয়া হল 'ফোর্ট উইলিয়ম' (Fort William)। তখন ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় উইলিয়ম। পরে ক্রমে ক্রমে এই দুর্গের সম্প্রসারণ ও দৃঢ়ীকরণ ঘটেছিল। বাংলার সুবাদার বিদ্রোহ দমনে অক্ষম না হলে বিদেশী বণিকদের পক্ষে বাংলার মাটিতে তাদের সামরিক শক্তির গোড়াপত্তন করার সুযোগ মিলত না। ভাগ্য মোগলের দুর্বলতার রূপ ধরে ইংরেজকে রাজ্যাভিষেকের পথে এগিয়ে দিল।

*　　　　*　　　　*

সুতানুটিতে পাকাপাকি ভাবে বসার পর ইংরেজেরা একটা অসুবিধায় পড়ল। সুতানুটির লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল; বিভিন্ন জাতির লোক এখানে বসতি স্থাপন করে বাণিজ্যের সুযোগ নিতে আরম্ভ করল। শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা, রাস্তা-ঘাট-বাজার প্রভৃতি তৈরী করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা—এসব কাজের দায়িত্ব নিতে হল কুঠির কর্তৃপক্ষকে, কারণ নবাবের শাসন এই অঞ্চলে প্রসারিত হয় নি। কিন্তু এসব কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় মানুষদের উপর কোন রকম কর স্থাপনের অধিকার কোম্পানীর ছিল না। ইংরেজদের মনে হল, সুতানুটির সংলগ্ন দুটি 'শহরের' ('towns')—অর্থাৎ গ্রামের—স্বত্ব স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে যদি পাওয়া যায় তবে ওখানকার খাজনা থেকে বাৎসরিক দু'হাজার বা আড়াই হাজার টাকা আদায় হতে পারে। 'শহর' দুটির নাম ডিহি কলকাতা ও গোবিন্দপুর। জমিদার কোম্পানীকে জমি দিতে রাজি হলেন না; তাঁর আশংকা হল, জমি একবার ইংরেজদের দিলে তিনি আর কখনও ফেরৎ পাবেন না। বিদেশীদের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিনি যে কোন দেশী লোককে জমি দিতে সম্মত হলেন—কোম্পানীর ব্যবহারের জন্য। এই ব্যবস্থা ইংরেজদের মনঃপূত হল না। তারা সুবাদার আজিম-উশ-শানের দ্বারস্থ

হল। ষোল লক্ষ টাকা উপহার নিয়ে তিনি এক 'নিশান' দিলেন: কোম্পানী সুতানুটি (উত্তরে), কলকাতা (মধ্যস্থলে) এবং গোবিন্দপুর (দক্ষিণে)—এই তিনটি গ্রাম স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে কিনতে পারবে। দলিলের মাধ্যমে বিক্রয়কার্য সম্পন্ন হল ১৬৯৮ সালের ৯ নভেম্বর। জমিদারদের লাভ হল দেড় হাজার টাকা। সুবাদারকে প্রদত্ত উপহার যোগ করলে কোম্পানীর মোট খরচ হল ১৭,৫০০ টাকা। জোব চার্নকের মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে সুতানুটির সঙ্গে আরো দুটি 'শহর' যুক্ত হয়ে ভবিষ্যতের মহানগরী দক্ষিণে অনেকটা প্রসারিত হল।

মোগল আমলের রাজস্ব-ব্যবস্থার নীতি অনুযায়ী কোম্পানী তিনটি 'শহরে' তালুকদারী স্বত্ব পেয়েছিল, জমিদারী স্বত্ব নয়। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের দিকে নবাবী প্রশাসনের দৃষ্টি না থাকায় কোম্পানীর পক্ষে এখানে জমিদারী ক্ষমতা পরিচালনার সুযোগ উপস্থিত হল। ১৭০০ সালে কলকাতা কাউন্সিলে একজন অতিরিক্ত সভ্য নিয়োগ করা হল এবং তাঁকে 'জমিদার' আখ্যা দেওয়া হল। তাঁর কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য 'কালো জমিদার' ('Black Zamindar') নামে পরিচিত একজন 'নেটিভ' কর্মচারী থাকল। স্থানীয় লোকদের পাট্টা দিয়ে জমি বিলি করার ব্যবস্থা হল। ইংরেজ 'জমিদার' শান্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করলেন, ছোট-খাট ফৌজদারী মামলায় এবং জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে বিচারকের দায়িত্ব নিলেন। এভাবে এক বেআইনী জমিদারী ব্যবস্থা গড়ে উঠল। মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলার দেওয়ান ছিলেন (১৭০০—১৭০৭) তখন এদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি।

তিনটি 'শহর' একত্রিত হয়ে একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং প্রশাসন-কেন্দ্র গঠিত হল; তার নাম হল কলকাতা। ১৭০৭ সালে এর আয়তন ছিল মোটামুটি ৫০৭৭ বিঘা (১৬৯২ একর)। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য 'শহর'টিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল: (১) বড় বাজার; (২) 'শহর' কলকাতা; (৩) সুতানুটি; (৪) গোবিন্দপুর। তিনটি 'শহরের' বাসিন্দাদের কাছ থেকে কোম্পানীর আনুমানিক আয় ছিল: (১) ডিহি কলকাতা, ৪৬৮-৯-৯ টাকা; (২) সুতানুটি ৫০১-১৫-৬ টাকা; (৩) গোবিন্দপুর, ২২৪-৫-২ টাকা। প্রজারা প্রতি বিঘায় তিন টাকা খাজনা দিত। তা' ছাড়া ছিল নানা রকম কর—বিক্রয় কর, আমদানি-রপ্তানি কর, বৃত্তি কর, ইত্যাদি। অপরাধীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হত, তাতেও কিছু আয় হত।

ফররুখসিয়রের 'ফর্মান' (১৭১৭) অনুযায়ী কোম্পানী কলকাতার সংলগ্ন ৩৮টি গ্রামের তালুকদারী স্বত্ব স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে কিনে নিতে পারত, কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর আপত্তিতে সেটা সম্ভব হয় নি।

বর্গীর হাঙ্গামার গোড়ার দিকে 'মারাঠা খাল' (Maratha Ditch) খনন করা হয়। এই সময় বাইরের অনেক লোক কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এটা কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ। ১৭০৪ সালে জনসংখ্যা

ছিল ১৫,০০০; ১৭৫০ সালে ছিল এক লাখের বেশি। কলকাতার আয়তনও বেড়ে যাচ্ছিল। ১৭৪৬ সালে মারাঠা খালের বাইরে কয়েকটি এলাকা (বেনিয়াপুকুর, পাগলাডাঙ্গা, টেংরা ইত্যাদি) স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে খাজনার বন্দোবস্ত করে অধিকার করা হয়। এই এলাকার নাম হল 'জান নগর' (John Nagar)। ১৭৫৪ সালে ২২৮১ টাকা খাজনায় সিমুলিয়া অঞ্চল দখল করা হয়। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা অধিকার করেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই (জানুয়ারী ১৭৫৭) ইংরেজেরা কলকাতা পুনরায় দখল করে। তখন কোম্পানী নবাবের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে কলকাতাকে বিজিত স্থান বলে দাবি করতে পারত, কিন্তু সেটা করা হয় নি। পলাশীর যুদ্ধের পরে, ১৭৫৮ সালে, নবাব মীর জাফর কলকাতার সমস্ত জমি করমুক্ত করে কোম্পানীকে দান করেন। তখন এই জমির রাজস্ব ছিল ৮৮৩৬ টাকা। ১৬৯৮ সাল থেকে কোম্পানী জমিদারদের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে আসছিল। এবার নবাবের দানে (grant) কলকাতায় কোম্পানীর লাখেরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, কোম্পানী প্রকৃত অর্থে জমিদার হল। এই ব্যবস্থার ফলে বাস্তব পরিবর্তন কিছু হল না, কিন্তু বাদশাহী আইনের দিক থেকে এর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।[৩]

আইনতঃ জমিদারী স্বত্ব লাভের অনেক আগেই কলকাতায় কোম্পানী যে প্রশাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তাতে সার্বভৌম ক্ষমতার (sovereignty) ছোঁয়াচ ছিল। আদালত (Court of Cutcherry) স্থাপিত হয়েছিল সম্ভবতঃ ১৭০৪ সালে। এখানে বিচারক ছিলেন কোম্পানীর কাউন্সিলের সদস্য 'জমিদার'; বিচার হত মোগল আইন অনুসারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় 'জমিদারের' রায়ের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট এবং কাউন্সিলের কাছে আপীল করার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন সময়ে আরও তিনটি আদালত স্থাপিত হয়েছিল (Mayor's Court, Court of Record, Court of Request)। এগুলির ভিত্তি ছিল ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জের (George II) দুটি সনদ (১৭২৬,১৭৫৩)। কলকাতার বিচার-ব্যবস্থায় নবাব বা তাঁর কর্মচারীদের কোন স্থান ছিল না।

কলকাতায় ইংরেজদের সার্বভৌম অধিকার প্রসঙ্গে নবাব সুজাউদ্দীনের আমলের দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। খাজা নজর নামে এক আর্মেনীয় বণিক নবাবের অধিকারভুক্ত এলাকা থেকে পালিয়ে এসে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিল। নবাবী ফৌজ তাকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, ইংরেজেরা বাধা দিয়েছিল। শেষে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার মীমাংসা হয়েছিল। গুর বক্স নামে মুর্শিদাবাদের এক বণিক ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে কলকাতায় এসেছিল। ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে মারামারিতে

৩। জেমস গ্রান্টের মতে মীর জাফরের ব্যবস্থা ছিল 'a constitutional formal instrument under the royal dewanny authority, descriptive of lakharaji, or rent-free tenure of the lands and villages in question'.

তাঁর লোকজনের মধ্যে ছয় জন প্রাণ হারায়। ইংরেজেরা গুরু বক্সকে নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিতে অস্বীকার করে। গুরু বক্স কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়াতে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল। খাজা নজর এবং গুরু বক্স কলকাতার বাসিন্দা ছিল না, তাদের উপর কোম্পানীর কোন রকম কর্তৃত্বের দাবি ছিল না। তখন কোম্পানী ছিল কলকাতায় তালুকদার। কোন তালুকদার, এমন কি কোন জমিদার, নবাবের অধিকার অগ্রাহ্য করে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে পারত না কেবলমাত্র সার্বভৌম শক্তিরই এই অধিকার ছিল। ছোটখাট ব্যাপারের আইনগত গুরুত্ব এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করার শক্তি নবাবী দরবারের ছিল না। দুর্গম এলাকায় বিদেশীরা যা' চায় তাই করুক, বেশি কিছু গোলমাল না করলেই হল—এটাই ছিল নবাবদের রীতি।

৩। ফররুখসিয়রের 'ফর্মান'

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে ইংরেজেরা বার্ষিক তিন হাজার টাকা শুল্ক দিয়ে বাংলায় বাণিজ্য করত। পাদশাহী মসনদের জন্য তাঁর পুত্রদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। তখন ইংরেজদের ভয় হল যে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে তাদের বাণিজ্য ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে। তারা ফোর্ট উইলিয়ম রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা করল। তারা মোগল কর্মচারীদের হুমকি দিয়ে জানাল, তাদের পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত হলে তারা হুগলী লুণ্ঠন করে ক্ষতি পূরণ করবে। নতুন সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ তারা যে অধিকার ভোগ করছিল সেটা মেনে নিলেন। এই ব্যবস্থায় তাদের খুব সুবিধা হল না, কারণ নবাবের কর্মচারীদের নানা রকম দাবি মেটাতে গিয়ে তাদের আর্থিক ক্ষতি হত এবং কাজকর্মে বাধা পড়ত। তা' ছাড়া তারা বাণিজ্য প্রসারের জন্য নতুন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাদের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল: প্রয়োজন মত নবাব সরকারের বিরোধিতা করার জন্য সামরিক বল বৃদ্ধি করা। এজন্য যে সৈন্যদল পোষণ করা আবশ্যক তার ব্যয়নির্বাহের জন্য জমিদারীর আয় বাড়াতে হবে, কারণ বাণিজ্যের মুনাফা তারা এজন্য খরচ করতে প্রস্তুত ছিল না। জমিদারীর আয় বাড়াবার একমাত্র উপায় ছিল কলকাতার সংলগ্ন কয়েকটি নতুন গ্রামের জমিদারী স্বত্ব সংগ্রহ করা।

একটি সুস্পষ্ট বাদশাহী 'ফর্মান' আদায় করে কোম্পানীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল ১৭০৮ সালে। ১৭১৩ সালে ফররুখসিয়র দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। তিনি যখন তাঁর পিতা আজিম-উশ-শানের প্রতিনিধি রূপে বাংলার শাসন পরিচালনা করতেন তখন তিনি ইংরেজদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর সহানুভূতি লাভের আশায় কলকাতা থেকে কোম্পানীর কয়েকজন প্রতিনিধি ১৭১৩ সালে দিল্লীতে উপস্থিত হলেন (Surman Embassy)। তাঁদের নেতা ছিলেন জন সুরমান (John Surman)। তাঁর সহকারী ছিলেন

তিন জন। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গেলেন প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন এবং নগদ প্রায় ত্রিশ হাজার পাউন্ড। সেখানে ভাগ্য কোম্পানীর প্রতি সুপ্রসন্ন হল। প্রতিনিধিদের সঙ্গী উইলিয়ম হ্যামিলটন (William Hamilton) নামক এক ডাক্তার ফররুখসিয়রকে কঠিন ব্যাধি থেকে আরোগ্য করলেন। ১৭১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর বাংলা, হায়দরাবাদ এবং আহম্মদাবাদের সুবাদারদের উদ্দেশ্যে তিনটি বাদশাহী 'ফর্মান' প্রস্তুত হল। এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল একটি পৃথক বাদশাহী নির্দেশ (হাসুব-উল-হুকুম)।

এই দুটি দলিল বাংলায় ইংরেজের বাণিজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করল। বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিয়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পাকা হয়ে গেল। কলকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুরের খাজনা ধার্য হল ১১৯৫—৬—০ টাকা। সুবাদারের সম্মতি নিয়ে কলকাতার সংলগ্ন ৩৮টি গ্রাম বার্ষিক ৪১২১—৮—০ টাকা খাজনায় স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে নেবার অধিকার কোম্পানীকে দেওয়া হল। মাদ্রাজে কোম্পানীর টাঁকশালে প্রস্তুত টাকা সম মূল্যে বাংলায় চালু থাকবে। তা'ছাড়া মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে কোম্পানীর নিজস্ব স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করার অধিকার থাকবে। কোম্পানীর কোন কুঠির প্রধান কর্মচারীর কাছ থেকে 'দস্তক' (অনুমতি পত্র) নিয়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করা চলবে। ইংরেজের জাহাজ ঝড়ে বিপন্ন হলে মোগল রাজকর্মচারীরা সেগুলি বাজেয়াপ্ত করবে না, বরং তাদের সাহায্য করবে। ইউরোপীয় অথবা এদেশী কোন লোক কোম্পানীর কাছে ঋণী থাকলে তাকে সংশ্লিষ্ট ইংরেজ কুঠির প্রধান কর্মচারীর কাছে দেওয়া হবে—অর্থাৎ তার বিচার নবাব সরকার করবে না, তার পাওনাদার করবে।

মুর্শিদকুলি খাঁ প্রকাশ্যে বাদশাহী 'ফর্মান' অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, কিন্তু তিনি পরোক্ষভাবে ইংরেজদের কাজকর্মে বাধা দিলেন। কলকাতার সংলগ্ন ৩৮টি গ্রাম কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হল না, কারণ নবাবের নির্দেশে জমিদারেরা ঐ গ্রামগুলি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলেন। বিনা শুল্কে বাণিজ্য সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হল। ইংরেজেরা দাবি করল, কোম্পানীর এই বিশেষ সুবিধা বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এবিষয়ে 'ফর্মানে' কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। মুর্শিদকুলি বললেন, এটা শুধু বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য, অন্তর্বাণিজ্যে কোম্পানীকে অন্যান্য বণিকদের মত নিয়মিত শুল্ক দিতে হবে। কোম্পানীর দাবি মেনে নিলে নবাবের রাজকোষ এবং ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশী ও বিদেশী বণিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে কোম্পানীর মুদ্রা তৈরীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে জগৎশেঠ প্রবল বিরোধিতা করলেন, কারণ বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রার বিনিময় হার থেকে তিনি প্রচুর লাভ করতেন—নতুন ব্যবস্থা তাঁর পক্ষে ক্ষতির কারণ হত।

বাদশাহী 'ফর্মান' ইংরেজদের যে ঢালাও সুবিধা দিয়েছিল সেটা তারা

সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারল না। কিন্তু তারা নানা ভাবে নবাবী ব্যবস্থা বানচাল করতে লাগল। কোম্পানীর নামে ৩৮টি গ্রাম দখল করা সম্ভব হল না বটে, কিন্তু ইংরেজদের অনুগত দেশী মানুষ কয়েকটি গ্রাম ক্রয় করল এবং কোম্পানী বেনামীতে ঐ এলাকায় আধিপত্য প্রসার করল। গ্রামগুলির খাজনা থেকে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি হল। গ্রামগুলির অবস্থান হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে থাকায় সামরিক দিক থেকে কলকাতা আগের চেয়ে বেশি সুরক্ষিত হল। মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ব্যবহার করে কোম্পানীর কিছু আর্থিক লাভ হল তবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শুল্ক আদায়ের প্রশ্নের কোন মীমাংসা হল না।

ক্রমশঃ কোম্পানীর বাণিজ্য প্রসারিত হল। ১৭১৭ সালে কোম্পানীর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৭৮০০০ পাউণ্ড, ১৭২৮ সালে ৩৬৩,০০০ পাউণ্ড। কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি হল। ইংরেজের পতাকার আশ্রয়ে বাণিজ্যের সুযোগ মিলবে, এই আশায় বিভিন্ন জাতির বহু বণিক—পর্তুগীজ, আর্মেনীয়, পারস্যদেশীয়, ভারতীয় হিন্দু—এই বন্দরে উপস্থিত হল। ইংরেজের শাসন কঠোর ছিল না, এখানে যে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ছিল সেটা নবাবের শাসিত অঞ্চলে ছিল না। তাই সাধারণ মানুষ এখানে ভিড় করতে লাগল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় এই ভিড় বেড়ে গেল।

মুর্শিদকুলি খাঁ জানতেন, বাংলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন। তাই তিনি এব্যাপারে মোটামুটি উদার নীতি প্রয়োগ করতেন—যদিও তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ভোগ করত পারস্যদেশীয় বণিকেরা। ইংরেজদের ক্ষমতাবৃদ্ধি রোধ করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি সতর্ক ছিলেন, কারণ বাংলায় বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির (ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, দিনেমার, অস্ট্রিয়ান, পোলিশ, সুইডিস), বণিকদের মধ্যে তারাই ছিল প্রধান। ফররুখসিয়রের 'ফর্মান' তাদের যে অধিকার দিয়েছিল তার সঙ্গে তুলনীয় অধিকার অন্য কোন বিদেশী বণিকের ছিল না। কলকাতার দুর্গ ক্রমশঃ তাদের সামরিক শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠছিল।

ইংরেজদের বাণিজ্য সম্বন্ধে সুজাউদ্দীন মুর্শিদকুলির নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। ইংরেজদের মতে তিনি ছিলেন 'হঠকারী এবং শক্তিশালী' সুবাদার ('rash and powerful subah'); কিন্তু তারা তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে লিপ্ত হতে সাহস করত না, কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল যে তাতে ফরাসী এবং ওলন্দাজ বণিকদের সুবিধা হবে। নবাব নানা অজুহাতে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন, ফরাসী এবং ওলন্দাজ বণিকেরাও রেহাই পেত না। তারা দিল্লীর বাদশাহী দরবার থেকে তাদের পক্ষে সুবিধাজনক নতুন নির্দেশ (হাসুব-উল-হুকুম) আনাবার জন্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হয় নি।

বাদশাহের এক মন্ত্রীর কাছে লিখিত এক পত্রে সুজাউদ্দীন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগগুলি উল্লেখ করেছিলেন। তারা বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের জন্য জমি নিয়ে সেখানে সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেছে। তারা বহু ব্যবসায়ী এবং

অন্যান্য মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে সেখানে নিয়ে গেছে। এখন তাদের কাছ থেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করছে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ওদের পণ্যদ্রব্যের জন্য মাত্র তিনটি জাহাজ ব্যবহৃত হত। তার পরে তাদের বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছে। তারা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বাদশাহের অনেক প্রজাকে ধরে নিয়ে দাস-দাসী রূপে বিক্রয় করছে। তারা নতুন 'শহর' (৩৮ টি গ্রাম) দখল করার চেষ্টা করছে। এগুলি সুরক্ষিত স্থানে ('strongholds') পরিণত হলে পরে নবাব সরকারের পক্ষে তাদের তাড়ানো কঠিন হবে।

ইংরেজেরা 'ফর্মানের' অজুহাতে সকল রকম পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দাবি করত। সুজাউদ্দীন মনে করতেন, যে সব পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করা হয় কেবলমাত্র সেইগুলিই এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কোম্পানীর অন্তর্বাণিজ্য শুল্ক থেকে মুক্ত থাকবে, এটা তিনি স্বীকার করতেন না। কোম্পানীর কর্তারা 'দস্তকের' অপব্যবহার করত। 'দস্তক' নিয়ে এদেশী বণিকেরা এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য চালাত—নবাবের প্রাপ্য শুল্ক না দিয়ে। বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ক্রমশঃ বিদেশী বণিকদের কুক্ষিগত হচ্ছিল। সুজাউদ্দীন এই ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টা করেন নি। তিনি হুমকি দিয়ে এবং সাময়িক বাধা দিয়ে ইংরেজদের সংযত রাখার চেষ্টা করতেন, মাঝে মাঝে কিছু টাকা পেলেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

বাংলায় ইংরেজদের বিপজ্জনক অগ্রগতির জন্য মূলতঃ দায়ী আওরঙ্গজেব এবং ফররুখসিয়র। তাঁদের নির্দেশই কোম্পানীকে এমন সুবিধা দিয়েছিল যা' মুসলমানেরাও ভোগ করত না। প্রভুভক্ত মুর্শিদকুলি খাঁর পক্ষে পাদশাহী নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না। সুজাউদ্দীন সেটা করতে পারতেন, ইংরেজদের সমূলে উৎখাত করাও হয়তো তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল না—কারণ তখন বাংলায় দিল্লীর শক্তিহীন বাদশাহের কোন রকম কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু মোগলের ছায়া বাংলাকে আচ্ছন্ন রেখেছিল, সুজাউদ্দীন ছিলেন অলস ও বিলাসী। আলিবর্দি মারাঠা আক্রমণে এবং আফগান বিদ্রোহে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া অসম্ভব ছিল।

মারাঠা আক্রমণ কালে আলিবর্দি ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করেছিলেন। নবাবের দাবি পূরণের জন্য ইংরেজেরা জগৎশেঠের কাছে টাকা ধার করেছিল।

দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল ১৭৪৬ সালে, শান্তি স্থাপিত হল ১৭৪৮ সালে। ১৭৪০ সালে ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, তাতে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড পরস্পর-বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ ইউরোপে এই ইংগ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল। ১৭৪৮ সালের সন্ধি স্থায়ী হল না; ইউরোপে শান্তি থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধ সুরু হল।

১৭৪৯ সালে। এই যুদ্ধ চলেছিল ১৭৫৪ সাল পর্যন্ত; এর প্রধান নায়ক ছিলেন দুপ্লে (Dupleix)। হায়দরাবাদ এবং আর্কট রাজ্য বিদেশীদের এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল; মারাঠারাও নির্লিপ্ত রইল না। কিন্তু ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য দুপ্লের স্বপ্ন সফল হল না, ইংরেজদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি রুখতে পারলেন না। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের নৌবলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল, বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রয়াস যুক্ত হল। দুর্বল ভারতীয় রাজা ও নবাবদের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে না পারলে বাণিজ্যের জন্য আশানুরূপ সুযোগ পাওয়া যাবে না, এটা ইংরেজ ও ফরাসী, দুই পক্ষই বুঝতে পারল।

দাক্ষিণাত্যে এই সংঘর্ষের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলিবর্দি সচেতন ছিলেন। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলায় ইংরেজ ও ফরাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা গোড়া থেকেই ছিল। কলকাতার কাছাকাছি চন্দননগর ছিল পূর্ব ভারতে ফরাসীদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। দুপ্লে পণ্ডিচেরিতে যাবার আগে চন্দননগরের শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং দক্ষিণ ভারতের সংগ্রাম বাংলায় প্রসারিত হতে পারে, এমন আশঙ্কার কারণ ছিল। র্জা লা বলেছেন: 'দক্ষিণ ভারতে ফরাসী এবং ইংরেজদের অগ্রগতি আলিবর্দি ক্রোধ এবং বিস্ময়ের ('indignation and surprise') সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে আজ হোক, কাল হোক বিদেশীরা তাঁর রাজ্যেও এ রকম অভিযান করবে।' এই সম্ভাব্য বিপদ ঠেকিয়ে রাখার জন্য তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে নিরপেক্ষ থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। ইংরেজেরা কলকাতায় এবং ফরাসীরা চন্দননগরে নিজ নিজ দুর্গের শক্তিবৃদ্ধি করছে, এই সংবাদ পেয়ে তিনি কাজ বন্ধ রাখার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজদের হুকুম দেওয়া হল, তারা যেন নবাবের রাজ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ না করে। ইংরেজের বিরুদ্ধে সহযোগিতার জন্য ফরাসীদের প্রস্তাব আলিবর্দি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর নিরপেক্ষতা নীতি সফল হয়েছিল। ১৭৪৮ সাল থেকে ১৭৫৬ সালে আবার ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশী বণিকেরা বাংলার শান্তি বিঘ্নিত করে নি।

ইংরেজদের শক্তি সম্বন্ধে আলিবর্দির বাস্তব ধারণা ছিল। ১৭৫৫ সালে মুর্শিদাবাদের এক প্রধান বণিক তাঁকে বলেছিল যে কলকাতা থেকে ইংরেজদের উৎখাত করলে তিনি তিন কোটি টাকা পেতে পারেন। বৃদ্ধ নবাব এর উত্তর দিলেন: 'মাটিতে যে আগুন জ্বলছিল তা' আমি বারো বৎসর যুদ্ধ করে, হাজার হাজার মুসলমান ও কাফেরের রক্তপাত করে, নিভিয়ে দিয়েছি। তুমি আমাকে বলছ সেই আগুন জলের দিকে ছুড়ে দিতে। তার ফলে তামাম হিন্দুস্থানের মাটি আর জল জ্বলে উঠবে।' মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি সিরাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ না করতে।

৪। পলাশীর যুদ্ধ

সিরাজের সিংহাসনে আরোহণের (এপ্রিল ১৭৫৬) পরেই ঘটনার স্রোত তাঁকে ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধের দিকে টেনে নিয়ে গেল। আলিবর্দির আমলে যে ব্যবস্থা চলছিল হঠাৎ তার পরিবর্তন করে কোম্পানীর কর্মচারীরা বিরোধের সূত্রপাত করল। বাংলায় কোম্পানীর কুঠিগুলির অধ্যক্ষ ড্রেক (Drake) নতুন নবাবকে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে উপঢৌকন পাঠালেন না। এটা প্রচলিত রীতির লঙ্ঘন। সিরাজ কাশিম বাজারের সংলগ্ন ইংরেজদের বাগানবাড়ী দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু তারা তাঁকে অনুমতি দিল না। এই অশিষ্টাচারে স্বভাবতঃই তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন। দুটি ব্যাপারে তাঁর রাজনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হল। ইংরেজেরা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছিল। নবাব তাকে ফেরৎ পাঠাবার নির্দেশ দিলেন, ড্রেক সেটা অগ্রাহ্য করলেন। এই নির্দেশ নিয়ে নারায়ণ দাস নামক নবাবের এক দূত কলকাতায় গিয়েছিল; তার কাছে দৌত্য কার্যের উপযুক্ত দলিল ছিল না, এই অভিযোগে ইংরেজেরা তাকে গুপ্তচর বলে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিল। কোম্পানী সার্বভৌম শক্তি নয়, কলকাতা নবাবের রাজ্যের বাইরে নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে ভাবে কাজকর্ম চলে এখানে তা' অবান্তর। রাজানুগ্রহে যে বিদেশী বণিক বাণিজ্য করে, রাজার আদেশ অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে অপরাধ। ফররুখসিয়রের 'ফর্মানে'র কোন শর্তই ইংরেজদের এই অবাধ্যতার সমর্থন করে না।

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজেরা কলকাতায় 'রাজ্যের মধ্যে রাজ্য' (State within a State) স্থাপন করেছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দীন এবং আলিবর্দি তাতে বাধা দেন নি; তাঁরা আশা করেছিলেন যে মাঝে মাঝে হুমকি দিয়ে তাঁরা বিদেশী বণিকদের সংযত রাখতে পারবেন। কলকাতার দুর্গের সংস্কার করতে মুর্শিদকুলি এবং আলিবর্দি নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আলিবর্দির মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ঐ দুর্গের সংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধির কাজ আরম্ভ হয়েছিল। নতুন নবাবের চারিত্রিক দুর্বলতা এবং প্রশাসনিক অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ইংরেজেরা সম্পূর্ণ অবহিত ছিল। তাদের আশা ছিল যে ঘসিটি বেগমের ষড়যন্ত্রে সিরাজের সিংহাসন লাভ বানচাল হয়ে যাবে, শওকৎ জঙ্গ মসনদে বসবেন। তাই তারা ঘসিটি বেগমের বিশ্বস্ত মন্ত্রণাদাতা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছিল। সিরাজের অনুমতি না নিয়ে দুর্গসংস্কারের কাজে তারা হাত দিয়েছিল অন্য কারণে। ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল (১৭৫৬); এবারও ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সুতরাং ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হবে, এটা নিশ্চিত ছিল। চন্দননগর থেকে আক্রমণ করে ফরাসীরা যাতে কলকাতা দখল করতে না পারে, সেজন্য কলকাতাকে

আরো সুরক্ষিত করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইংরেজের সঙ্গে সিরাজের সংঘর্ষ এক বৃহত্তর নাটকের একটি দৃশ্য মাত্র।

শওকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেও (১৬ মে ১৭৫৬) সিরাজ কলকাতার সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজমহল থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন। কাশিম বাজারে ইংরেজদের কুঠি লুঠ করা হল (২৪ মে ১৭৫৬)। তারপর সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করলেন। ইংরেজেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। নবাব জয়লাভ করে দুর্গে প্রবেশ করলেন (২০ জুন ১৭৫৬)। এর আগেই ড্রেক এবং আরো কয়েকজন নৌকাযোগে পলায়ন করেছিলেন। তাঁরা ফলতায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন (২৬ জুন ১৭৫৬)। ইতিমধ্যে ঘটেছিল সেই ঘটনা যা' ইংরেজদের লেখা ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' (Black Hole tragedy) নামে পরিচিত। প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী ১৪৬ জন মাতাল গোরা সৈনিককে ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত একটি কক্ষে সারারাত আটক রাখা হয়েছিল এবং নিদারুণ গ্রীষ্মে দম বন্ধ হয়ে তাদের মধ্যে ১২৩ জন মারা গিয়েছিল। এই বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে নানারকম সন্দেহ আছে। ঘটনা যাই হোক না কেন, এর কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই।

মানিক চাঁদকে কলকাতার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সিরাজ মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন (১১ জুলাই ১৭৫৬)। তারপর শওকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা এবং জয়লাভ (সেপ্টেম্বর—অক্টোবর ১৭৫৬)।

রাজ্যলাভের পর ছয় মাস সিরাজ প্রশংসনীয় ক্ষিপ্রতা এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার পরেই তাঁর রাজনৈতিক এবং সামরিক অদূরদর্শিতার ফল আত্মপ্রকাশ করল। কলকাতা জয়ের পর শহরটি রক্ষার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। ইংরেজেরা আবার শহরটি দখল করার জন্য চেষ্টা করতে পারে, এমন সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি আশা করেছিলেন যে বাণিজ্যলোভী বিদেশীরা পরাজয়ের পর তাঁর কাছে বিনীতভাবে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হল ১৭৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। তিনি শুনলেন যে মাদ্রাজ থেকে একদল সৈন্য আর এক নৌবহর কলকাতার দিকে আসছে।

মাদ্রাজে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিল যে বর্ষাকালে বাংলায় যুদ্ধ করা কঠিন, তাই শীতকালে কলকাতা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে। সেনাদলের নায়ক হলেন কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ, নৌবহরের নায়ক হলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংগ্রামে ক্লাইভ অসামান্য সামরিক কৃতিত্ব দেখিয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

সম্মিলিত সেনাদল এবং নৌবহর ফলতায় উপস্থিত হল (১৫ ডিসেম্বর ১৭৫৬)। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা ইংরেজদের হস্তগত হল। সিরাজ ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ৬০,০০০ পদাতিক এবং ত্রিশটি কামান নিয়ে কলকাতায়

পৌঁছলেন (৩ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭)। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে (৫ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭) তিনি সন্ধি করলেন। কোম্পানীকে বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হল, কলকাতা সুরক্ষিত করার জন্য অনুমতি দেওয়া হল, এবং নবাব কয়েকমাস আগে কলকাতা দখল করায় কোম্পানীর এবং শহরের বাসিন্দাদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার জন্য দরাজ হাতে টাকা দেওয়া হল।

সিরাজ একবার পরাজয়ের পরেই এসব শর্ত মেনে নিলেন সম্ভবতঃ দুটি কারণে। উত্তর ভারতে গুজব রটেছিল যে আহম্মদ শাহ আবদালী দিল্লী, আগ্রা, মথুরা বিধ্বস্ত করে বিহার ও বাংলার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ, মুর্শিদাবাদে তাঁর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে সে সম্বন্ধে সিরাজ বোধহয় সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন না। ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু; এই অবস্থায় ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করাই নবাবের কাছে সঙ্গত বলে মনে হল। কিন্তু তাঁর পশ্চাদপসরণে ইংরেজদের শক্তি এবং উচ্চাভিলাষ সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাঁর বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে ক্লাইভ ফরাসীদের প্রধান ঘাঁটি চন্দননগর অধিকার করলেন (২৩ মার্চ ১৭৫৭)।

দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংগ্রামের ফলে যে আগুন জ্বলেছিল, যা' আলিবর্দি বাংলার বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন, তা' বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। হায়দরাবাদে এবং আর্কটে মসনদ লাভের জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল, ইংরেজ ও ফরাসীরা যার সুযোগ নিয়েছিল, তা' মুর্শিদাবাদেও দেখা দিল। চন্দননগর হারাবার পর ফরাসীরা এই ঘরোয়া বিবাদের সুযোগ নিতে পারল না, এগিয়ে এল ইংরেজ। মাত্র তিন মাসের মধ্যে সিরাজের পতন হল, ইংরেজের আশ্রিত মীর জাফর বাংলার মসনদে বসলেন।

যে ষড়যন্ত্র সিরাজের সর্বনাশ ডেকে আনল তার মূলে ছিল তাঁরই ঔদ্ধত্য এবং রাজনৈতিক কর্মকুশলতার অভাব। আলিবর্দির আমলের সেনাপতি মীর জাফরকে কর্মচ্যুত করা আবশ্যক ছিল, কারণ সিরাজের প্রতি তাঁর আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। কিন্তু সুদক্ষ প্রশাসক রায় দুর্লভকে মোহন লালের কর্তৃত্বাধীন করে তাঁর মর্যাদা হানির কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। সর্বাপেক্ষা গর্হিত কাজ হয়েছিল জগৎশেঠকে প্রকাশ্যে অপমান করা। তাঁকে সিরাজ অবজ্ঞা করতেন, ঠাট্টা করতেন, ধর্ম হানির ভয় দেখাতেন।[৪] সম্ভবতঃ সিরাজ একবার প্রকাশ্য দরবারে তাঁর মুখে আঘাত করেছিলেন।[৫] এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন উদ্ধত যুবকের হাতে বাংলার শাসনভার ন্যস্ত রাখা নিরাপদ ছিল না। সাধারণ মানুষের উপর তাঁর

৪। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেছেন: 'Jagat Seth, the principal citizen of the capital, whom he had often treated with slight and derision, and whom he had mortally affronted by sometime threatening with circumcision, was in his heart totally alienated and lost'.

৫। Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. I, cvii পৃষ্ঠা।

নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাসের অসম্পূর্ণ বিচারে ষড়যন্ত্রকারীরা কলঙ্কিত বলে গণ্য হয়েছে। নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁদের আগ্রহ অবশ্যই ছিল; সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে নায়ক রূপে অবতীর্ণ হন না। কিন্তু নবাবী দরবারের প্রধান ব্যক্তিদের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য পরোক্ষ দায়িত্ব ছিল; তাঁরা যদি মনে করে থাকেন যে সিরাজের মত নবাব প্রজাদের সুশাসন করতে অক্ষম তবে তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা যে তাঁদের হাতের পুতুল নবাব চেয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই। সিরাজ যদি মানীর সম্মান রক্ষা করতেন এবং শাসক রূপে দক্ষতা ও প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় দিতেন তবে সম্ভবতঃ তাঁকে সিংহাসন থেকে সরাবার জন্য ষড়যন্ত্রের আবশ্যক হত না।

মীর জাফরের সিংহাসন লাভের উচ্চাভিলাষ ছিল; আলিবর্দির আমলেই তিনি একবার বিদ্রোহী হয়েছিলেন। সিরাজ তাঁকে পদচ্যুত করার পর তিনি তাঁকে মসনদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য মুর্শিদাবাদের পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কিভাবে নবাবকে সরানো হবে এবং তাঁর জায়গায় কাকে বসানো হবে সে সম্বন্ধে মতৈক্য হয় নি। কলকাতায় সিরাজের পরাজয়ের পর জগৎশেঠ মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু মীর জাফর তাতে অসম্মত হন। বোধহয় তাঁর সন্দেহ ছিল যে সিরাজকে সরাবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি তাঁর এবং তাঁর সমর্থকদের নেই।

নবাবের দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াটস্ (William Watts) ষড়যন্ত্রে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন নবাবের অন্যতম সেনানায়ক ইয়ার লতিফ খাঁর কাছ থেকে। ইয়ার লতিফ জগৎশেঠের আশ্রিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁরই নির্দেশে তিনি নবাব সম্বন্ধে ইংরেজদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ওয়াটস্ কোম্পানীর আশ্রিত, কলকাতার বণিক আমির চাঁদ বা ওমি চাঁদকে (Omichand) ইয়ার লতিফের কাছে পাঠালেন। ইয়ার লতিফ জানালেন, সিরাজ শীঘ্রই পাটনায় যাবেন, তখন ইংরেজেরা মুর্শিদাবাদ দখল করতে পারে। তিনি এটাও জানালেন যে তাঁকে যদি নবাব করা হয় তবে তিনি রায় দুর্লভ এবং জগৎশেঠের সমর্থন পাবেন। ওয়াটস্ প্রস্তাবটি অনুমোদন করে ক্লাইভকে জানালেন। নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য পাবার সম্ভাবনা অনুমান করে মীর জাফরও ওয়াটস্ এবং ক্লাইভের কাছে দূত পাঠালেন। ঘসিটি বেগমের কাছে প্রচুর অর্থ পেয়ে মীর জাফর সৈন্য সংগ্রহ করলেন।[৬] ক্লাইভ ইয়ার

৬। (Mir Jafar used the Begam's money in) 'having in his party every hungry adventurer he heard of, (and) he soon assembled secretly in his house and in his quarters a very respectable force'. (গোলাম হোসেন)

লতিফের পরিবর্তে মীর জাফরকে মসনদের প্রার্থী রূপে মনোনয়ন করলেন, কারণ তাঁর কর্মদক্ষতা, খ্যাতি এবং উপর মহলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বেশি।[৭]

কলকাতায় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে নবাব ইংরেজদের বাংলা থেকে উৎখাত করতে উদ্যত, সুতরাং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা ছাড়া অন্য উপায় নেই ('divesting the Nawab from all powers of doing us mischief')। মীর জাফরের সঙ্গে গুপ্ত সন্ধি স্বাক্ষরিত হল (৫ জুন ১৭৫৭)। প্রধান শর্তগুলি এই: (১) ফরাসীদের বাংলা থেকে তাড়াতে হবে। (২) সিরাজের কলকাতা আক্রমণের ফলে ইংরেজদের ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণের জন্য মোট এক কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা দিতে নবাব বাধ্য থাকবেন। (৩) ইংরেজ বণিকেরা বাণিজ্যসংক্রান্ত যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল সেগুলি বজায় থাকবে। (৪) কলকাতায় কোম্পানীর সার্বভৌম অধিকার থাকবে। (৫) কলকাতার দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত ভূখণ্ডে কোম্পানী জমিদারী স্বত্ব পাবে। (৬) ঢাকা ও কাশিম বাজার কুঠির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কোম্পানী ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করতে পারবে। (৭) হুগলী শহরের দক্ষিণে গঙ্গার নিকটে নবাব কোন নতুন দুর্গ নির্মাণ করতে পারবেন না। (৮) কোম্পানী প্রয়োজন মত নবাবকে সামরিক সাহায্য দেবে, ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব থাকবে নবাবের। সিংহাসনের লোভে মীর জাফর বাংলার নবাবীকে শৃংখলিত করতে স্বীকৃত হলেন।

'এই বিষম সংকটের সময় সিরাজ তাঁহার অস্থিরমতিত্ব, কূট রাজনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাব এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন'। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের সাহায্য তিনি গ্রহণ করলেন না, বরঞ্চ তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী, কাশিম বাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জাঁ লা'কে বিদায় দিলেন। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কিছু পরিচয় পেয়ে মুর্শিদাবাদে তাঁর বাড়ী সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করলেন, তারপর নিজেই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে ইংরেজদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। জগৎশেঠ ও রায় দুর্লভকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি কোন চেষ্টা করেছিলেন, এমন প্রমাণ নেই।

ষড়যন্ত্রের সূচনা করেছিলেন মীর জাফর, জগৎশেঠ এবং ইয়ার লতিফ খাঁ। রায় দুর্লভ ব্যাপারটা জানতেন, কিন্তু কতটা সক্রিয় ভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন তা' বলা যায় না। কবি নবীন চন্দ্র মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের 'মন্ত্রভবনে' ষড়যন্ত্রকারীদের সভার যে বর্ণনা দিয়েছেন ('পলাশির যুদ্ধ', প্রথম সর্গ) সেটা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং রাজা রাজবল্লভ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। রাণী ভবানী ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন না, সুতরাং তাঁর প্রতিবাদের কথা অবান্তর।

৭। 'Mir Jafar was by far the properest person to be elevated to that rank, as his abilities were greater, his reputation better and his connections were more extensive than those of Latif'. (Watt's *Memoirs*, ৮৩ পৃষ্ঠা)।

ক্লাইভ ইংরেজদের অধিকৃত চন্দননগর থেকে যাত্রা করে (১৩ জুন ১৭৫৭) কাটোয়ার পথে গঙ্গা পার হয়ে পলাশীতে উপস্থিত হলেন (২২ জুন ১৭৫৭)। লক্ষবাগ নামক আম্রকুঞ্জে তাঁর শিবির স্থাপিত হল। তাঁর সঙ্গে ছিল ২১০০ ভারতীয় সিপাহী, ১১০০ গোরা সৈন্য। সিরাজ বিরাট সৈন্যদল নিয়ে পলাশীতে উপস্থিত হলেন : প্রায় ৫০,০০০ যোদ্ধা, ৫৩টি কামান।

২৩ জুন, বৃহস্পতিবার, যুদ্ধ হল। ইয়ার লতিফ খাঁ, মীর জাফর এবং রায় দুর্লভ তাদের কর্তৃত্বাধীন সৈন্যদল নিয়ে ইংরেজদের থেকে দূরে রইলেন। তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন না। মীর মদন যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, মোহন লাল আহত হলেন। মীর মদনের মৃত্যুতে বিচলিত হয়ে সিরাজ মীর জাফরকে নিজের শিবিরে ডেকে আনলেন এবং প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য তাঁর কাছে করুণ আবেদন জানালেন। বিশ্বাসঘাতক কোরান স্পর্শ করে বিভ্রান্ত প্রভুকে অভয় দিয়ে বললেন, 'সন্ধ্যা আগত প্রায়, যুদ্ধের সময় নেই, আপাততঃ যুদ্ধ বন্ধ থাক, কাল প্রাতে আমি সমস্ত সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করব।' হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নবাব মোহন লালকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচারিত হল : 'নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।' সিরাজের অনুগত সৈন্যদের উদ্যত অসি অচল হল। মীর জাফরের এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়ে ক্লাইভ জয়লাভ করলেন। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন : 'যখন বিশ্বাসঘাতকতা নবাবের বাহিনীকে স্থানচ্যুত করল তখনই ক্লাইভ নিশ্চিত ধ্বংসের সম্ভাবনা এড়িয়ে অগ্রসর হলেন।'[৮] নবাবের ৫০০ সৈন্য নিহত হল ; ইংরেজদের পক্ষে ২৩ জন সৈন্য (৭ জন শ্বেতাঙ্গ) নিহত এবং ৪৯ জন (১৩ জন শ্বেতাঙ্গ) আহত হল।

যুদ্ধের দিন অপরাহ্নে সিরাজ পলাশী ত্যাগ করে মধ্য রাত্রিতে মুর্শিদাবাদে পৌঁছলেন। পরদিন রাত্রিতে তিনি পাটনার দিকে যাত্রা করলেন। কয়েকদিন পরে মীর জাফর এবং ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হলেন। ২৯ জুন ক্লাইভ দরবারে মীর জাফরের হাত ধরে তাঁকে মসনদে বসিয়ে দিলেন। ৩০ জুন রাজমহলের কাছে সিরাজ ধরা পড়লেন। তাঁকে মুর্শিদাবাদে এনে মীর জাফরের পুত্র মীরণের নির্দেশে হত্যা করা হল। মীর জাফর বন্দী নবাবের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত তা' স্থির করতে না পেরে তাঁকে মীরণের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল ইংরেজদের অজ্ঞাতে।

৮। 'It was only when treason had done her work, when treason had driven the Nawab from the field, when treason had removed his army from its commanding position that Clive was able to advance without the certainty of being annihilated. Plassey then, though decisive, can never be considered a great battle.' (Malleson, *Decisive Bettles of India*, ৬৯ পৃষ্ঠা)।

পরিশিষ্ট

কলকাতার প্রাচীনত্ব

জোব চার্নকের কলকাতায় আগমনের শতাধিক বর্ষ পূর্বেও কলকাতা মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান ছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে দেখা যায়, কলকাতা ছিল সরকার সাতগাঁও-এর অন্তর্গত একটি মহল, অন্য দুটি মৌজার সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে এই মহলের ভূমি-রাজস্ব ছিল ২৩,৯০৫ টাকা। ১৫৮২ সালে টোডর মল বাংলার ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ তৈরি করেছিলেন সেটাই ছিল আবুল ফজলের লিখিত বিবরণের ভিত্তি। পূর্বেই বলা হয়েছে, টোডর মল নিজে বাংলার জমি জরিপ করেন নি, সুলতানী আমলের কানুনগোদের কাগজপত্রের ভিত্তিতেই তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। সুতরাং ১৫৮২ সালের আগেই কলকাতা বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থায় একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা রূপে চিহ্নিত হয়েছিল।

কলকাতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই তথ্যের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছে।[১] 'আইন-ই-আকবরী'র সুস্পষ্ট এবং অবিকৃত রূপ পাওয়া যায় নি। এই গ্রন্থের প্রথম অংশের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন ব্লখম্যান। তিনি নিজেই পাণ্ডুলিপির 'অসন্তোষজনক অবস্থা'র উল্লেখ করেছেন।[২] তিনি যে শব্দটিকে 'কলকত্তা' ('Kalkatta') বলে গ্রহণ করেছেন তার তিনটি পাঠান্তর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়: কলনা (Kln), কলতো (Klt), তলপা (Tlp)। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, কলকত্তার (Klkt) চেয়ে 'কলনা' পাঠই বেশি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাঁর এই মতের সমর্থনে তিনি কোন যুক্তি উপস্থিত করেন নি। একটি প্রশ্ন থেকে যায়: জায়গাটির নাম টোডর মলের সময়ে কলকত্তা না হয়ে কলনা হলে পরবর্তী কালে কলনা নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? আর একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন: কখন এবং কি কারণে কলনা কলকত্তা হয়ে গেল?

ইউল 'চুটানুটি' ও 'গোবিন্দপুর' নাম পেয়েছেন, কিন্তু 'কলিকাতা' নাম পান নি, ১৬৭৫ সালের কাগজপত্রে। অথচ ১৬৮৮ সালের কাগজপত্রে তিনি 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ পেয়েছেন। ১৬৭৫ সাল থেকে ১৬৮৮ সালের মধ্যে হঠাৎ কলকাতার উদ্ভব হল কিভাবে?

১। রাধারমণ মিত্র, 'কলিকাতা-দর্পণ', ১-১৪ পৃষ্ঠা।

২। Blochmann, *Contributions to the Geography and History of Bengal*, ৭ পৃষ্ঠা।

বিপ্রদাস-কৃত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে এবং কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কলকাতার উল্লেখ আছে কিনা, এ বিষয়ে তর্ক নিরর্থক। তাঁরা ভূগোল বা ইতিহাসের বই রচনা করেন নি। কোন স্থান বা ব্যক্তির নামের উল্লেখ না পাওয়া গেলে সেই ব্যক্তির বা স্থানের অস্তিত্ব ছিল না, এরকম সিদ্ধান্ত ইতিহাসসম্মত নয়। ভারতীয় সাহিত্যে ও শিলালিপিতে আলেকজাণ্ডারের উল্লেখ নেই, এই তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন নি।

বিপ্রদাসের রচনায় কালীঘাটের উল্লেখ আছে। সেখানে বাণিজ্যযাত্রী চাঁদ সদাগর কালিকার পূজো করেন। পূজো প্রসঙ্গে কালীঘাটের উল্লেখই স্বাভাবিক, কলিকাতার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক। 'কলিকাতা ও কালীঘাট দুইটি পৃথক স্থান', এই মন্তব্য বিচার করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে বর্তমান শতকের প্রথম দিকেও ভবানীপুরের অধিবাসীরা বলতেন, 'কলকাতায় যাচ্ছি'। তবে কি বলতে হবে যে কলকাতা এবং ভবানীপুর 'দুইটি পৃথক স্থান'?

কবিকঙ্কণের কাব্যে গঙ্গাতীরবর্তী যে সকল স্থানের নাম আছে তার অধিকাংশই 'প্রক্ষিপ্ত' বটে, কিন্তু কলকাতার নামও যে প্রক্ষিপ্ত তার কোন প্রমাণ নেই।

শিখগুরু নানকের জীবনকাহিনী সংক্রান্ত ঐতিহ্যে তাঁর কলকাতায় উপস্থিতির উল্লেখ আছে। এই ঐতিহ্য সর্বাংশে ইতিহাসসম্মত নয়। যদি তিনি প্রকৃতই কলকাতায় পদার্পণ করে থাকেন তবে সেটা ঘটেছিল ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে। তখন কলকাতার অস্তিত্ব না থাকলে, অথবা কলকাতা 'জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি' হলে, তিনি এখানে আসতেন না।

৭

বণিকের রাজদণ্ড

১। নবাবী আমলের সূর্যাস্ত

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলায় যে যুগ পরিবর্তন ঘটেছিল তার সম্বন্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য আছে ঃ 'নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরেজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হল। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনসি, ছিড়ে বেণে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে।' আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, মীর জাফরের রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মুসলমান-শাসনের সমাপ্তি ঘটল। এই দুটি মন্তব্যে ইতিহাসের পূর্ণ সত্য প্রকাশিত হয় নি।

১৭৫৭ সালে ইংরেজেরা বাংলার শাসক হবার কথা চিন্তাও করে নি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যের প্রসার—যার জন্য প্রয়োজন ছিল স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা এবং বন্ধুভাবাপন্ন নবাব। মীর জাফরের দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে ক্লাইভ ইংলণ্ডের মন্ত্রী পিটের (William Pitt the Elder) কাছে ১৭৫৯ সালে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন যে কোম্পানীর নামে বাংলার দেওয়ানী গ্রহণ করা হোক। পিট তাতে সম্মতি দেন নি। বাংলায় ইংরেজের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বকসারের যুদ্ধে (১৭৬৪) জয়লাভের ফলে। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৪ সালের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল। দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের সামরিক শক্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাব নষ্ট হল। হায়দরাবাদে এবং আর্কটে মুসলমান শাসকদের উপর ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) মারাঠাদের নিদারুণ পরাজয় হল। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে পেশোয়া বালাজী বাজী রাও কলকাতার গভর্নরকে লিখেছিলেন যে

তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে কোম্পানীকে সামরিক সাহায্য পাঠাবেন, পরে বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ তিনি দখল করবেন, আর এক ভাগ ইংরেজদের অধীন থাকবে। বঙ্গভঙ্গের এটাই প্রথম প্রস্তাব। কোম্পানী এটা অগ্রাহ্য করেছিল। পানিপথের পর মারাঠাদের পক্ষে বাংলার দিকে নজর দেওয়া সম্ভব ছিল না। উত্তর ভারতের প্রধান মুসলমান শাসক, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা বকসারের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাজ্যহারা হলেন, পরে ইংরেজদের অনুগ্রহে রাজ্য ফিরে পেয়ে স্বভাবতঃই তাদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়লেন।

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এই দ্রুত পট পরিবর্তন ইংরেজদের নতুন নতুন সুযোগ এনে দিয়েছিল, তাদের উচ্চাভিলাষে ইন্ধন জুগিয়েছিল। বাংলার কোন নবাবকেই বিশ্বাস করা যায় না, নানাকারণে তাদের এই ধারণা হল। মীরণ ক্লাইভকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেছিল, তাতে বাদ সাধলেন জগৎশেঠ। মীর জাফর ইংরেজদের তাড়াবার জন্য ওলন্দাজদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, এটা সেকালের ইংরেজদের দৃঢ় ধারণা ছিল। মীর কাশিম ইংরেজদের অনুগ্রহে সিংহাসন লাভ করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন এবং পরাজিত হয়ে সুজাউদ্দৌলাকে ডেকে আনলেন। নবাবদের এই অস্থিরতার জন্য অবশ্যই ইংরেজদের লুণ্ঠন নীতি অনেকাংশে দায়ী ছিল, কিন্তু ইংরেজেরা বুঝতে পারল যে রাজনৈতিক অধিকার হস্তগত করতে না পারলে তাদের বাণিজ্যের নিরাপত্তা যে কোন সময়ে বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু তারা প্রত্যক্ষভাবে বাংলার রাজত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই ক্লাইভ প্রবর্তন করলেন 'মুখোসে ঢাকা ব্যবস্থা' ('masqued system')। মুখোস সম্পূর্ণ অপসারিত হল দীর্ঘকাল পরে। ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে বাংলার নবাবের কর্তৃত্ব শেষ হল ১৭৯০ সালে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় পর্যন্ত দিল্লীর বাদশাহের নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন ছিল, প্রশাসনে ফার্সি ভাষা ব্যবহৃত হত।

আলিবর্দি যেভাবে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন সেটা বাংলার মানুষ ভুলে যায় নি, তাই বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে মীর জাফরের মসনদ লাভ তাদের বিস্মিত করে নি। সিরাজের চরিত্র মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, তাই তাঁর মৃতদেহ যখন হাতীর পিঠে রেখে মুর্শিদাবাদের রাজপথে ঘোরান হল তখন রাজধানীর নাগরিকেরা শোকাভিভূত হয় নি। ক্লাইভ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বাদশাহী দরবার থেকে মীর জাফরের নবাবী পদে নিয়োগের অনুমোদন আনালেন। মীর জাফর বার্ষিক ৫২ লক্ষ টাকা দিল্লীতে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সিংহাসন লাভের জন্য মীর জাফরকে প্রচুর আর্থিক মূল্য দিতে হয়েছিল। দুটি সন্ধির মাধ্যমে (৫ জুন এবং ১০ জুলাই ১৭৫৭) তিনি ২৯৭,০০,০০০ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু দিয়েছিলেন কিছু কম (২৫৩,০০,০০০ টাকা)। কোম্পানী, কোম্পানীর সৈন্যদল ও নৌবাহিনী এবং

কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীরা এই লুটের ভাগ পেয়েছিল। একা ক্লাইভ পেয়েছিলেন ২০,৮০,০০০ টাকা। কলকাতার দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড (চব্বিশ পরগণা) কোম্পানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হল; খাজনা ধার্য হল ২২২,৯৫৮ টাকা। ১৭৫৯ সালে এই জমিদারী ক্লাইভকে জায়গীর হিসাবে দেওয়া হল—অর্থাৎ কোম্পানী নবাবকে যে খাজনা দিত সেটা ক্লাইভকে দেবার ব্যবস্থা হল, ঐ জমিদারী থেকে নবাবের প্রাপ্য কিছুই রইল না। বাণিজ্য সম্বন্ধে কোম্পানীর সব দাবি মীর জাফরকে মেনে নিতে হল। কোম্পানী এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে লাগল। 'দস্তক' নিয়ে তাদের অনুগৃহীত ভারতীয় বণিকেরাও এই সুযোগের অংশীদার হল। নবাবের আয় কমে গেল, স্থানীয় বণিকেরা অসম প্রতিযোগিতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

মীর জাফর ক্রমশঃ ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়লেন। চরিত্রের দৃঢ়তা এবং রাজনৈতিক কূট বুদ্ধির অভাবে তিনি ধীরে ধীরে ক্লাইভের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। 'ক্লাইভের গর্দভ' বলে তিনি হাস্যাস্পদ হলেন।

সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই মীরজাফর তিনটি বিদ্রোহের সম্মুখীন হলেন—মেদিনীপুরে, পূর্ণিয়ায় এবং পাটনায়। তিনি সন্দেহ করলেন যে তিনটি বিদ্রোহেরই মূলে ছিলেন রায় দুর্লভ। রায় দুর্লভকে হত্যা করার ব্যবস্থা হল, কিন্তু তিনি ক্লাইভের আশ্রয় নিলেন। তাঁকে দেওয়ানের পদ থেকে বরখাস্ত করে রাজবল্লভকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হল। তারপর নবাবী সৈন্যদলে বিদ্রোহ হল—বকেয়া বেতনের দাবিতে।

এই সংকটকালে ঘটল শাহাজাদা শাহ আলমের আক্রমণ। বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর ছিলেন অতি দুর্বলচরিত্র, মারাঠাদের দ্বারা সমর্থিত উজীরের হাতের পুতুল। উজীরের শত্রুতায় ভীত হয়ে তাঁর পুত্র শাহ আলম দিল্লী থেকে পালিয়ে অযোধ্যায় আশ্রয় নিলেন। তখন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা এবং এলাহাবাদের সুবাদার মোহম্মদ কুলি খাঁ তাঁকে সামনে রেখে বিহার আক্রমণ করলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মীরজাফরকে সরিয়ে দিয়ে শাহ আলমকে বাংলার মসনদে স্থাপন করা। প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হল (১৭৫৯)। কয়েক মাস পরে শাহ আলম আবার বিহার আক্রমণ করলেন। ইতিমধ্যে দিল্লীতে দ্বিতীয় আলমগীরকে ক্ষমতালোভী উজীর হত্যা করেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে শাহ আলম নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন এবং সুজাউদ্দৌলাকে উজীর নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তাঁর বিহার আক্রমণ ব্যর্থ হল (১৭৬০)। ওদিকে মারাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট মেদিনীপুর অধিকার করলেন, কিন্তু ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হওয়া মাত্র তিনি বিনা যুদ্ধে বাংলার সীমানা ত্যাগ করলেন (১৭৬০)।

মীর জাফরের বিপন্মুক্তি ঘটল—ক্লাইভের কৃপায়। কোম্পানীর সৈন্যদলের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে শাহাজাদা এবং শিবভট্টের আক্রমণ রোধ করা

অসম্ভব হত। আর এক বিপদ হল বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রে ওলন্দাজদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ (১৭৫৯)। ইংরেজদের সন্দেহ ছিল যে মীর জাফরের সঙ্গে ওলন্দাজদের গোপনে যোগাযোগ ছিল; কিন্তু এটা অনুমান মাত্র, কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মাঝামাঝি বেদেরা নামক স্থানে যুদ্ধ হল; ওলন্দাজেরা পরাজিত হল (নভেম্বর ১৭৫৯)। বাংলায় ইংরেজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা দূর হল।

এই সব ঘটনার ফলে মীর জাফরের অযোগ্যতা তাঁর প্রজাদের কাছে প্রমাণিত হল, ইংরেজদের কাছে ফুটে উঠল তাঁর দুর্বলতার সুস্পষ্ট ছবি। শূন্য রাজকোষ থেকে ইংরেজদের আর্থিক দাবি মিটিয়ে দেবার শক্তি তাঁর ছিল না। ক্লাইভের পরবর্তী গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট (Vansittart) প্রস্তাব করলেন যে চট্টগ্রাম জেলা কোম্পানীকে ইজারা দেওয়া হোক, কিন্তু মীর জাফর সম্মত হলেন না। এদিকে মীরণের আকস্মিক মৃত্যুতে (জুলাই ১৭৬০) মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্বাচনের প্রশ্ন উঠল, কারণ মীর জাফর ছিলেন বৃদ্ধ ও রুগ্ন। ভ্যান্সিটার্টের নেতৃত্বে ইংরেজেরা স্থির করল যে আপাততঃ তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে রাজ্যশাসনের সকল দায়িত্ব দেওয়া হবে, তিনি নামে মাত্র নবাব থাকবেন। জরাগ্রস্ত নবাব এই ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করলেন, কিন্তু ইংরেজ সৈন্য মুর্শিদাবাদে তাঁর প্রাসাদ অবরোধ করায় তিনি ভীত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন (অক্টোবর ১৭৬০)। তিনি ইংরেজের বৃত্তিভোগী হয়ে কলকাতায় বাস করতে লাগলেন, মসনদে বসলেন মীর কাশিম।

বিনা রক্তপাতে ১৭৬০ সালের 'বিপ্লব' ('Revolution') সংঘটিত হল। যে রাজা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষা করতে পারেন না, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই তাঁর পতন ঘটে। মীর জাফরের ক্ষেত্রে এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ত্বরান্বিত করল ইংরেজের সামরিক বল এবং মীর কাশিমের উচ্চাভিলাষ। ক্লাইভ তখন ইংলণ্ডে, কিন্তু তাঁর মত সুদক্ষ নায়কের অভাবও ইংরেজদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হল না। তাদের মানদণ্ড যে ওজনে ভারি হয়েছে সেটা মীর জাফরের অপসারণে প্রমাণিত হল, কিন্তু তারা তখনও রাজদণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয় নি। মীর জাফর তাদের বিরোধিতা করেন নি, বেদেরার যুদ্ধে একদল নবাবী সৈন্য ইংরেজ সৈন্যদলের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। একমাত্র চট্টগ্রামের ইজারার ব্যাপারে তিনি ইংরেজের দাবি মেনে নেন নি। হয়তো ভ্যান্সিটার্ট আর একটু চাপ দিলেই তাঁকে সম্মতি দিতে হত। তবু তাঁকে অপসারণ করা কোম্পানীর পক্ষে দরকার হল প্রধানতঃ এই কারণে যে প্রশাসনের কাঠামো ভেঙে পড়ছিল, তাঁর সৈন্যেরা বারবার বিদ্রোহী হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল, বাংলায় যে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে তার অভাব ঘটছিল। ভ্যান্সিটার্টের আশা ছিল যে মীর কাশিম জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ নবাবের মত দুর্বল হবেন না। তিনি মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং রংপুরের ফৌজদার রূপে

প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পক্ষে আর একটি যুক্তি ছিল—তিনি ইংরেজদের সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর নগদ টাকা এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইজারা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এক সন্ধিপত্রের মাধ্যমে এই চুক্তি করে মীর কাশিম মসনদে বসলেন।

* * *

পূর্ববর্তী নবাবদের মত মীর কাশিমও জন্মসূত্রে বিদেশী ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ পারস্য থেকে এসে বিহারে জায়গীর পেয়েছিলেন। তাঁর শাসনকাল স্বল্পকালস্থায়ী হয়েছিল বটে, কিন্তু এর মধ্যেই তাঁর প্রশাসন-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তিনি পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রে রাজোচিত উদারতার পরিবর্তে ছিল সন্দেহ এবং নৃশংসতা। অবশ্য সেকালের রাজনৈতিক পরিবেশে এটা অস্বাভাবিক ছিল না। যুদ্ধে অনভিজ্ঞতা তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান ত্রুটি ছিল। ইংরেজদের মধ্যে ভ্যান্সিটার্ট এবং ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু কলকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যই বাণিজ্য-নীতি সম্বন্ধে তাঁর বিরোধিতা করতেন।

মীর জাফরের আমলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল, মূল্যবান মণি মুক্তা ছাড়া নগদ টাকা সামান্যই ছিল। মীর কাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম কোম্পানীকে ইজারা দিয়ে নবাবের রাজস্বের ক্ষতি করেছিলেন। অথচ মসনদের অধিকার লাভের জন্য তিনি ইংরেজদের প্রচুর অর্থ দিতে বাধ্য হলেন। নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তিনি অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিলেন। আয় বৃদ্ধি করার জন্য তিনি তিন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। প্রশাসনিক ব্যয় কিছু হ্রাস করা হল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। বিহারের প্রধান প্রশাসক রাজা রামনারায়ণ কেবল সম্পত্তি হারিয়েই নবাবের ক্রোধ থেকে মুক্তি পেলেন না, তাঁকে কয়েদ করা হল। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন লিখেছেন যে দরবারে ত্রাসের সৃষ্টি হল, মানমর্যাদাশালী ব্যক্তিরাও ভয়ে কথা বলতেন না।

বড় লোকের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে সাময়িক ভাবে রাজকোষ সমৃদ্ধ করা যায়, কিন্তু স্থায়ী ভাবে আয় বাড়ানো যায় না। তাই মীর কাশিম চড়া হারে রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেন। তাঁর নীতি ছিল জমিদার এবং ইজারাদারদের সরিয়ে দিয়ে প্রজারা যে খাজনা দেয় তার সবটাই নবাবী তহবিলে টেনে আনা। কার্যক্ষেত্রে এটা সম্ভব হত না, কারণ প্রজাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎ ভাবে খাজনা আদায় করার জন্য উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল না। ফলে জমিদার এবং ইজারাদারদের কাছে অস্বাভাবিক চড়া হারে রাজস্ব দাবি করা হত, তারা প্রজাদের নিপীড়ন করে সেই দাবি পূরণ করার চেষ্টা করত। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত। রংপুরে প্রজারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়েছিল। ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলি খাঁর নতুন বন্দোবস্ত অনুসারে মোট ভূমি-

রাজস্ব ছিল ১, ১৬, ২০, ৯৮৯ টাকা। ১৭৬৩ সালে ভূমি-রাজস্ব ধার্য হয়েছিল মোট ২, ৫৬, ২৪, ২৩৩ টাকা। মীর কাশিমের পতনের পর দেওয়ান নন্দকুমার ভূমি-রাজস্ব ধার্য করেছিলেন এর চেয়ে ৬৪ লক্ষ টাকা কম। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর প্রথম বৎসর (১৭৬৫-৬৬) মোহাম্মদ রেজা খাঁ ৯০ লক্ষ টাকা কমিয়ে দিয়েছিলেন। ফিলিপ ফ্রান্সিস (Philip Francis) এবং জন শোর (John Shore) মীর কাশিমের রাজস্ব-ব্যবস্থাকে লুণ্ঠন-ব্যবস্থা ('Pillage) আখ্যা দিয়েছেন। এটা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। জমির খাজনা ছাড়া আরো নানা রকম কর (যেমন, চুঙ্গি কর) মীর কাশিম বৃদ্ধি করেছিলেন। ইংরেজেরা নানা ভাবে তাদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করছিল। ফলে নবাবের যে আর্থিক ক্ষতি হত সেটা পূরণ করবার জন্য প্রজাদের উপর চাপ বাড়তে লাগল।

মীর জাফরের দুর্বল শাসন, শাহাজাদার আক্রমণ এবং সিরাজের সময় থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতা—এই সকল কারণে মীর জাফরের সময় থেকেই নানা স্থানে জমিদারদের বিদ্রোহ চলছিল। মীর কাশিমকে মেদিনীপুরে, বীরভূমে, বর্ধমানে এবং মুঙ্গেরে জমিদারী বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছিল। সেকালে জমিদারেরা শুধু লাঠিয়ালের উপর নির্ভর করতেন না। বীরভূমের মুসলমান জমিদার প্রায় ২০, ০০০ পদাতিক এবং ৫,০০০ অশ্বারোহী নিয়ে এক দুর্গম অঞ্চলে ঘাঁটি করে নবাবী ফৌজকে বাধা দিয়েছিলেন। এই সব সংঘর্ষে ইংরেজের ফৌজ এবং নবাবের ফৌজ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। বীরভূমে এবং বর্ধমানে মীর কাশিম নিজে সেনানায়ক ছিলেন। সেখানে তিনি বুঝতে পারলেন, ইংরেজের ফৌজের তুলনায় নবাবী ফৌজ অকর্মণ্য। ইংরেজদের সামরিক বলের ওপর নির্ভর করা বিপজ্জনক, এটা তিনি মীর জাফরের কটু অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নবাবী ফৌজকে শক্তিশালী করে পুনর্গঠন করার ব্যবস্থা করলেন। নবগঠিত ফৌজকে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। সামরিক দিক থেকে স্বয়ংনির্ভর হওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

মীর কাশিম তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করলেন। মুর্শিদাবাদ কলকাতার কাছে, সেখানে ইংরেজদের নিত্য আনাগোনা। পাটনায় ইংরেজদের বড় কুঠি ছিল। মুঙ্গের অপেক্ষাকৃত নগণ্য শহর, তার কোন রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল না, বিশেষ কোন সামরিক বা বাণিজ্যিক গুরুত্বও ছিল না। সেখানে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ নজরের বাইরে থেকে নতুন সামরিক সংগঠন তৈরী করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

নবাবী ফৌজকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত ও সজ্জিত করাই ছিল মীর কাশিমের নতুন নীতি। তাঁর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহ এই নীতি গ্রহণ করে সাফল্য লাভ করেছিলেন। মুঙ্গেরের ভগ্নপ্রায় দুর্গের

সংস্কার করা হল। বিদেশী শিল্পীদের উপদেশ ও নির্দেশ অনুসরণ করে দেশীয় শিল্পীরা উৎকৃষ্ট কামান, বন্দুক, গুলি-গোলা, বারুদ প্রভৃতি সামরিক উপাদান তৈরী করতে লাগল। উপযুক্ত কর্মচারীদের অধীনে সৈন্যেরা ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করল। গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার ব্যবস্থা হল। কলকাতার বিখ্যাত আর্মানী বণিক খোজা পিদ্রুর ভাই গ্রেগরী (যিনি বঙ্কিম চন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে 'গুরগন খাঁ' নাম পেয়েছেন) নবাবী ফৌজের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন। অন্যান্য সেনানায়কদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন অভিজ্ঞ জার্মান, পর্তুগীজ ও ফরাসী যোদ্ধা। এঁদের মধ্যে সমরু এবং তাঁর স্ত্রী বেগম সমরুর নাম ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত। সমরুর প্রকৃত নাম ছিল ওয়ালটার রাইনহার্ড (Walter Reinhard)। এই শিক্ষিত সেনাদলের সাহায্যে মীর কাশিম উত্তর বিহারে বেতিয়া রাজ্য জয় করে নেপাল আক্রমণ করলেন, কিন্তু সেখানে সাফল্য লাভ হল না।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর শুল্ক আদায়ের সমস্যা ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশিমের প্রকাশ্য সংঘর্ষের সূচনা করল। ফররুখসিয়রের 'ফর্মানে'র সঠিক ব্যাখ্যা অনুসারে কোম্পানীর বা কোম্পানীর কর্মচারীদের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্কমুক্ত ছিল না। কিন্তু কোম্পানী দাবি করত যে বহির্বাণিজ্যের মত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ইংরেজদের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত। মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজা-উদ্দীন এবং আলিবর্দি এই দাবি মেনে নেন নি; কিন্তু ইংরেজরা অনেক ক্ষেত্রে নানাভাবে শুল্ক দেবার দায়িত্ব এড়িয়ে যেত। মীর জাফর মসনদে আরোহণ করেই এক পরোয়ানা জারি করলেন (১৫ জুলাই ১৭৫৭): কোম্পানীর কোন কুঠির অধ্যক্ষের 'দস্তক' সহ কোম্পানীর গোমস্তারা যে সব বাণিজ্যদ্রব্য বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাবে তার উপর নবাবের কর্মচারীরা কোন শুল্ক দাবি করবে না। কোম্পানীকে বিনা শুল্কে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হল। এটা ফররুখসিয়রের 'ফর্মানে'র শর্তের সম্প্রসারণ। কিন্তু পরোয়ানা অনুযায়ী এই সুযোগ কেবলমাত্র কোম্পানীর প্রাপ্য ছিল, কোম্পানীর কর্মচারীদের নয়। সেকালে কোম্পানীর ছোট বড় সকল কর্মচারীই ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লাভবান হত; এটাই ছিল তাদের আয়ের প্রধান সূত্র। তারা মীর জাফরের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিল। তারা বিনা বাধায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে লাগল। শুধু তাই নয়। তারা টাকার বিনিময়ে কোম্পানীর গোমস্তাদের এবং অল্পসংখ্যক দেশীয় বণিকের কাছে 'দস্তক' বিক্রয় করত। সেই 'দস্তক' দেখিয়ে এই অনুগৃহীত ব্যক্তিরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করত। ফলে বাংলার বাণিজ্য ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর বণিকের উদ্ভব হল। কোম্পানী, কোম্পানীর কর্মচারীরা, এবং যে সব দেশীয় মানুষ 'দস্তক' দেখাতে পারত তারা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করত। সাধারণ বণিকদের শুল্ক দিতে হত, তাদের লাভ হত কম। বাণিজ্য শুল্ক থেকে নবাবের আয় অনেকটা কমে গেল। তা' ছাড়া বাণিজ্য সংক্রান্ত

নানা ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারীরা এবং গোমস্তারা নবাবের কর্মচারীদের সঙ্গে বিবাদ করত, তাতে অনেক সময় শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হত।

মসনদ লাভের পূর্বেই মীর কাশিম এই সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাঁর শাসনকালে ইংরেজেরা তাদের লব্ধ অধিকার ত্যাগ করবে, এটা মনে করার কোন কারণ ছিল না। ইংরেজদের অনুগ্রহেই তিনি রাজ্যলাভ করেছিলেন; তাঁকে নবাবী না দিয়ে তারা রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক সমর্থিত মীরণের পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে পারত। কিন্তু কিছুকাল রাজত্ব করার পর তিনি ইংরেজদের বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারলেন না। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তাঁর অসুবিধা দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু কলকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্য তাঁর বিরোধিতা করলেন। আপোষে শুল্ক-সমস্যার সমাধান হল না। তখন মীর কাশিম সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক রহিত করলেন (মার্চ ১৭৬৩)। এই ব্যবস্থায় দেশীয় বণিকেরা লাভবান হল, ইংরেজরা এতদিন যে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করছিল সেটা হারাল। সুতরাং কলকাতা কাউন্সিল এই ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবি জানাল। মীর কাশিম সম্মত হলেন না।

প্রকাশ্য সংঘর্ষের পথ উন্মুক্ত করল পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ এলিস (Ellis)। কোম্পানীর ফৌজ অতর্কিত আক্রমণে পাটনা শহর দখল করল (২৭ জুন ১৭৬৩)। কিছুদিনের মধ্যেই নবাবী ফৌজ পাটনা কেড়ে নিল, এলিস এবং আরও অনেকে বন্দী হল। কোম্পানীর দূত অ্যামিয়ট মুঙ্গের থেকে কলকাতায় যাবার পথে নবাবের সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিহত হলেন। কলকাতা কাউন্সিল মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (৩ জুলাই ১৭৬৩) এবং মীর জাফরকে নবাবী পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল।

অল্প দিনের মধ্যে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয় হল (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৭৬৩)—অজয় নদের তীরে, কাটোয়ায়, গিরিয়ায় এবং উধুয়ানালায়। উধুয়ানালায় পরাজয়ের প্রধান কারণ গুরগন খাঁর বিশ্বাস-ঘাতকতা। এই সংকটকালে মীর কাশিম স্থির মস্তিষ্কে আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা না করে নৃশংসতার খেলায় মেতে উঠলেন। ইতিপূর্বে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, স্বরূপ চাঁদ, রামনারায়ণ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মুঙ্গের দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের সকলকে এবং অন্যান্য অনেক বন্দীকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হল। তারপর মীর কাশিম মুঙ্গের থেকে পাটনায় যাত্রা করলেন। পথে দু'জন সৈন্য গুরগন খাঁকে হত্যা করল। তারপর এলিস প্রভৃতি সকল ইংরেজ বন্দীকে হত্যা করা হল। ইংরেজেরা মুঙ্গের ও পাটনা দখল করল।

নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মীর কাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার

কাছে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং বিহারের সীমান্তে উপস্থিত হলেন। সেখানে সুজাউদ্দৌলার কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। মীর কাশিম আশ্বস্ত হয়ে কর্মনাশা নদী পার হয়ে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে প্রচুর ধনরত্ন এবং একদল সৈন্য নিয়ে এলাহাবাদে গেলেন। তখন সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম সুজাউদ্দৌলার আশ্রয়ে বাস করছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধ করার জন্য ত্রিপাক্ষিক সন্ধি হল।

সম্মিলিত বাহিনী পাটনা পর্যন্ত অগ্রসর হল, পরে বর্ষাকাল উপস্থিত হলে (১৭৬৪) বক্সারে শিবির স্থাপিত হল। এখানে সুজাউদ্দৌলা মীর কাশিমের অর্থ লুণ্ঠন করলেন এবং বিশ্বাসঘাতক সমরু পূর্ব প্রভুকে বন্দী করে অযোধ্যার নবাবের শিবিরে নিয়ে গেল। কিছুদিন পরে সুজা-উদ্দৌলার সঙ্গে বক্সারে ইংরেজদের যুদ্ধ হল (২২ অক্টোবর ১৭৬৪)। সেনাপতি মনরোর (Munro) নেতৃত্বে ইংরেজরা জয়ী হল। শাহ আলম ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সুজাউদ্দৌলা ও মীর কাশিম রোহিলখণ্ডে পলায়ন করলেন। কোম্পানীর ফৌজ অযোধ্যা বিধ্বস্ত করল। সুজাউদ্দৌলা রাজ্য হারালেন। মীর কাশিম রোহিলখণ্ড ত্যাগ করলেন। বহুদিন পরে —সম্ভবতঃ ১৭৭৭ সালে—কপর্দকহীন অবস্থায় দিল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

বঙ্কিম চন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে (১৮৭৫) মীর কাশিম বলছেন: 'যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব। আমি সিরাজদ্দৌলা নহি বা মীর জাফরও নহি।' মীর কাশিমের রাজস্ব-ব্যবস্থা তাঁর প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় দেয় না।

গিরিশ চন্দ্র ঘোষের 'মীর কাসিম' নাটক স্বদেশী আন্দোলনের উম্মাদনার সূচনাতে (১৯০৫) রচিত হয়েছিল। এখানে মীর কাশিম প্রজাহিতৈষী, স্বাধীনতার পূজারী আদর্শ শাসক। তিনি বলছেন: 'কিরূপে বিদেশীর পীড়ন হতে বঙ্গমাতাকে রক্ষা করবো, কিরূপে দীন প্রজার দুঃখ নিবারণ করবো, কিরূপে স্বাধীনতার ধ্বজা আবার বঙ্গে উড্ডীন হবে, এই চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান—শত্রু দমন বা প্রাণ বিসর্জন।' এই সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক চিত্র ভাবোন্মত্ত বাঙালীর স্বাদেশিকতার পুষ্টিসাধন করেছিল।

আলিবর্দি মীর কাশিমকে নবাব সরকারে চাকুরি দিয়েছিলেন, তাঁর আগ্রহে মীর জাফর মীর কাশিমকে কন্যা দান করেছিলেন। আলিবর্দির আদরের দুলাল সিরাজকে মীর কাশিম ধরিয়ে দিয়েছিলেন, পলায়নের সময় এই হতভাগ্য যুবকের কাছে যে ধনরত্ন ছিল তা' তিনিই আত্মসাৎ করেছিলেন। মসনদ হারাবার পর মীর জাফর কলকাতায় আশ্রয় নিলেন, কারণ তাঁর আশংকা ছিল যে মুর্শিদাবাদে থাকলে মীর কাশিমের হাতে তাঁর প্রাণ বিপন্ন হবে। আলিবর্দি ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করেছিলেন সামরিক প্রয়োজনে। সিরাজের হত্যা রাজনৈতিক

কারণে অত্যাবশ্যক ছিল, কারণ তিনি বেঁচে থাকলে ফরাসীদের সাহায্যে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু মীর কাশিম মুঙ্গেরে এবং পাটনায় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন তার দ্বারা তাঁর কোন রাজনৈতিক বা সামরিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নি। তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ভ্যান্সিটার্ট লিখেছেন, স্বাভাবিক ভীরুতা এবং গভীর নৈরাশ্য তাঁকে প্রতিহিংসা গ্রহণের দিকে চালিত করেছিল।[১] কিন্তু প্রতিহিংসার উন্মত্ততা তাঁকে তাঁর মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে নি, সুজাউদ্দৌলার সাহায্যে রাজ্য পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা তিনি স্থিরমস্তিষ্ক মানুষের মতই করেছিলেন।

ইংরেজদের টাকা এবং জমিদারী দিয়ে মীর কাশিম রাজ্যলাভ করেছিলেন। মীর জাফরের পিছনে নবাবের দরবারের প্রধান ব্যক্তিদের সমর্থন ছিল, মীর কাশিমের পিছনে এমন কোন সমর্থন ছিল না। ইংরেজেরা তাঁকে রাজ্যশাসনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে, এমন আশা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। মীর জাফর ও তাঁর সমর্থক ষড়যন্ত্রকারীরা মনে করে থাকতে পারেন যে ইংরেজেরা বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা পেলেই সন্তুষ্ট থাকবে, কারণ তারা এতদিন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের চেষ্টা করে নি। কিন্তু মীর জাফরের রাজত্বকালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে মীর কাশিমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। বাঘ রক্তের আস্বাদ পেলে শিকারকে ছাড়ে না, এটা বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র মীর কাশিমকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব রূপে অভিহিত করেছেন। আক্ষরিক দিক থেকে মীর কাশিমের স্বাধীনতা ছিল; তিনি সৈন্যদল সংগঠন করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী কোন নবাবের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না। মীর কাশিম যদি বিচক্ষণ শাসক এবং সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ হতেন, যদি তাঁর সৈন্যদলের সামরিক দক্ষতা থাকত, তবে হয়তো তিনি ইংরেজদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন। রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টাকে খুব সীমিত অর্থেই স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে গণ্য করা যায়। যে সর্তে, যে অবস্থায় তিনি জরাগ্রস্ত শ্বশুরকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজদের হাত ধরে মসনদে বসেছিলেন তাতে স্বাধীনতা রক্ষার কল্পনা সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল। পূর্ববর্তী বিদেশী মুসলমান ভাগ্যান্বেষীদের মত মীর কাশিমও বাংলাকে খেলার পুতুলের

১। 'The hoarded resentment of all the injuries which he had sustained···took entire possession of his mind, now rendered frantic by his natural timidity and the frightful prospect before him drove from thence every other principle, till it had glutted itself with the blood of all within his reach who had···become obnoxious to his revenge'. (*Narrative of Transactions in Bengal*).

মত ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চেয়ে অনেক বেশি কৌশলী ও শক্তিমান বিদেশীদের কাছে তিনি হেরে গেলেন।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন:

'আলীবর্দীর মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যে যে ইংরেজ শক্তি বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার প্রধান কারণ—সমরকৌশলের অভাব, নবাবদের চরিত্রহীনতা, প্রধান প্রধান বাঙালী নায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই মনুষ্যত্বের অভাব, স্বার্থপরতার চরম বিকাশ ও সাধারণ লোকের রাজনীতি-বিষয়ে গভীর ঔদাসীন্য। অসত্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্রূরতা, স্বার্থপরতা, বিলাস-ব্যসন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা—ইহাই ছিল তৎকালে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক প্রকৃতি। হিন্দু মুসলমান উভয়েরই যে পুরুষত্বের ও সৎ চরিত্রের অভাব চরমে পৌঁছিয়াছিল, তাহাই বাংলার অধঃপতনের ও অবনতির প্রধান কারণ। পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় কোন আকস্মিক কারণে ইহা ঘটে নাই, বহুদিন হইতেই ইহার বীজ অংকুরিত হইতেছিল।'[২]

২। কোম্পানীর দেওয়ানী

মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধের সূচনাতেই কোম্পানীর হাতের পুতুল মীর জাফর আবার মসনদে বসলেন। তাঁর সঙ্গে কোম্পানীর নতুন সন্ধি হল (১০ জুলাই ১৭৬৩)। ইংরেজেরা বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করল, কেবল লবণের উপর আড়াই টাকা শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা থাকল। বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামে তাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রইল। কলকাতায় কোম্পানীর টাঁকশালে তৈরী মুদ্রা বিনা বাটায় (batta) বাংলার সর্বত্র চালু হল। নবাবের সামরিক শক্তি সংকুচিত করার জন্য ব্যবস্থা হল যে নবাবী ফৌজে ১২,০০০ অশ্বারোহী এবং ১২,০০০ পদাতিকের বেশি সৈন্য থাকবে না। বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজদের আশ্রিত সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে মীর জাফরের নামে সুবাদারীর সনদ নেওয়া হল—বার্ষিক ২৮ লক্ষ টাকা কর দেবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে (জানুয়ারী ১৭৬৫)। অল্প দিন পরেই জরাপীড়িত, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মীর জাফরের মৃত্যু হল (৫ ফেব্রুয়ারী ১৭৬৫)। ইংরেজেরা তাঁর নাবালক পুত্র নজমউদ্দৌলাকে মসনদে বসাল। তাঁর সঙ্গে নতুন সন্ধি হল (ফেব্রুয়ারী ১৭৬৫)। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা ইংরেজদের মনোনীত একজন 'নায়েব সুবাদারে'র হাতে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা হল, নবাব কোম্পানীর বৃত্তিভোগী পুতুল হয়ে রইলেন। কোম্পানী পরোক্ষভাবে বাংলার শাসনভার হস্তগত করল, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করল না। মানদণ্ডের আড়ালে রাজদণ্ড লুকিয়ে রইল, শক্তিহীন নবাবের ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে রইল কোম্পানীর থাবা।

২। 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (মধ্য যুগ), ২১৫ পৃষ্ঠা।

কয়েক মাস পর ক্লাইভ আবার গভর্নর হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন (মে ১৭৬৫)। এলাহাবাদে গিয়ে তিনি অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং কোম্পানীর আশ্রিত দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করলেন। সুজাউদ্দৌলাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হল, কারণ অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণের সামর্থ্য এবং ইচ্ছা কোম্পানীর ছিল না। বিনিময়ে নবাব কোম্পানীকে দিলেন নগদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং বাণিজ্যসংক্রান্ত কিছু অধিকার। এই ব্যবস্থার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই অযোধ্যায় কোম্পানীর প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হল, উত্তর ভারতে মারাঠাদের বিরুদ্ধে নবাবকে ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া গেল। নবাবের রাজ্যের অন্তর্গত এলাহাবাদ কোম্পানীর হস্তগত হল। কোম্পানী এলাহাবাদ দিয়ে দিল শাহ আলমকে। তিনি এখানে কোম্পানীর আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন। কোম্পানীকে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী দিয়ে তিনি এক 'ফর্মান' জারি করলেন (১২ আগস্ট ১৭৬৫)। বিনিময়ে কোম্পানী তাঁকে বাংলার রাজস্ব থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা পাঠাবে, এই ব্যবস্থা হল। এই টাকা দিয়ে, এবং 'নিজামতে'র ব্যয় নির্বাহ করে, বাংলার রাজস্ব থেকে যা' উদ্বৃত্ত হবে তা' কোম্পানীর প্রাপ্য হবে, 'ফর্মানে' একথা স্পষ্টভাবে বলা হল।

মোগল আমলে প্রত্যেক সুবার দেওয়ান সাক্ষাৎভাবে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং তাঁর কাজকর্মের জন্য সাম্রাজ্যের দেওয়ানের কাছে দায়ী থাকতেন। কোন ব্যক্তিকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা হত; কোম্পানীর মত কোন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ান নিযুক্ত করার ব্যবস্থা মুসলমান আইনে ছিল না। দেওয়ান নিযুক্ত এবং বরখাস্ত হতেন সম্রাটের খুসি মত, কোন দেওয়ান স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হতেন না। কিন্তু শাহ আলম কোম্পানীকে দেওয়ান নিযুক্ত করলেন চিরকালের জন্য ('for ever and ever')। প্রকৃত পক্ষে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর পাবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে শাহ আলম কোম্পানীকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ইজারা দিলেন। কোম্পানী এই প্রতিশ্রুতি পালন না করলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না। ১৭৭২ সালে তিনি মারাঠাদের আশ্রয় গ্রহণ করে এলাহাবাদ থেকে দিল্লীতে চলে যান। তখন ওয়ারেন হেস্টিংস বার্ষিক কর দেওয়া বন্ধ করে দেন। দেওয়ানীর প্রধান সর্ত ভঙ্গ করার পরও কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় অধিকার ত্যাগ করে নি।

মুর্শিদকুলি খাঁ সুবাদারী লাভের পর বাদশাহী দরবারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেই বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। পরবর্তী নবাবদের আমলেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। দেওয়ানদের স্বাধীন কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হল, তাঁরা নবাবদের অধীন কর্মচারী হয়ে পড়লেন, দিল্লীর সঙ্গে তাঁদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অর্ধ শতাব্দী পরে শাহ আলম এই ব্যবস্থা বাতিল করলেন, ক্ষমতাশালী পূর্ব-পুরুষদের (Great Mughals) মত তিনি নিজেই বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন—

যদিও তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছিল না, তিনি নিজের ভরণ-পোষণের জন্য ইংরেজদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণে ক্লাইভ পুতুল বাদশাহকে বার্ষিক কর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেওয়ানী গ্রহণ করেছিলেন। কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় বণিকেরা (ফরাসী, ওলন্দাজ) দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বাংলায় তাদের বাণিজ্য বন্ধ হয় নি। কোম্পানী সরাসরি বাংলার রাজস্ব আত্মসাৎ করলে তারা অসন্তুষ্ট হত এবং সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার কাছে নালিশ করত। তার ফলে কোম্পানীর পক্ষে খুব অসুবিধা ('very embarrassing consequences') হতে পারত, কারণ ইংলণ্ডে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠি ছিল। কোম্পানী যদি মোগল আমলে প্রচলিত আইন অনুসারে বাংলার রাজস্বের উপর কর্তৃত্ব করে তবে কারও কোনরকম অভিযোগের কারণ থাকবে না। মোগল সম্রাটের কোন ক্ষমতা না থাকলেও আইনতঃ তিনিই বাংলার সুবাদার এবং দেওয়ান নিয়োগ করার একমাত্র অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে দেওয়ানী নিয়ে কোম্পানীর অধিকার আইনের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

'নিজামত' (অর্থাৎ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ফৌজদারী মামলার বিচারের দায়িত্ব) কয়েক মাস পূর্বেই (ফেব্রুয়ারী ১৭৬৫) কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন হয়েছিল—নজমউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধির মাধ্যমে। 'দেওয়ানী' (অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা এবং দেওয়ানী মামলার বিচারের দায়িত্ব) কোম্পানীর হস্তগত হল শাহ আলমের 'ফর্মানে'র মাধ্যমে। শাসনসংক্রান্ত কোন ব্যাপারই কোম্পানীর আওতার বাইরে রইল না। কিন্তু 'নিজামতে'র কার্যভার দেওয়া হল কোম্পানীর মনোনীত 'নায়েব সুবাদারে'র বা 'নায়েব নাজিমে'র উপরে, আর 'দেওয়ানী'র কার্যভার দেওয়া হল কোম্পানীর মনোনীত 'নায়েব দেওয়ানে'র উপরে। পর্দার আড়ালে থেকে শাসনের এই বিচিত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন ক্লাইভ।

'নায়েব সুবা (দার)' এবং 'নায়েব দেওয়ান'—দুটি পদে একই ব্যক্তি নিযুক্ত হলেন—বাংলায় মোহাম্মদ রেজা খাঁ, বিহারে রাজা ধীরাজ নারায়ণ (পরে রাজা সিতাব রায়)। কোম্পানীর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা 'নিজামত' এবং 'দেওয়ানী'—দুই বিভাগের কাজ চালাতে লাগলেন। মোগল আইনের দিক থেকে বাদশাহের প্রতিনিধি হলেন 'নিজামত' বিভাগে নবাব এবং 'দেওয়ানী' বিভাগে কোম্পানী। ইংরেজের ব্যবস্থা অনুসারে নবাবের প্রতিনিধি হলেন 'নায়েব সুবা' এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি হলেন 'নায়েব দেওয়ান'। দুই নায়েবের পদে কোম্পানী একই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করল এবং তাঁকে শাসন ও শোষণের যন্ত্র রূপে ব্যবহার করতে লাগল। এই ব্যবস্থা সাধারণতঃ 'দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা' (Double Government) নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা এবং পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল কোম্পানীর হাতে। তবে কোম্পানী সেই ক্ষমতা পরিচালনা করত বাদশাহ এবং নবাবের মুখোসের আড়াল থেকে।

ক্লাইভ নিজেই এটাকে 'masked system' আখ্যা দিয়েছিলেন। কার্যক্ষেত্রে কোম্পানীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হত।

কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে, হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের ফলে সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটেছিল। তাঁরা মীর জাফর এবং ইয়ার লতিফ খাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন, একথা বলা যায় না। এই অনৈতিহাসিক মন্তব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি অবাস্তব ধারণা প্রচলিত হয়েছে—ইংরেজেরা মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেবার পর তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতাও কেড়ে নিয়েছিল এবং সরকারী অনুগ্রহ হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করেছিল। রেজা খাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের ইতিহাস আলোচনা করলে ইংরেজদের মুসলমান-প্রীতি ধরা পড়ে।

নবাবী আমলে যে সকল বিদেশী মুসলমান ভাগ্যান্বেষী বাংলায় এসে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য লাভ করেছিল তাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন রেজা খাঁ। তাঁর জন্ম হয়েছিল পারস্যে। বাংলায় তাঁর আগমন আলিবর্দি খাঁর রাজত্বকালে। তাঁর প্রথম চাকুরি সিরাজের আমলে: ১৭৫৬ সালে তিনি কাটোয়ার ফৌজদার হয়েছিলেন। ১৭৬০-৬১ সালে ছিলেন চট্টগ্রামের ফৌজদার। মীর জাফরের দ্বিতীয় বার মসনদ লাভের পর তিনি হলেন ঢাকার 'নায়েব নাজিম' (১৭৬৩-৬৫)। ইংরেজেরা তাঁকে 'নায়েব সুবা' নিযুক্ত করল (মার্চ ১৭৬৫) দুটি কারণে। প্রথমতঃ, নবাবের দরবারে মহারাজা নন্দকুমারের প্রতিপত্তি ধ্বংস করা। (নন্দকুমারের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ইংরেজদের অজ্ঞাত ছিল না)। দ্বিতীয়তঃ, নাবালক নবাব নজমউদ্দৌলার উপরে কোম্পানীর পূর্ণ বিশ্বাসভাজন এক ব্যক্তিকে চাপিয়ে দেওয়া। তার পরেই রেজা খাঁকে 'নায়েব দেওয়ান' করা হল। ১৭৭২ সালে হেস্টিংস লিখেছিলেন যে তাঁকে বাংলায় 'সার্বভৌম ক্ষমতা' ('sovereignty') দেওয়া হয়েছে।

মুসলমান রাজত্ব যারা ধ্বংস করেছিল তাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রেজা খাঁর কোন আপত্তি ছিল না। তাঁর জীবনীলেখক বাংলাদেশী এক ঐতিহাসিক বলেছেন, তৈমুরশাহীর কাঠামোর মধ্যে এক রকম ইঙ্গ-মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য ছিল ('aimed at a sort of Anglo-Mughal rule within the framework of Timurid sovereignty') [৩]। কিন্তু ১৭৭২ সালে হেস্টিংস যখন বাদশাহের প্রাপ্য বার্ষিক কর দেওয়া বন্ধ করে দিলেন, কোম্পানীর রাজত্ব তৈমুরশাহীর কাঠামো থেকে বাইরে চলে এল, তখনও রেজা খাঁ পদত্যাগ করলেন না। একবার বরখাস্ত হয়ে, ইংরেজদের নির্যাতন ভোগ করেও তিনি আবার তাদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করলেন। শেষে ১৭৯০ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস 'নায়েব সুবা'র পদ বিলুপ্ত করে তাঁকে কর্মচ্যুত করলেন।

গোড়ার দিকে রেজা খাঁর বার্ষিক বেতন ছিল নয় লক্ষ টাকা। ১৭৭১ সালে

৩। আবদুল মজেদ খাঁ, *The Transition in Bengal*, ১৩ পৃষ্ঠা।

বিলাতের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে এটা কমিয়ে করা হয় পাঁচ লক্ষ টাকা। পরে তাঁর বিরুদ্ধে কয়েক দফা অভিযোগ উপস্থিত করা হল: (১) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০) সময় খাদ্য শস্যের একচেটিয়া ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা লুটে নেওয়া ; (২) বল-প্রয়োগ এবং অত্যাচারের মাধ্যমে ('by violent and oppressive means') রাজস্ব আদায় করা এবং তার এক বৃহৎ অংশ ('great part') আত্মসাৎ করা ও নিজের অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া; (৩) কোম্পানী নবাবের ভরণপোষণের জন্য যে বৃত্তি দিত তার অপ-ব্যবহার করা। ১৭৭৪ সালে কলকাতা কাউন্সিল তাঁকে সকল অভিযোগ থেকে মুক্তি দিল।

ইতিমধ্যে কোম্পানী দেওয়ানীর দায়িত্ব সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করেছিল (১৭৭২)। তার ফলে 'নায়েব দেওয়ানে'র পদ বিলুপ্ত হয়েছিল। ১৭৭৫ সালে বিলাতের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে রেজা খাঁকে আবার 'নায়েব সুবা' নিযুক্ত করা হল। তাঁর সদর হল মুর্শিদাবাদে। ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থায় তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। হেস্টিংস একবার তাঁকে পদচ্যুত করলেন, কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে তাঁর পুনর্নিয়োগ হল। ১৭৯০ সালে 'নায়েব সুবা' পদটি তুলে দেওয়া হল।

১৭৬৫ সালে সমগ্র-বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থা কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন হল। এই ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। কলকাতায় কোম্পানীর সার্ব-ভৌম অধিকার মীর জাফরের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তিনিই কোম্পানীকে চব্বিশ পরগণায় জমিদারী স্বত্ব দিয়েছিলেন। মীর কাশিম মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং চট্টগ্রাম কোম্পানীর হাতে দিয়েছিলেন। এগুলিকে হস্তান্তরিত জেলা (Ceded Districts) বলা হত। এর বাইরে 'দেওয়ানী জমি' ('Dewani lands') —যেখানে বাদশাহী 'ফর্মান' অনুসারে কোম্পানী দেওয়ানী অধিকার লাভ করেছিল। কয়েক বৎসর (১৭৬৫—৭২) আমীল, তহসিলদার প্রভৃতি নবাবী আমলের কর্মচারীরা 'নায়েব দেওয়ানে'র তত্ত্বাবধানে ভূমি-রাজস্ব আদায় করত। হস্তান্তরিত জেলাগুলিতে ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৭৬৯ সালে দেওয়ানী এলাকায় ইংরেজ পর্যবেক্ষক (Supervisor) নিয়োগের নীতি গৃহীত হল। ইতিমধ্যে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থার নানা রকম ত্রুটি ধরা পড়েছিল। বিলাতের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে এই ব্যবস্থা বাতিল করে নবনিযুক্ত গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ভূমি-রাজস্ব আদায়ের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। 'নায়েব দেওয়ানে'র পদ তুলে দেওয়া হল (১৭৭২)। এই সময়েই শাহ আলমকে বার্ষিক কর পাঠাবার বন্দোবস্ত বাতিল করা হল। বাংলার শাসন সম্বন্ধে ক্লাইভ যে ব্যবস্থা করেছিলেন তার আমূল পরিবর্তন ঘটল।

দেওয়ানী আমলের শেষ দিকে বাংলা ১১৭৬ সালের (১৭৭০) ভয়াবহ মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারাল। দুর্ভিক্ষের মূল কারণ

ছিল খরা, কিন্তু এর প্রকোপ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল শাসন-সংক্রান্ত অব্যবস্থা এবং কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের অর্থলোভের ফলে। বাংলার রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা রেজা খাঁ টাকায় ২৫।৩০ সের চাল কিনে পরে টাকায় ৩।৪ সের দরে বেচে নিজের অর্থভাণ্ডার স্ফীত করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। ক্ষুধার্ত মানুষকে সাহায্য দেবার অতি সামান্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৭৬৯-৭০ সালে ভূমি-রাজস্বের শতকরা মাত্র ছয় টাকা মকুব করা হয়েছিল, কিন্তু ১৭৭০-৭১ সালে আদায়ীকৃত ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৪]

এই ভয়াবহ ঘটনার জন্য বিদেশী শাসকশ্রেণীর দায়িত্ব বিচার করতে গেলে মোগল আমলের কথা মনে রাখা আবশ্যক। আকবরের রাজত্বকালে (১৫৯৪—৯৮) এক দুর্ভিক্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গে এক সমসাময়িক লেখক বলেছেন: মানুষ মানুষের মাংস খেয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করত, তবু মৃতদেহের স্তূপে পথঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শাহ জাহানের রাজত্বকালে (১৬৩০—৩২) দক্ষিণ ভারতে এবং গুজরাটে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সরকারী ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরী বলেছেন, মৃত মানুষের হাড় চূর্ণ করে ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত, ছাগলের মাংস বলে কুকুরের মাংস বিক্রয় হত, মানুষ অন্য মানুষের মাংস—এমন কি, নিজের ছেলের মাংস—খেতে দ্বিধা করত না।[৫] আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের শেষ দিকে (১৭০২) দক্ষিণ ভারতে এক দুর্ভিক্ষে ২০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। বিপন্ন পিতামাতা আট আনা বা চার আনা দামে সন্তান বিক্রয় করতে চাইত, কিন্তু ক্রেতা জুটত না।

৩। ওয়ারেন হেস্টিংস

বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings) এক স্মরণীয় পুরুষ। ক্লাইভের মত তিনিও কোম্পানীর অধীনে কেরানী (Writer) হয়ে ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু ক্লাইভের মত তিনি মসি ছেড়ে অসি গ্রহণ করেন নি। তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলায়, তবে কিছুকাল তিনি মাদ্রাজে কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। বাংলায় কাউন্সিলের সভ্য রূপে তিনি ভ্যান্সিটার্টের সহযোগিতা করে বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে মীর কাশিমের বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। এই পদ থেকে অবসর নিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। পরে ১৭৭২ সালে তিনি বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন

৪। দ্রষ্টব্য: দীপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলার মন্বন্তর'।

৫। 'For a long time dog's flesh was sold for a goat's flesh, and the pounded bones of the dead were mixed with flour and sold ...men began to devour each other, and the flesh of a son was preferred to his love'.

করেন। ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলার গভর্নর। ১৭৭৪ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'বাংলার গভর্নর-জেনারেল'। ১৭৭৩ সালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থের (Lord North) নেতৃত্বে পার্লামেণ্ট ভারত সম্বন্ধে 'নিয়ন্ত্রণ আইন' (Regulating Act) পাশ করেছিল। এই আইনে বাংলার গভর্নরকে 'বাংলার গভর্নর-জেনারেল' আখ্যা দেওয়া হয়। দীর্ঘকাল পরে, ১৮৩৩ সালের সনদ আইনে (Charter Act), বাংলার গভর্নর-জেনারেল আখ্যাটি পরিবর্তন করে 'ভারতের গভর্নর-জেনারেল' করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক হলেন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল।

'নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি করা। এই আইনের দুটি ব্যবস্থা বাংলার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ, বাংলার গভর্নর-জেনারেলকে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর গভর্নরের চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদা দেওয়া হল। কোন কোন বিষয়ে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর গভর্নর ও কাউন্সিলকে বাংলার গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের কর্তৃত্বাধীন করা হল। ১৭৮৪ সালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছোট উইলিয়ম পিটের (William Pitt the Younger) নেতৃত্বে পার্লামেণ্ট 'ভারত আইন' (Pitts India Act) পাশ করেছিল। এই আইনের ব্যবস্থা অনুসারে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর গভর্নর ও কাউন্সিলের উপর বাংলার গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের কর্তৃত্বের পরিধি বাড়ানো হল। এতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রেসিডেন্সী (মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতা) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল ; তাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র ছিল লণ্ডনে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের (Court of Directors) প্রতি আনুগত্য। 'নিয়ন্ত্রণ আইন' তাদের মধ্যে ভারতেই যোগসূত্র স্থাপন করল ঃ একটি সীমিত ক্ষেত্রে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর উপর কলকাতার কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। ভারতবর্ষে কোম্পানীর অধিকৃত সকল রাজ্য-খণ্ডের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সূচনা হল। এই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী হল কলকাতা।

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বাংলা কখনও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হতে পারে নি। বাংলা চিরকালই প্রত্যন্ত প্রদেশ রূপে অবহেলিত হয়েছে। সুলতানী আমলে স্বাধীন বাংলা ভারতের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করা দূরে থাকুক, প্রভাবিত করতেও পারে নি। মোগল আমলে বাংলা ছিল দিল্লীর ঐশ্বর্যের জোগানদার মাত্র। ইংরেজ আমলে সেই বাংলা হল ভারতের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ইংরেজের স্থাপিত কলকাতায় বাঙালীর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্রোত নতুন খাতে প্রবাহিত হল।

দ্বিতীয়তঃ, 'নিয়ন্ত্রণ আইন' অনুসারে কলকাতায় 'সুপ্রীম কোর্ট' (Supreme Court) প্রতিষ্ঠিত হল (১৭৭৪)। ১৭২৬ সালের এবং ১৭৫৩ সালের সনদ (King's Charter) অনুসারে কলকাতায় যে বিচারালয় (Mayor's Court)

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নানারকম ত্রুটিবিচ্যুতি এবং অসম্পূর্ণতা ছিল। কলকাতার জনসংখ্যা ও গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছিল, তাই উন্নত বিচার-ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। সুপ্রীম কোর্ট ছিল ইংলণ্ডের রাজার বিচারালয় (King's Court), কোম্পানীর বিচারালয় (Company's Court) নয়। বিচারকদের নিযুক্ত করতেন রাজা। তাঁদের উপর কোম্পানীর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল না। কলকাতার সকল অধিবাসী দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন ছিল। কলকাতার বাইরে বাংলার সর্বত্র সকল রকম মামলার বিচার করত কোম্পানীর বিভিন্ন আদালত; তবে ইংলণ্ডের রাজার কোন প্রজা (British subject) কলকাতার বাইরে থাকলেও সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন হত, কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় কোম্পানীর কোন আদালতে তার বিচার হত না। সুপ্রীম কোর্টের অধিকারের সীমা সম্বন্ধে আইনে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় নানা রকম গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টে বিচার হত ইংলণ্ডের আইন (English Law) অনুসারে, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের তৈরী আইন (Regulation) সেখানে গ্রাহ্য হত না। ১৭২৬ সালের সনদ অনুসারে সেই সময় থেকেই কলকাতায় ইংলণ্ডের আইন অনুসারে বিচার হত।

সুপ্রীম কোর্টের বিচার-পদ্ধতি সব দিক থেকেই ভারতীয় সমাজের অনুপযোগী ছিল। আদালতের ভাষা ছিল ইংরেজী, কোম্পানীর আদালতের ভাষা ছিল ফার্সি। ফার্সি-জানা মানুষ অনেক ছিল, ইংরেজী-জানা মানুষ মোটেই ছিল না। মামলায় দু'রকম আইনজ্ঞ নিযুক্ত করতে হত—অ্যাটর্নী বা সলিসিটর (Attorney, Solicitor) এবং ব্যারিস্টার (Barrister)। সকলেই ইংরেজ, সকলকেই প্রচুর ফি দিতে হত। আইনের (procedural law) জটিলতার জন্য মামলার নিষ্পত্তি হতে অনেক সময় লাগত, মক্কেলের ব্যয়বৃদ্ধি হত। মফঃস্বল নিবাসী কোন ইংরেজের বিরুদ্ধে সামান্য মামলা করতে হলেও দেশীয় লোককে কলকাতায় এসে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করতে হত। তাতে ব্যয়বাহুল্য হত, তা' ছাড়া নিজের বাড়ীঘর ও কর্মস্থল ছেড়ে কলকাতায় এসে থাকতে হত। ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে যে আইন তৈরী হয়েছিল ভারতের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তার সঙ্গতি ছিল না। যেমন, ইংলণ্ডে জালিয়াতির জন্য মৃত্যু দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এ দেশে জালিয়াতি সামান্য অপরাধ বলে গণ্য করা হত।

জালিয়াতির অপরাধে ১৭৬৫ সালে কলকাতায় ইংরেজদের আদালত রাধাচরণ মিত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। তখন কলকাতার ৯৫ জন প্রধান নাগরিক এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন এই যুক্তিতে যে ইংলণ্ডের আইন এদেশে প্রযোজ্য নয়। আইনের বিচারে এই যুক্তি খুব সম্ভবতঃ ভিত্তিহীন ছিল, কিন্তু আবেদনের ফলে দণ্ড মকুব করা হয়েছিল। ১৭৭৫ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে জালিয়াতির অপরাধে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল। তখন

ইংলণ্ডের আইন প্রয়োগের যুক্তিযুক্ততার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। তবে ব্রাহ্মণের মৃত্যুদণ্ডে বাঙালী সমাজে আতংক জন্মেছিল, কারণ ব্রাহ্মণ অবধ্য—এটা ছিল বহু শতাব্দীর প্রচলিত সংস্কার।

নন্দকুমারের মামলা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ, তিনি নবাবী আমলের অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, কলকাতার কাউন্সিলে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল (Majority) নানাভাবে হেস্টিংসের বিরোধিতা করছিল তার সঙ্গে নন্দকুমারের যোগ ছিল। তাই এ রকম সন্দেহের কারণ ছিল যে হেস্টিংস তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়ে সুপ্রীম কোর্টের সাহায্যে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলাইজা ইম্পে (Sir Elijah Impey) ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু। মামলা চলার সময় তিনি নানাভাবে নন্দকুমার সম্বন্ধে বিরোধী মনোভাব দেখিয়েছিলেন। নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হবার পর তাঁকে ক্ষমা (reprieve) করার আইনসঙ্গত অধিকার প্রধান বিচারপতির ছিল, কিন্তু তিনি সেই অধিকার প্রয়োগ করেন নি।

এই জটিল মামলার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রসিদ্ধ আইনবিদ স্যার জেম্‌স্‌ স্টিফেন (Sir James Stephen) সিদ্ধান্ত করেছেন যে নন্দকুমারের ফাঁসি সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত হয়েছিল।[৬] ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন প্রবীণ ইংরেজ সদস্য বলেছেন, নন্দকুমারের ফাঁসি ছিল বিচারের মাধ্যমে হত্যা ('judicial murder')।[৭] রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঘটনাটির বিচার করে পার্লামেণ্টে বার্ক (Burke) বলেছিলেন: নন্দকুমার যখন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন তখন তাঁকে এক কল্পিত অপরাধের জন্য বেআইনী ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।[৮]

নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরোধিতা করেছিলেন, তাই কোন কোন বাঙালী নাট্যকার তাঁকে 'শহীদ' রূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে নন্দকুমার ছিলেন স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতক।[৯] তিনি ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষে, মীর কাশিমের শত্রু ক্লাইভের আজ্ঞাবহ, রায় দুর্লভের সহকারী এবং মীর জাফরের মন্ত্রী ও মন্ত্রণাদাতা'। হেস্টিংস তাঁর পুত্র গুরুদাসকে নাবালক নবাবের অভিভাবিকা মণি বেগমের দেওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন, এবং ইংরেজ মহলে তিনি 'বৃদ্ধ শৃগাল' ('old jackal') নামে পরিচিত হলেও কোন

৬। *The Trial of Nuncomar and the Inpeachment of Impey* (স্টিফেন বড়লাট লর্ড মেয়োর সময়ে ভারত সরকারের আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন।)

৭। Beveridge, *Trial of Nanda Kumar*.

৮। Nanda Kumar was 'hanged for a pretended crime, upon an *ex post facto* Act of Parliament, in the midst of his evidence against Mr. Hastings'.

৯। দ্রষ্টব্য: সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, 'বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা' ৫৮৬-৫৭৫ পৃষ্ঠা।

রকমে তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করেন নি। তবু তিনি কাউন্সিলে হেস্টিংসের বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এবং তাঁদের কাজে নানাভাবে সহায়তা করে তাঁকে বিপর্যস্ত করেছিলেন। কলকাতার ভারতীয় সমাজে তিনি বিশ্বাস ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন না। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কাউন্সিলের হেস্টিংস-বিরোধী সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিসকে (Philip Francis) এক চিঠিতে লিখেছিলেনঃ 'ইংরেজ ভদ্রলোক, আর্মেনীয়, মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছে যে আমার বিরোধী নয়।' তাঁর এই করুণ স্বীকারোক্তির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রাধাচরণের ফাঁসির বিরুদ্ধে ৯৫ জন প্রধান নাগরিক আবেদন করেছিলেন, কিন্তু নন্দকুমারের ক্ষেত্রে আবেদন এসেছিল একজন অজ্ঞাতনামা ইংরেজের কাছ থেকে। কাউন্সিলের যে সব সদস্য তাঁর সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও চরম মুহূর্তে তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ী থেকে বহু জাল শীল-মোহর পাওয়া গেল। তিনি নানা রকম জালিয়াতিতে লিপ্ত না থাকলে এটা সম্ভব হত না।

নন্দকুমারের মৃত্যুতে হেস্টিংসের পথের কাঁটা দূর হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা তাঁর চেষ্টার ফলে ঘটেছিল কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁর পরিবর্তে নন্দকুমার কর্তৃক সমর্থিত কাউন্সিলের বিরোধী সদস্যদের হাতে শাসন-ক্ষমতা গেলে বাংলার কোন উপকার হত, একথা বলা যায় না। সুতরাং নন্দকুমার ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেন নি, লড়াই করেছিলেন এমন একজন ইংরেজের বিরুদ্ধে যিনি নামে গভর্নর-জেনারেল থেকেও কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরোধিতায় প্রকৃত ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। নন্দকুমারের পক্ষে এটা ছিল নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য লড়াই।

যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা হয় যে নন্দকুমারের মৃত্যুর জন্য হেস্টিংসই দায়ী ছিলেন তবে এই ঘটনার একটি বিশেষ তাৎপর্য লক্ষ্য করা উচিত। শাসন-যন্ত্রের শীর্ষে অবস্থিত ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর শত্রু এক ব্যক্তিকে পৃথিবী থেকে সরাবার জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেই আদালতে মোট চার জন বিচারক ছিলেন। প্রধান বিচারপতি যদি প্রকৃতই হেস্টিংসের পক্ষপাতী হয়ে থাকেন তবু তাঁর মত অনুযায়ী রায় দিতে অন্য বিচারকেরা বাধ্য ছিলেন না, তাঁদের উপর তাঁর কোন রকম কর্তৃত্ব ছিল না। বিচার হয়েছিল ইংলণ্ডের আইন অনুসারে—যে আইন অনুসারে দশ বৎসর আগে রাধাচরণের মামলায় একই অপরাধে একই দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই দণ্ডাদেশ মকুব করা হয়েছিল কলকাতার ৯৫ জন প্রধান ভারতীয় নাগরিকের আবেদনে। নন্দকুমারের ক্ষেত্রে একজন ভারতীয় নাগরিকের কাছ থেকেও এরকম আবেদন পাওয়া যায় নি। গুরুদাস পিতার পক্ষ সমর্থনের জন্য দু'জন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ব্যারিস্টারকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরা দীর্ঘ আট দিন আদালতে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছিলেন। বিচার হয়েছিল প্রকাশ্য আদালতে। জুরীরা একমত হয়ে

নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারপতিরা একমত হয়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। মামলার পূর্ণ বিবরণ নথিবদ্ধ হয়েছিল। সে সব কাগজপত্র এখনও পরীক্ষা করা সম্ভব।

মুসলমান শাসনকালে এরকম ঘটনা সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিরুদ্ধাচরণ করলে তার অবশ্যম্ভাবী শাস্তি ছিল মৃত্যু; সেজন্য কোন আদালতের বিচার প্রয়োজন হত না, অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেবার কথা উঠত না। সরাসরি ঘাতকের খড়গাঘাতে তার শিরচ্ছেদ হত। সে যদি রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিমান হত তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হত গুপ্ত ঘাতকের ছুরিকা বা বিষের পাত্র।

ইংরেজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই শাসকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার পরিবর্তে আইনের শাসন (Rule of Law) প্রবর্তনের সূচনা হল। ইংরেজ জাতির ঐতিহ্য অনুযায়ী এটাই স্বাভাবিক ছিল। ইংরেজের আইনে এবং বিচার-পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি ছিল। অনেক সময় কেতাদুরস্ত বিচারের ফলে বিচারের নামে কার্যতঃ অবিচার হত। কিন্তু সিরাজ যে ভাবে বিনা বিচারে ঘসিটি বেগমের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছিলেন সেভাবে হেস্টিংস নন্দকুমারের বাড়ীতে সঞ্চিত ৫০।৫২ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করতে পারতেন না, কোন ইংরেজ শাসকের পক্ষে মজা দেখার জন্য গঙ্গায় নৌকা ডুবিয়ে মানুষ খুন করাও সম্ভব ছিল না। নন্দকুমারের মামলা ভারতের ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করেছিল। এই নব যুগের প্রতীক ছিল সুপ্রীম কোর্ট।

* * *

হেস্টিংস নবাবী আমলের কাঠামো মোটামুটি বজায় রেখে বাংলার প্রশাসন ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করেছিলেন। নবাব মুর্শিদাবাদে রইলেন, কিন্তু তাঁর বার্ষিক বৃত্তি ৩২ লক্ষ টাকার বদলে ১৬ লক্ষ টাকা করা হল। 'খালসা' (সরকারী কোষাগার) মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় আনা হল। কলকাতা হল বাংলার রাজধানী। জোব চার্নকের আমলের গণ্ডগ্রাম ভারতের প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠল। এখানে এক নতুন নাগরিক সভ্যতার জন্ম হল। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোন্স 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (Asiatic Society) স্থাপন করলেন (১৭৮৩)। এই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হেস্টিংস। তিনি নিজে ফার্সি এবং বাংলা ভাল জানতেন, উর্দু এবং আরবিতেও তাঁর কিছু অধিকার ছিল। আরবি ও ফার্সি ভাষা চর্চার জন্য তিনি কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন (১৭৮১)। প্রাচ্য ভাষা চর্চার এতরকম ব্যবস্থা নবাবী আমলে কেউ কল্পনা করতে পারত না।

বিলাতের কর্তৃপক্ষ দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থার অবসান করে রাজস্ব বিভাগের সম্পূর্ণ কার্যভার ('the entire care and management of revenues') গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে হেস্টিংসকে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি বার

বার পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু কোন পদ্ধতিই ত্রুটিমুক্ত ছিল না। রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সংশিল্পষ্ট ছিল দেওয়ানী মামলার বিচারের ব্যবস্থা। দুটি কাজই কোম্পানীর দেওয়ানী অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার ছিল 'নিজামত' বিভাগের উপর। এই বিভাগের শীর্ষে ছিলেন নবাব; তাঁর প্রতিনিধি রূপে 'নায়েব সুবা' এই বিভাগ পরিচালনা করতেন। ফৌজদারী বিচারে হস্তক্ষেপ করার আইনসঙ্গত অধিকার কোম্পানীর ছিল না। কিন্তু কোম্পানীর মনোনীত 'নায়েব সুবা' কোম্পানীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। কলকাতার বিচার-ব্যবস্থা ছিল কোম্পানীর এবং নবাবের আওতার বাইরে—সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারে। কলকাতার বাইরে জেলাগুলিতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের সুবন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন; বিভিন্ন শ্রেণীর আদালত স্থাপিত হয়েছিল।

মফঃস্বলের আদালতগুলির উপর সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্ব ছিল না। তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করার জন্য, এবং তাদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শোনার জন্য, হেস্টিংস কলকাতায় দুটি উচ্চ বিচারালয় স্থাপন করলেন—সদর দেওয়ানী আদালত এবং সদর নিজামত আদালত। দুটি আদালতেই বিচারক ছিলেন গভর্নর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের সভ্যগণ। ১৭৭৫ সালে সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হল এবং 'নায়েব সুবা' রেজা খাঁর হস্তে এর কর্তৃত্ব-ভার ন্যস্ত হল। 'নিজামতে'র উপর কর্তৃত্ব নবাবের—কোম্পানীর নয়, এটা স্বীকৃত হল। রেজা খাঁ মফঃস্বলের ফৌজদারী আদালতগুলির বিচারক নিযুক্ত করতেন এবং তাঁদের কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। বিচারকেরা ছিলেন মুসলমান, তাঁরা মুসলমান আইন অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করতেন। হেস্টিংসের পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করলেন (১৭৯০)। সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল, গভর্নর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের সভ্যেরা আবার এখানে বিচারকের আসন গ্রহণ করলেন। প্রশাসনের সঙ্গে নবাবের যে নাম-মাত্র সম্পর্ক ছিল সেটা বিলুপ্ত হল। বাংলায় মধ্য যুগের অবসান হল।

সুশৃঙ্খল, সুনির্দিষ্ট, যুক্তিপূর্ণ আইন না থাকলে বিচার-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া অসম্ভব। কলকাতা শহরে ইংলণ্ডের আইন বলবৎ ছিল; কিন্তু ধর্ম সংক্রান্ত ও সামাজিক ব্যাপারে (বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি) সুপ্রীম কোর্টে হিন্দুদের পক্ষে হিন্দু আইন এবং মুসলমানদের পক্ষে মুসলমান আইন গ্রাহ্য হত। কলকাতার বাইরে ইংলণ্ডের আইন প্রযোজ্য ছিল না; কিন্ত কোন মফঃস্বল আদালতে কোন ইংরেজের বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা হলে সেটা সুপ্রীম কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হত এবং সেখানে ইংলণ্ডের আইন অনুসারে তার বিচার হত। কলকাতার বাইরে সব ফৌজদারী মামলার বিচার হত মুসলমান

আইন অনুসারে। হিন্দুরাও এই আইনের অধীন ছিল। 'নিজামতে'র বিলুপ্তির পরেও কোম্পানী এই মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নি। কোম্পানীর রাজত্বের অবসানের পর, ১৮৬০-৬১ সালে, দুটি আইনের (Indian Penal Code, Criminal Procedure Code) মাধ্যমে ফৌজদারী মামলায় নতুন বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট, সদর দেওয়ানী আদালত এবং সদর নিজামত আদালত সম্মিলিত করে হাইকোর্ট স্থাপিত হল (১৮৬১)। আইনের ক্ষেত্রে এখানেই মধ্য যুগের অবসান হল।

ব্রিটিশ ভারত সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আইন (Act) প্রণয়নের সার্বভৌম অধিকার ছিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের। কোম্পানীর সরকার কেবলমাত্র সীমিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন (Regulation) প্রণয়নের অধিকারী ছিল। ১৮৩৩ সালের সনদে ভারত সরকারকে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

হেস্টিংস বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেই দেওয়ানী বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে 'রেগুলেসন' রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পে। সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে হেস্টিংস হিন্দু আইনের প্রধান ব্যবস্থাগুলি সংকলনের বন্দোবস্ত করেন। এই গ্রন্থের ফার্সি অনুবাদ করা হয়। ফার্সি অনুবাদের ইংরেজী অনুবাদ (Code of Gentoo Laws) প্রস্তুত করেছিলেন হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed)। মুসলমান আইন সম্বন্ধে হেস্টিংস বিশেষ কিছু করতে পারেন নি, কারণ এটা নবাবের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল।

কোম্পানীর কর্মচারীরা (Covenanted servants) অল্প বয়সে সামান্য শিক্ষালাভের পর সামান্য বেতনে ভারতে চাকুরি নিয়ে আসত। কাগজপত্র নকল করে (Writer রূপে) তাদের কর্মজীবন সুরু হত। তারপর পদোন্নতি হত, তারা কোম্পানীর কুঠির অধ্যক্ষ হত। তাদের অভিজ্ঞতা বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ-কর্মে সীমাবদ্ধ থাকত। পলাশীর যুদ্ধের পর চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলায় তারা রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত হল। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হল। ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে এবং সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা ধনবান হত। হেস্টিংসের আমলে যখন কোম্পানী প্রশাসনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করল তখন এই সকল কর্মচারীদের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব পালন করা কঠিন হল। প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে তখন কোম্পানীর বাণিজ্য চলছিল। একই কর্মচারীকে কখনও প্রশাসনে, কখনও বাণিজ্যের ব্যাপারে নিয়োগ করা হত। হেস্টিংস এই বিশৃংখলার আংশিক অবসান করেছিলেন। উৎকোচ গ্রহণে কর্মচারীদের আগ্রহ তিনি খানিকটা সংযত করেছিলেন। ফার্সি ছিল প্রশাসনের কাজে ব্যবহৃত ভাষা। কর্মচারীরা যাতে ভারতে আসার আগেই এই ভাষা শিখতে পারে তার জন্য তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সির অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করার জন্য

চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। হিন্দু আইন এবং মুসলমান আইন বুঝতে হলে সংস্কৃত এবং ফার্সিতে কিছু কিছু অধিকার প্রয়োজন। যে সব কর্মচারী এই ভাষাগুলি শিখত হেস্টিংস তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতেন।

হেস্টিংসের নাম শুনলেই বাঙালীর মনে পড়ে নন্দকুমারের ফাঁসি, চৈৎসিংহের রাজ্যচ্যুতি, রোহিলা যুদ্ধ, অযোধ্যার বেগমদের উপর নির্যাতন। বাঙালী নাট্যকারেরা নন্দকুমার সম্বন্ধে দুটি এবং অযোধ্যার বেগম সম্বন্ধে একটি নাটক লিখেছেন। সর্বত্রই ইতিহাসের আদ্য শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হয়েছে। নন্দকুমারের ব্যাপারে হেস্টিংসের দায়িত্ব এখনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। অন্য তিনটি ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব সর্বজনস্বীকৃত; রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি গর্হিত কাজ করেছিলেন। কিন্তু এই সব ব্যাপার বাংলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল না। বাংলার ইতিহাসে হেস্টিংস স্মরণীয় হয়ে থাকবেন প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রয়াসের জন্য। যখন নবজাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মারাঠাদের সঙ্গে এবং মহীশূরের সঙ্গে সংঘর্ষে বিপন্ন তখন তিনি বাংলার মানুষকে অরাজকতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন সে রকম চেষ্টা নবাবী আমলে কখনও হয় নি। অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি যা' করেছিলেন বাংলার কোন নবাব তা' করেন নি। বাংলার উপর ইংরেজের নাগপাশ দৃঢ় করা অবশ্যই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু শাসকের পক্ষে শাসিতের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা করার কর্তব্য তিনি ভুলে যান নি। একমাত্র ফৌজদারী মামলার বিচার (যা' নবাবের অধিকারভুক্ত ছিল) ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তিনি প্রশাসনের আধুনিকীকরণের (modernisation) সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি প্রশাসনের উন্নতিসাধনে ভারতীয়দের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং ভারতীয় কাঠামো বজায় রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এক মিশ্র ('of a mixed nature, European and Asiatic')[১০] শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, এবং এই ব্যবস্থা ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। রামমোহন রায় বিলাতে পার্লামেন্টের কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে একথা বলেছিলেন। সেই যুগসন্ধিক্ষণে আকস্মিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব ছিল না।

নবাবী আমলের বিলোপ এবং ইংরেজ-শাসনের প্রতিষ্ঠা বাংলার মানুষ কি চোখে দেখেছিল তা' জানার উপায় নেই। এযুগে 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'র মত কোন

১০। 'The system of rule introduced and acted on in India by the executive officers of the Company previous to 1793, was of a mixed nature—European and Asiatic. The established usages of the country were for the most part adopted as the model of their conduct in the discharge of political, reveuue and judicial functions, with modifications at the discretion of the local authority'.

কাব্য লেখা হয় নি, 'নীলদর্পণে'র মত কোন নাটক রচনা তো কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় রামমোহন রায়ের একটি চিঠিতে। 'ইংলণ্ডে অবস্থান কালে রামমোহন রায় তাঁহার জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে একখানি পত্রে, নিতান্ত সংক্ষেপে, আত্মচরিত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।' তাতে তিনি লিখেছিলেনঃ 'ষোড়শ বৎসর বয়সে' (অর্থাৎ ১৭৮৮ বা ১৭৯০ সালে) 'একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত' তাঁর ধর্মসম্বন্ধে 'মনান্তর উপস্থিত হইলে' তিনি 'গৃহ-পরিত্যাগ পূর্বক দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত' হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ' করে 'বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা বশতঃ...' ভারতবর্ষের বহির্ভূত অন্ততঃ একটি দেশে (সম্ভবতঃ তিব্বতে) তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি 'ভারতবর্ষের অন্তর্গত' কোন কোন প্রদেশে 'ভ্রমণ' করেন তা' জানা যায় না। 'বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা'র কোন কারণ তিনি উল্লেখ করেন নি। পরবর্তী কালে তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছিল। 'তিনি ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজশাসন হইতে ভারতের প্রভূত কল্যাণ উৎপন্ন হইবে।'[১১]

৪। ডাকাতি

'আনন্দমঠে' এবং 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিম চন্দ্র স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তান দল এবং ভবানী পাঠকের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা' বাঙালীর চিত্তপটে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। ছবির সঙ্গে বাস্তবের সাদৃশ্য কতটুকু তা' ভাবপ্রবণ বাঙালী বিচার করে নি। যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যে কোন কারণে যে কোন উদ্দেশ্যে ইংরেজের বিরোধিতা করে থাকলেই সেটা স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ বলে গণ্য করা বর্তমান জাতীয়তাবাদী মানসিকতার একটি বিশিষ্ট দিক।

বর্গীর হাঙ্গামা থেকে সুরু করে হেস্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত নানা কারণে বাংলার আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছিল। ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রশাসনের কাঠামো নড়বড়ে করে তুলেছিল। বর্গীদের লুণ্ঠন, মীর কাশিমের নিষ্করুণ রাজস্ব-ব্যবস্থা, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানীর কর্মচারীদের অবাধ লুণ্ঠন, দেওয়ানী আমলে কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর প্রভৃতি সাধারণ মানুষের পক্ষে আর্থিক সংকট সৃষ্টি করেছিল। নবাবী ফৌজ থেকে কর্মচ্যুত সৈনিকেরা লুটতরাজকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। 'নায়েব দেওয়ান' এবং 'নায়েব সুবা' এই দুটি পদের দায়িত্ব একই ব্যক্তিকে (রেজা খাঁকে) দেওয়া হয়েছিল। এই গুরু দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তা' ছাড়া ব্যক্তিগত সম্পদ সংগ্রহের প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

১১। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', ৪-৫, ৩২৯ পৃষ্ঠা।

হেস্টিংসকে এই অরাজকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি দেখলেন যে ডাকাতদের অত্যাচারে গ্রামাঞ্চলের মানুষের ধনপ্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। তিনি ফৌজদারী ব্যবস্থা জোরদার করার চেষ্টা করলেন। মুসলমান আইনের কিছু পরিবর্তন করে ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নবাবের সম্মতি ছাড়া 'নিজামতে'র ব্যাপারে কোম্পানী হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এই অজুহাতে তাঁর প্রস্তাব পরিত্যক্ত হল। অনেক জমিদার ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের লুটের অংশীদার ছিলেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ডাকাতি বাংলার গ্রামাঞ্চলে বিভীষিকার কারণ ছিল।

সাধারণ ডাকাতের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আগত বিভিন্ন সন্ন্যাসী এবং ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত সংঘবদ্ধ ডাকাতের দল।[১২] সরকারী কাগজপত্র থেকে তাদের সম্বন্ধে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

নবাবী আমলের পতন এবং ইংরেজের অত্যাচারের ফলে এই শ্রেণীর ডাকাতের অভ্যুদয় হয় নি। ষোড়শ শতকে হাজার হাজার সশস্ত্র ফকির উত্তর ভারতে যুদ্ধে যোগ দিত এবং লুটতরাজ করত। ধর্মীয় গোঁড়ামি বশতঃ তারা সময় সময় সন্ন্যাসীদিগকে হত্যা করত। প্রসিদ্ধ দার্শনিক কাশীবাসী মধুসূদন সরস্বতী ফকিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আকবর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সশস্ত্র ফকিরদের মত সশস্ত্র সন্ন্যাসীরাও সরকারী কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে। রাজা বীরবল শান্তিপ্রিয় দার্শনিককে পরামর্শ দিলেন, অব্রাহ্মণদের সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়ে তাদের সশস্ত্র করে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের রক্ষার ভার দেওয়া হোক। প্রথম দিকে এই ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া গেল, কিন্তু কিছুকাল পরে সশস্ত্র অব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীরা লুটতরাজ আরম্ভ করল। এর আগেই গোরখনাথের যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক দল অস্ত্রগ্রহণ করেছিল। ১৫৬৭ সালে আকবর থানেশ্বরে গিরি ও পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী-দের এক লড়াই দেখেছিলেন। দাদুপন্থী নাগা সন্ন্যাসীরা রাজপুত রাজাদের সৈন্যদলে যোগ দিত।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি মহসিন ফানি তাঁর 'দাবিস্তান' বইতে লিখেছেন: প্রধান ফকিরেরা 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করত। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল হিন্দু, কিন্তু মুসলমান সুফীদের ধর্মমত তারা অনেকাংশে গ্রহণ করেছিল।

বাংলার সুবাদার শাহ সুজা শাহ সুলতান হাসান নামক বুরহানা সম্প্রদায়ের এক ফকিরকে সনদ দিয়েছিলেন: (১) তিনি পতাকা ইত্যাদি ('banners, standard, flags, poles, staffs, band') নিয়ে ইচ্ছামত ভ্রমণ করতে পারবেন। (২) তিনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মধ্যে যে কোন স্থানে উত্তরাধিকারীবিহীন জমি দখল করতে পারবেন। (৩) তাঁর ভ্রমণকালে

১২। দ্রষ্টব্য: J. M. Ghosh, *Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal*।

স্থানীয় জমিদার এবং প্রজারা বিনামূল্যে তাঁর খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করবে। (৪) তাঁর সম্পত্তির উপর কোন রকম কর ধার্য হবে না।

অষ্টাদশ শতকে ভারতের নানাস্থানে বারবার যুদ্ধ হচ্ছিল। তখন সশস্ত্র ফকির ও সন্ন্যাসীরা লুটতরাজের প্রচুর সুযোগ পেয়েছিল। মারাঠাদের এবং রাজপুত রাজাদের সৈন্যদলে, এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সৈন্যদলে বহু সন্ন্যাসী ছিল। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেছেন, মীর কাশিমের সৈন্যদলে সন্ন্যাসী ছিল।

মীর কাশিমের সময় থেকেই বাংলায় সশস্ত্র ফকির ও সন্ন্যাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে। ১৭৬১ সালে এক রিপোর্টে সন্ন্যাসীদের উল্লেখ আছে। পরবর্তী দশকে তাদের উপদ্রব বাড়তে থাকে। কোন অঞ্চল লুট করলে বেশি টাকা পাওয়া যাবে তারা গুপ্তচর নিযুক্ত করে এ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করত। তারা সুবিধামত ভিক্ষা করত, চুরি করত, লুট করত। ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষ তাদের দুষ্কার্যে বাধা দিত না, অনেক ক্ষেত্রে বাধা দেবার শক্তিও ছিল না। অনেকে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির ভয়ে ভীত ছিল। তাদের প্রধান কর্মস্থল ছিল বর্তমান উত্তর প্রদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তর বিহার এবং উত্তর বাংলা। তারা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র (গৌহাটি ?), বৈদ্যনাথ, গঙ্গাসাগর এবং পুরীতে যাতায়াত করত। তারা সর্বদা নানারকম অস্ত্রশস্ত্র (তরবারি, বর্শা, বন্দুক) সঙ্গে রাখত। তারা বিয়ে করত না, তাদের পরিবার-পরিজন ছিল না। তারা লুটতরাজের সময় বলিষ্ঠ ছেলেদের ধরে নিয়ে যেত, পরে তাদের দলভুক্ত করা হত। তারা লুণ্ঠিত মণিমাণিক্য বেচে অর্থসংগ্রহ করত।

সশস্ত্র সন্ন্যাসীদের মধ্যে সকলেই ভ্রাম্যমাণ ছিল না; অনেক সন্ন্যাসী মঠ নির্মাণ করে একজন মোহান্তের কর্তৃত্বাধীনে সেখানে স্থায়ী ভাবে বাস করত। অনেক মঠের সঙ্গে যুক্ত ভূসম্পত্তি থাকত। মহাজনী করে ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করা হত। মালদহ, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর এবং ময়মনসিংহ জেলায় অনেক মঠের প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। লুণ্ঠনকারী ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী-ফকিরদের মঠে আশ্রয় দেওয়া হত এবং নানারকম সাহায্যের বিনিময়ে তাদের লাভের অংশ আদায় করা হত।

সশস্ত্র ফকিরদের কর্মপদ্ধতিও এই রকমই ছিল। তাদের প্রধান দলপতি মজনু শাহের নিবাস ছিল উত্তর প্রদেশের মাকওয়ানপুরে। সে এবং তার পরবর্তী দলপতিরা বাংলায় লুটতরাজের পর প্রতি বৎসর ওখানে যেত তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মাদারের সমাধিস্থানে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে। মাদারী সম্প্রদায়ের ফকিরেরা নানা বিষয়ে হিন্দু যোগীদের অনুকরণ করত। দিনাজপুরে বুরহানা ফকিরদের প্রতিপত্তি ছিল। 'বুরহানা' শব্দের অর্থ উলঙ্গ। এই সম্প্রদায়ের ফকিরদের ধর্মীয় আচার অনেকটা ইসলাম-বিরোধী ছিল। বুরহানা সম্প্রদায় বৃহত্তর মাদারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে শাহ সুলতান হাসানকে সুবাদার

সুজা সনদ দিয়েছিলেন তার এক দরগা ছিল মহাস্থানে। মজনু শাহ বুরহানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

দিনাজপুর জেলার পান্ডুয়াতে ফকিরদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেখানে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে ফকিরদের নেতৃত্বে নানা শ্রেণীর মানুষ সম্মিলিত হত এবং নানা অজুহাতে গ্রামাঞ্চল থেকে টাকা আদায় করত। বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সংঘর্ষ এবং রক্তপাত হত। প্রজারা ফকিরদের দাবি মিটিয়ে না দিলে তাদের মারপিট করা হত এবং ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করা হত।

ফকিরেরা উত্তর প্রদেশ থেকে যাত্রা করে উত্তর বিহার অতিক্রম করে দিনাজপুর এবং মালদহে উপস্থিত হত এবং সেখানে বাসিন্দা ফকির ও সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ত। ১৭৬৩ সালে ফকিরেরা বাখরগঞ্জ এলাকায় উপদ্রব করেছিল এবং ঢাকায় কোম্পানীর কুঠি সাময়িকভাবে দখল করেছিল।

সরকারী কাগজপত্রে লুটতরাজের বিস্তৃত বিবরণ আছে, কিন্তু সাধারণতঃ ফকির এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয় নি। লুঠেরাদের সম্বন্ধে ফকির, সন্ন্যাসী, বৈরাগী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সময় জমিদার এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকত। উত্তর বঙ্গ ছিল তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র, কিন্তু বহু দূরবর্তী অঞ্চলেও (ঢাকা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, শ্রীহট্ট) তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।

সন্ন্যাসীদের প্রধান নায়ক ভবানী পাঠকের মূল কর্মক্ষেত্র ছিল বগুড়া, রংপুর এবং ময়মনসিংহ জেলা। তার সহযোগী ছিলেন দেবী চৌধুরাণী ; তিনি নৌকায় বাস করতেন। জলপাইগুড়ি জেলায় 'সন্ন্যাসীকোটা' নামক স্থানে একটি মাটির দুর্গ ছিল। ভবানী পাঠকের প্রধান অনুচরেরা সকলেই অবাঙালী ছিল। মজনু শাহের সঙ্গে তার সহযোগিতার সম্বন্ধ ছিল। কোম্পানীর সিপাহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ভবানী পাঠক নিহত হয় (১৭৮৭)।

মজনু শাহের কর্মকেন্দ্র ছিল বগুড়া জেলার মাদারগঞ্জে এবং মহাস্থানে। সে মহাস্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল (১৭৭৬)। রাজসাহী, দিনাজপুর, মালদহ, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা তার কর্মক্ষেত্র ছিল। কোম্পানীর সিপাহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে সে পালিয়ে যায়। মাকওয়ানপুরে তার মৃত্যু হয়েছিল (১৭৮৭)। বহুদিন পর্যন্ত তার অত্যাচারের স্মৃতি বাঙালীর মনে জাগ্রত ছিল। ১৮১৩ সালে পঞ্চন (পঞ্চানন ?) দাসের 'মজনুর কবিতা'য় এই ফকির দলপতিকে যমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বাংলার ধ্বংসের কারণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাঙ্গলা নাশের হেতু মজনু বারনা।
কালান্তক যম বেটা কে বলে ফকির।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির।

এই 'কালান্তক যমে'র ভয়ে প্রজারা হাল ও গরু মাঠে ফেলে রেখে পালিয়ে যেত। সে উট, ঘোড়া ও হাতীর মিছিল করে, সশস্ত্র সৈন্যদল দ্বারা পরিবৃত হয়ে, আরব দেশীয় ঘোড়ায় চড়ে লুট করত। বর্তমান সময়ের কোন কোন প্রগতিবাদী লেখক তাকে কৃষকদের বন্ধু এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইংরেজ সরকারের কাগজপত্র এবং 'মজনুর কবিতা'য় যে তথ্য পাওয়া যায় তার বিরোধী কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নি।

মজনুর পরে ফকিরদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল তার ভাই মুসা শাহ এবং তার অন্যান্য সহযোগীরা। তারা সাধারণতঃ নেপালের তরাই অঞ্চলে বাস করত এবং সেখান থেকে বের হয়ে কোচবিহার, রংপুর এবং পুর্নিয়াতে লুটপাট করত। তীর্থযাত্রার মাধ্যমে তারা মাকওয়ানপুরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করত।

মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, অষ্টাদশ শতকের শেষ চার দশকে বাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল সন্ন্যাসী ও ফকিরদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়েছিল। তাদের কোন রকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই। তারা অবাঙালী, বাংলায় ইংরেজ-শাসন বিধ্বস্ত করার জন্য তারা উত্তর ভারত থেকে ছুটে আসবে, এমন অনুমান করার কোন কারণ নেই। তাদের আবির্ভাব আকস্মিক বা ইংরেজের রাজশক্তি লাভের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। শাহ সুজার সনদে (১৬৫৯) ফকিরদের বাংলায় প্রবেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৭৪৩ সালে নাগা সন্ন্যাসীরা বগুড়া জেলায় ভবানীপুর লুণ্ঠন করেছিল।

উত্তর ভারতের উপদ্রবকারীরা বাংলাকে তাদের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিয়েছিল তিনটি কারণে। প্রথমতঃ, বাংলার ঐশ্বর্যের খ্যাতি তাদের প্রলুব্ধ করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালীরা স্বভাবতঃ ভীরু এবং অত্যাচারের প্রতিরোধে অনিচ্ছুক ছিল।[১৩] 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' বর্গীদের অত্যাচারে পলায়মান বাঙালীদের বিবরণ আছে, প্রতিরোধের চেষ্টা কখনও হয়েছিল এমন ইঙ্গিত নেই। তৃতীয়তঃ, সন্ন্যাসী ও ফকির অলৌকিক শক্তির অধিকারী, তাদের বাধা দিলে সর্বনাশ হবে, সাধারণ হিন্দু এবং মুসলমানদের মনে এই ধারণা প্রবল ছিল। নেপালের রাজা এক লুণ্ঠনকারী ফকিরকে তাঁর রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন, কিন্তু তাকে কোনরকম শাস্তি দেন নি। তিনি ইংরেজ সরকারকে জানিয়েছিলেন, যুদ্ধের সময় ছাড়া কোন হিন্দু সন্ন্যাসী বা মুসলমান ফকিরকে কারারুদ্ধ করা বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা তাঁর ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। চতুর্থতঃ, যে সব সন্ন্যাসী ও ফকির বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে

১৩। 'The long security that the country has enjoyed from foreign enemies and the consequent loss of martial habits and character have made the people of Bengal so timid and enervated that no resistance is to be apprehended in the act (of dacoity)...' (একথা লিখেছিলেন বড়লাট লর্ড মিন্টো, ১৮১০ সালে)।

জমিদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে, ভ্রাম্যমাণ লুণ্ঠনকারীরা নানারকম সাহায্য নিত।

ইংরেজ সরকার দীর্ঘকাল লুণ্ঠনকারীদের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে বার বার সৈন্য ব্যবহার করতে হয়েছিল। সরকারের দিক থেকে এদের দস্যু ('lawless banditti') রূপেই দেখা হয়েছিল, এদের সম্বন্ধে কখনও বিদ্রোহী (rebel) শব্দ ব্যবহার করা হয় নি।

এই প্রসঙ্গে আসামে 'বাঙালী বরকন্দাজ'দের ('Bengali Barkandazes') উপদ্রব উল্লেখ করা যেতে পারে।[১৪] এদের অধিকাংশই ছিল অবাঙালী—শিখ এবং হিন্দুস্থানী; এদের দলে অনেক অবাঙালী সশস্ত্র সন্ন্যাসীও ছিল। এরা বাংলা থেকে আসামে যেত রোজগারের সন্ধানে, তাই এদের নামের সঙ্গে 'বাঙালী' কথাটা যুক্ত হয়েছিল। আসামের রাজা গৌরীনাথ সিংহ (১৭৮০-৯৪) এদের অনেককে চাকুরি দিয়েছিলেন। তাঁর দুর্বলতার ফলে তাঁর অধীন সামন্ত রাজারা বিদ্রোহী হলেন। তাঁরাও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বরকন্দাজদের চাকুরি দিলেন। ফলে আসামের অন্তর্যুদ্ধে বরকন্দাজেরা জড়িত হয়ে পড়ল। আসাম তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য, সেখানকার কোন ঘটনার সঙ্গে কোম্পানীর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু কোম্পানী আসামে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করছিল, এজন্য সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকা আবশ্যক ছিল। তা' ছাড়া বাংলা থেকে সশস্ত্র যোদ্ধারা গিয়ে প্রতিবেশী রাজ্যে উপদ্রব করুক, এটাও ইংরেজদের কাম্য ছিল না। বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হল—বরকন্দাজদের বাংলায় ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে। কিন্তু তারা এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করল। বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিস গৌরীনাথ সিংহের অনুরোধে একজন ইংরেজ সেনানায়কের (ক্যাপ্টেন ওয়েল্‌স্‌) অধীনে একদল সিপাহী আসামে পাঠালেন বরকন্দাজদের আসাম থেকে তাড়িয়ে দিতে (১৭৯২)। প্রায় দু'বৎসর আসামে থেকে তিনি বরকন্দাজ এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের দমন করে বাংলায় ফিরে এলেন (১৭৯৪); আসামে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আসামে আবার বিদ্রোহ আরম্ভ হল এবং বরকন্দাজেরা লুটতরাজ আরম্ভ করল।

রাজনৈতিক সংঘর্ষে অংশ নিয়ে লুটতরাজ করার ব্যাপারে সন্ন্যাসীরা বাংলাতেও পশ্চাৎপদ হত না। ১৭৬৬ সালে কোচবিহার রাজ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে নাজির দেও রুদ্রনারায়ণের বিরোধীরা সন্ন্যাসীদের সাহায্য নিয়েছিল।

৫। কর্নওয়ালিস

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে (১৭৮৬-৯৩) নবাবী আমলের আনুষ্ঠানিক

১৪। দ্রষ্টব্য: A. C. Banerjee, *The Eastern Frontier of British India.*

অবসান হল। প্রশাসনের উপরে মৃতপ্রায় 'নিজামতে'র অস্পষ্ট ছায়া সম্পূর্ণ মুছে গেল। 'নায়েব সুবা'র পদ তুলে দেওয়া হল; সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হল, বিচারক হলেন গভর্নর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের সভ্যেরা (১৭৯০)। ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থায় মুসলমান আইন, এবং প্রশাসনে ফার্সি ভাষার ব্যবহার, বজায় রইল—যেমন স্বাধীনতা লাভের পর ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত আইন এবং ইংরেজী ভাষা চালু রয়েছে। ১৭৭৫ সালে এক মামলায় সুপ্রীম কোর্টের এক বিচারক মন্তব্য করেছিলেন: নবাব হচ্ছেন এক ছায়ামূর্তি, খড়ের তৈরী এক মানুষ ('a phantom, a man of straw')। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত এই ছায়ামূর্তির নামেই ফৌজদারী বিচার চলত, সদর নিজামত আদালত মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলে তাঁর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দরকার হত। কর্নওয়ালিস এই ব্যবস্থা বাতিল করলেন, বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণ করা বাদে নবাবের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের কোন সম্বন্ধ রইল না। বাদশাহের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সম্বন্ধ আগেই ছিন্ন হয়েছিল—যখন হেস্টিংস শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়া বন্ধ করেছিলেন (১৭৭২)। কিন্তু বাদশাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

কর্নওয়ালিস প্রশাসনে আরো দুটি মৌলিক পরিবর্তন এনেছিলেন। হেস্টিংস মোগল আমলের প্রশাসনিক কাঠামো বজায় রেখেছিলেন এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়দের নিযুক্ত করেছিলেন। এই মিশ্র ব্যবস্থা বাতিল করলেন কর্নওয়ালিস। শাসনযন্ত্রের জন্য মোটামুটি বিলাতী কাঠামো তৈরী হল। দায়িত্বপূর্ণ পদে দেশীয় মানুষের নিয়োগ বন্ধ হল। কর্নওয়ালিসের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে দেশীয় মানুষদের সততার একান্ত অভাব, তাই তাদের উপর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া যায় না। তাঁর এই নতুন নীতি পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করল। ১৭৯৩ সালের সনদে (Charter Act of 1793) নির্দেশ দেওয়া হল যে কোম্পানীর চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী (Covenanted servant) ছাড়া কেউ বার্ষিক ৫০০ পাউন্ডের বেশি মাইনের চাকুরি পাবে না। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মনোনীত যুবকেরা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি (Covenant) করে কোম্পানীর চাকুরি নিয়ে ভারতে আসত। ভারতীয় কোন যুবকের পক্ষে বিলাতে গিয়ে কোম্পানীর কোন ডিরেক্টরের মনোনয়ন পাওয়া সম্ভব ছিল না। কর্নওয়ালিশের সময় থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল ভারতীয়দের পক্ষে উচ্চতম পদ ছিল দেওয়ান এবং সদর আমীন। রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর দেওয়ানী করেছেন। পরে ভারতীয়দের জন্য ডেপুটি কালেক্টর এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রবর্তন করা হয়। কোম্পানীর আমলে কোন ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ চাকুরিতে নিযুক্ত হয় নি।

নতুন শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্নওয়ালিস রাজস্ব বিভাগে এবং বিচার বিভাগে অনেক পরিবর্তন করলেন। এজন্য নতুন আইন (Regulation)

প্রণয়ন করা হল। পূর্বপ্রচলিত আইনগুলির সঙ্গে নতুন আইনগুলি সংযুক্ত করে এক সংহিতা (Cornwalis Code) প্রস্তুত করা হল (১৭৯৩)। কোম্পানীর আমলে মোটামুটি এই সংহিতার ভিত্তিতে প্রশাসন পরিচালিত হত; অবশ্য পরবর্তী চার দশকে এর কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, প্রচুর নতুন আইনের সংযোজন আবশ্যক হয়েছিল।

কর্নওয়ালিসের সংহিতার মূল নীতি ছিল আইনের শাসন (Rule of Law)। এই নীতির সূচনা হয়েছিল হেস্টিংসের আমলে; কর্নওয়ালিসের আমলে এটা প্রসারিত এবং দৃঢ়ীকৃত হল। শুধু প্রজার বিরুদ্ধে প্রজার অভিযোগ নয়, সরকারের বিরুদ্ধে প্রজার অভিযোগও আদালতের বিচারের বিষয় হল। মুসলমান শাসনকালে সরকারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ক্ষুব্ধ প্রজা সরকারী কর্মচারীদের কাছে আবেদন-নিবেদন করত, তারা ব্যক্তিগত মত ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী নির্দেশ দিত। সরকারী অভিযোগের প্রকাশ্য আদালতে বিচার, নিম্ন আদালতের রায়ে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট না হলে উচ্চ আদালতে আপীলের ব্যবস্থা—এটা প্রকৃতপক্ষে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং সমাজ-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের দিকে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

কর্নওয়ালিস বাংলায় স্মরণীয় হয়েছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক রূপে। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তাঁর কোন ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছিল না, তিনি শুধু কোম্পানীর ডিরেক্টরদের হুকুম তামিল করেছিলেন। পিটের ভারত আইনে (১৭৮৪) জমির মালিকদের সঙ্গে রাজস্ব সম্বন্ধে পাকাপাকি ব্যবস্থা করার নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছিল। পরে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে কর্নওয়ালিসের প্রবর্তিত ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন করা হয়েছিল।[১৫]

১৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিস্তারিত ইতিহাস বর্তমান লেখকের *The Agrarian System of Bengal* (দুই খণ্ড) বইতে আলোচিত হয়েছে।

৮

নবাবী আমলে সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ

১। সাহিত্য

অষ্টাদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য ছিল, কিন্তু প্রধানতঃ সপ্তদশ শতকের জের টানা হয়েছিল। ধর্মমঙ্গল, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ-কাহিনী, ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনী প্রভৃতি কবিদের উপজীব্য ছিল। 'ভাগীরথী-তীরবর্তী নাগরিক সমাজে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-কাহিনী' জনপ্রিয় ছিল।

নবাবী আমলের প্রধান কবি তিন জন: রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র রায় এবং রামপ্রসাদ সেন। এঁদের রচনা মোটামুটি সমসাময়িক।

'শিব সংকীর্তন' বা 'শিবায়ন'[১] কাব্য রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার যদুপুর নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের মত তিনিও অত্যাচারের ফলে স্বগ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁর নির্দেশে কাব্য রচনা করেন। কাব্যের রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৭৩৫ সাল এবং ১৭৫০ সালের মধ্যে। তিনি শৈব ছিলেন অথবা শাক্ত ছিলেন তা' বলা কঠিন। তাঁর ধর্মমত উদার ছিল। তাঁর রচিত 'সত্যপীরের কথা'য় মুসলমান কলন্দর (Qalandar) রূপে বিষ্ণুর আবির্ভাব কল্পনা করা হয়েছে।

রামেশ্বর দাবি করেছেন, তাঁর কাব্য 'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য'। এই দাবি ভিত্তিহীন নয়। ভারতচন্দ্রের রচনায় যে অশ্লীলতা আছে তার সঙ্গে তুলনায় রামেশ্বরের কাব্য অশ্লীলতা দোষ থেকে মোটামুটি ভাবে মুক্ত। তাঁর প্রধান দোষ অনুপ্রাসের অতিরিক্ত ব্যবহার। সম্ভবতঃ এটা তাঁর সংস্কৃত ভাষায়

১। দ্রষ্টব্য: যোগিলাল হালদার কর্তৃক সম্পাদিত সংস্করণ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭)।

পাণ্ডিত্যের ফল। সেকালের প্রচলিত ভাঁড়ামি তাঁর রচনায় স্থান পায় নি। 'নির্মল শুভ্র সংযত হাস্যরসে তাঁহার কাব্য ভাস্বর।'

রামেশ্বরের জীবন কেটেছিল কৃষিনির্ভর গ্রামে, তাই তিনি গ্রাম্য জীবনের সফল চিত্রকর। কৃষি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর কাব্যে নানারকম তথ্য পাওয়া যায়। সেকালে ব্রাহ্মণেরাও স্বহস্তে কৃষিকাজ করত, গোপালন এবং গোচারণ করত। কবি শিবের চাষের বর্ণনা দিয়েছেন, সেই প্রসঙ্গে কৃষকের দুঃখের কথাও বলেছেন।

> অনেক যতনে ক্ষেতে শষ্য উপস্থিত।
> শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত ॥
> গরীবের ভাগ্যে যদি শষ্য হয় তাজা।
> বার কর‍্যা সকল আনয়ে (বিকিয়া ?) লয় রাজা ॥
> ক্ষেতে দেখ্যা খন্দ যদি খাত্যে নাই পায়।
> কুতকাতে কায়েত কিফাত করে তায় ॥

মধ্যবিত্তের গৃহে নগদ টাকার অভাবে গৃহিনীর 'শাঁখা পরার সাধ' মেটানো কঠিন হত, কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করে ভোজনে প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হত। 'পার্ব্বতী রন্ধন করিয়া স্বামীপুত্রকে যেভাবে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়াছেন, সেইভাবে আহার করাইতে পারিলে বর্তমান কালের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারা আপনাদিগকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন।' পারিবারিক উৎসবে কেবল আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের জন্য নয়—অনাহূত রবাহূত সকলের জন্য গৃহদ্বার উন্মুক্ত থাকত। কৌলিন্য প্রথার বাড়াবাড়ি ছিল। বিবাহিতা কন্যার পতিগৃহে যাত্রার সময় তার মা জামাইকে বলছেন :

> কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
> বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি ॥
> আঁঠু ঢাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর‍্যা ভাত।
> প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ ॥

বিলাসিতার নামগন্ধ নাই, সরল অনাড়ম্বর জীবনের ছবি অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই ছবি অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত ছিল। বহুপত্নীক কুলীনের অধিকাংশ স্ত্রীর পক্ষে স্বামীসঙ্গ লাভ ছিল আকস্মিক সৌভাগ্য; জানকী-রঘুনাথের মত 'প্রীত' তো দূরের কথা, স্বামীর কাছ থেকে 'আঁঠু ঢাক্যা বস্ত্র' পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

* * *

রামেশ্বরের জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল, তাঁর অভিজ্ঞতা বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয়ে এবং জীবনের বিভিন্ন সংঘাতে তাঁর চিত্ত উদ্বেলিত হয় নি। ভারতচন্দ্রের জীবনে এবং অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্য ছিল, তাঁর সুখ-দুঃখের অনুভূতি সীমাবদ্ধ ও

সংকীর্ণ সমাজে বিকশিত হয় নি। বংশগৌরবে এবং অর্থস্বাচ্ছল্যে তিনি রামেশ্বরের চেয়ে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ ছিলেন।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে, রাঢ় দেশের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ভুরশুট বা ভুরিশ্রেষ্ঠী অঞ্চলে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, সম্ভবতঃ ১৭১০ সালের কাছাকাছি সময়ে। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি ভরদ্বাজ বংশে মুখটি কুলের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা পাণ্ডুয়া পেঁড়ো গ্রামের রাজা (অর্থাৎ জমিদার) ছিলেন, কিন্তু বর্ধমানরাজের ক্রোধে তিনি কবির বাল্যকালেই রাজ্যহারা হয়েছিলেন। ফলে ভারতচন্দ্রের প্রথম জীবন দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি কয়েক বৎসর মাতুলালয়ে বাস করেন এবং সেই সময়ে সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা করেন। পরে তাঁর অগ্রজ সহোদরেরা বর্ধমানরাজের অধীনে পৈত্রিক সম্পত্তির ইজারাদার হন এবং তিনি এই সম্পত্তির মোক্তার রূপে বর্ধমানে যান। কিছুদিন পরে যথাসময়ে রাজস্বের টাকা না পেয়ে বর্ধমানরাজ ইজারা সম্পত্তি খাস করলেন এবং মোক্তারকে কারারুদ্ধ করা হল। ভারতচন্দ্র অল্পকাল পরে কারামুক্ত হয়ে উড়িষ্যায় চলে গেলেন। উড়িষ্যায় তখন নাগপুরের ভোঁসলা রাজার অধিকার স্থাপিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র মারাঠা সুবাদার শিবভট্টের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীক্ষেত্রে বাস করতে লাগলেন। পুরীতে তিনি গেরুয়া বসন গ্রহণ করলেন এবং ভজন-কীর্তনে উৎসাহী হলেন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁর প্রকৃত অনুরাগ সঞ্চারিত হল না। নীলাচলের বৈষ্ণবদের আচার সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনায়ঃ

খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতূহলে।

যাই হোক, কয়েকজন বৈষ্ণবের অনুরোধে তিনি বৃন্দাবন যাত্রায় তাঁদের সঙ্গী হলেন। যাত্রীরা খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হলে সেখানকার অধিবাসী তাঁর শ্যালিকাপতি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে ঘরে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। কপট বৈষ্ণব ভারতচন্দ্রের পক্ষে এই অনুরোধ রক্ষা করা কঠিন হল না। তিনি কিছুকাল শ্বশুরালয়ে বাসের পর জীবিকা অর্জনের জন্য ফরাসডাঙ্গায় (চন্দননগরে) ফরাসীদের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর শরণাপন্ন হলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় লাভ করে ইন্দ্রনারায়ণ তাঁকে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় লাভের ব্যবস্থা করে দিলেন। ভারতচন্দ্রের ভ্রাম্যমান জীবনের অবসান হল।

কৃষ্ণনগরে ভারতচন্দ্র মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভাকবির পদে নিযুক্ত হলেন। ক্রমে তাঁর উন্নতি হল। তিনি 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করলেন। গঙ্গাতীরে বসবাসের জন্য তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে মুলাজোড় গ্রামটি ইজারা দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বর্গীর হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত হয়ে বর্ধমানের রাজা ও তাঁর মাতা বর্ধমান ত্যাগ করে মুলাজোড়ের নিকটবর্তী

কাউগাছি গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করলেন। রাজমাতার অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র মুলাজোড় গ্রামটি রামদেব নাগ নামক এক ব্যক্তিকে ইজারা দিলেন। পত্তনীদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতচন্দ্র রচনা করলেন 'নাগাষ্টক'। বইখানি পড়ে কৃষ্ণচন্দ্র নাগের অত্যাচার বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

ভারতচন্দ্রের জীবন-নাটক অভিনীত হয়েছিল এমন এক যুগে—যখন বাংলার ইতিহাসে দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছিল। অস্তাচলগামী মোগল পাদশাহীর ক্ষীয়মান প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল মুর্শিদাবাদ-কৃষ্ণনগরের মুসলমানী আদব-কায়দা ও পরিবেশের মধ্যে। নবাবী দরবারে এবং বিত্তশীল সম্প্রদায়ের বৈঠকে শিষ্টতার ভাষা ছিল ফার্সি। আবার হিন্দু ভূম্যধিকারীদের আশ্রয়ে সংস্কৃত ভাষা এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবাহ কখনও রুদ্ধ হয় নি। 'ভারতচন্দ্রের জীবনে ও সাহিত্যে উভয় ধারাই বহমান।' তিনি বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন উড়িষ্যায় মারাঠা শাসকের অধীনে বাস করেছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর চোখের সামনে ইংরেজের মানদন্ড রাজদণ্ডে পরিবর্তিত হচ্ছিল। চন্দননগরে ফরাসী অধিকারে তিনি ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। বাংলায় ফরাসীদের প্রভাবের বিলোপ তাঁর জীবদ্দশাতেই ঘটেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সব রাজনৈতিক পরিবর্তনের ছায়া তাঁর কাব্যে মোটেই লক্ষ্য করা যায় না। বর্গীর হাঙ্গামা হিন্দু ধর্মের উপর আলিবর্দি খাঁর 'দৌরাত্মো'র ফল, এমন ইঙ্গিত আছে। আর আছে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে মানসিংহের কাল্পনিক কথোপকথন। কবির দৃষ্টি শুধু পিছনের দিকে। পলাশীর যুদ্ধের পরে তিন বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন, কিন্তু 'নাগাষ্টকে'র মত 'ইংরেজাষ্টক' রচনার কথা তিনি ভাবেন নি।

সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের সচেতনতা হিন্দু ধর্মের উপর মুসলমানের 'দৌরাত্ম্যে'র ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। দেবী অন্নদা বলছেন ঃ

যতেক বেদের মত সকলি করিল হত,
নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মালা ছিলি মিলি, মিছা জপে ইলি মিলি
মিছা পড়ে কলমা কোরাণ॥
যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ,
নানা মতে করে অনাচার।
বামণ পণ্ডিত পায়, থুথু দেয় তার গায়,
পৈতা ছেঁড়ে খোঁটা মোছে আর॥

বাদশাহ জাহাঙ্গীর বলছেন ঃ

আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥

এই উক্তি ভারতচন্দ্রের কল্পিত সন্দেহ নেই, কিন্তু শিখগুরু অর্জুনের প্রাণদণ্ড প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে বিধর্মীদের ইসলামে দীক্ষিত করা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে এই উক্তির কোন নীতিগত প্রভেদ নেই।[২] আলিবর্দির রাজত্বকালে তাঁর অধীন জমিদারের সভাকবি কেন এসব কথা লিখেছিলেন তা' আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

স্বপ্নে দেবী চণ্ডীর নির্দেশ পেয়ে কবিকঙ্কণ 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করেছিলেন। রামেশ্বর শিবের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা না করে অন্নদাতা রাজার আদেশে কাব্য রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে দেবী অন্নপূর্ণার নির্দেশের সঙ্গে অন্নদাতা রাজার আদেশের সংযোগ ঘটেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র যখন আলিবর্দির দাবি অনুযায়ী ১২ লক্ষ টাকা নজরানা দিতে না পারায় বন্দী ছিলেন তখন দেবী অন্নপূর্ণা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, তিনি যেন তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্রকে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা মূলক কাব্য রচনা করতে অনুরোধ করেন। অলৌকিকের সঙ্গে লৌকিকের সংমিশ্রণে অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'অন্নদা মঙ্গলে'র পটভূমিকা রচিত হল। ১৭৫২-৫৩ সালে, সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক অন্নপূর্ণা পূজা প্রবর্তন উপলক্ষে, কাব্যটি রচিত হয়েছিল।

'অন্নদা মঙ্গল' (বা 'অন্নপূর্ণা মঙ্গল') তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে অন্নদার মাহাত্ম্য এবং শিবের উপাখ্যান বর্ণনা। এখানে দেবচরিত্রগুলি অনেকটা মানবতা গুণে উজ্জ্বল। দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণনা। তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান বর্ণনা—উদ্দেশ্য : কৃষ্ণচন্দ্রের বংশপ্রশস্তি রচনা। এখানে 'তথ্যের সহিত কল্পনার নির্বিচার সংমিশ্রণ হইয়াছে'। এই তিনটি খণ্ডের মধ্যে শিল্পের দিক থেকে কোন যোগসূত্র নেই।

ভারতচন্দ্র মঙ্গল কাব্যের প্রাচীন ধারার প্রতি আনুগত্য রক্ষা করেও এক মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। মুকুন্দরামের চণ্ডী ছিলেন সংসারের বাইরে অধিষ্ঠিতা দেবী, অলৌকিক তাঁর রূপলাবণ্য, চোখ-ধাঁধানো তাঁর দিব্য বিভা। ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা 'কুলবধূর আড়ম্বরহীন, সাদা-মাঠা শাঁখা-শাড়ীর অন্তরালে' তাঁর 'সেই অপ্রাকৃত জ্যোতিকে আবৃত' রেখেছেন।[৩] স্বভাবতঃই ভক্তির ফল্গুধারা শুকিয়ে এসেছে। 'চণ্ডীমঙ্গলে' দেখা যায়, 'বিপত্তারণ, দুঃখহরণ ভগবানের প্রতি অনন্যসহায় দুর্বল মানবের আত্মসমর্পণ'। ভারতচন্দ্রের 'দেববন্দনা অনেকটা প্রথার ব্যাপার, আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের বালাই'[৪] তাঁর কাব্যে নেই। এই পার্থক্য যুগ পরিবর্তনের সূচক বলে মনে করা কঠিন। ভারতচন্দ্র নাগরিক জীবনের কবি। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী সংস্কৃতি

২। দ্রষ্টব্য : A. C. Banerjee, *The Sikh Gurus and the Sikh Religion*, ২০১—২ পৃষ্ঠা।

৩। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ', ভূমিকা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য।

৪। উক্ত গ্রন্থে (৭০ পৃষ্ঠা) গ্রন্থকারের মন্তব্য।

প্রভাবিত, সংস্কৃতভিত্তিক শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কৃষ্ণনগরের অর্ধবিকৃত সংস্কৃতিকে কাব্যের খাতে প্রবাহিত করা। সাধারণ বাঙালীর চিত্ত তখনও ভক্তিরসে সঞ্জীবিত ছিল ; তার প্রমাণ পাওয়া যায় রামেশ্বরের কাব্যে এবং রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'রাজসভাকবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠে মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।' এই 'উজ্জ্বলতা' এবং 'কারুকার্য' ভারতচন্দ্রের সাহিত্যকর্মকে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে আদৃত করেছিল। তিনি 'শব্দকুশলী কবি', পাঠকদের বৈচিত্র্যের আস্বাদ দিতে তিনি 'যাবনী মিশাল' ভাষা ব্যবহার করেছেন। নবাবী আমলের মিশ্রিত সংস্কৃতির পরিবেশে এটা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু এক শতাব্দী পরে—যখন বাংলা ভাষা সংস্কৃতের প্রভাবে নতুন রূপ গ্রহণ করেছিল—তখন এক সমালোচক লিখেছিলেন (১৮৫৬): 'তিনি হিন্দী ও পারসিক ভাষা না শিখিলে মহত্তর কবি হইতেন। তিনি যত প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন ততই এইরূপ রচনায় অধিক পরিশ্রম স্বীকার করিতেছিলেন।' এই সমালোচক আরও বলেছেন, 'তিনি প্রচুর পরিমাণে অনুকরণ শব্দ ব্যবহার করেন, ইহাতে কেবল ভাবের অভাব মাত্র প্রতীত হয় ; কেবল শব্দের উপর নির্ভর করা মহৎ কবির লক্ষণ নহে।'[৫]

ছন্দের ব্যবহারে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। রামেশ্বরের কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্য নাই, ভারতচন্দ্র বাংলায় প্রচলিত ছন্দ ছাড়া নানারকম সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ছন্দের কারুকার্যে নাগরিক জীবনের বিলাস এবং আভিজাত্য প্রকাশিত হয়েছে, সাধারণ বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত হাসি ও কান্না প্রকাশিত হয় নি। শব্দ বৈচিত্র্য এবং অর্থ বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতচন্দ্র অলংকার ব্যবহার করেছেন, অর্থালংকারের চেয়ে শব্দালংকারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভারবির অর্থগৌরব নয়, নৈষধের পদলালিত্যই তিনি অনুকরণীয় বলে মনে করেছিলেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: 'ভারতচন্দ্রে যে ছন্দঃ কুশলতা এবং মার্জিত ভাষণ নৈপুণ্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে তাহার প্রথম সূচনা মুকুন্দরামে ; তফাৎ এই যে মুকুন্দরামের সরস কৌতুক ও সরল গ্রাম্যজীবনের স্বাভাবিকতা ভারতচন্দ্রে রাজসভার কৃত্রিম আবহাওয়ায় শ্লেষ-প্রধান, আক্রমণশীল মনোভাবে পরিণত হইয়াছে।'

হাস্যরস সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র সার্থকতা লাভ করেছেন, কিন্তু চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর ব্যর্থতা সুস্পষ্ট। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি 'ছাঁচে ঢালা', 'পাণ্ডিত্য ও শিল্প চাতুর্যের বাহন' ; তাদের ব্যক্তিত্বসূচক বৈশিষ্ট্য নেই।

ভক্তি রসের সংগে আদি রসের সংমিশ্রণ বৈষ্ণব কবিরা প্রবর্তন করেছিলেন, ক্রমে শাক্ত কবিদের রচনায় এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। 'বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বের

৫। রাখালদাস হালদারের সমালোচনা: সুকুমার সেন ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ) কর্তৃক উদ্ধৃত।

পরকীয়াবাদ ও তন্ত্র-সাধনা পদ্ধতির পঞ্চ মকারের বিকৃত প্রয়োগে দেশবাসীর রুচি অনাবৃতপ্রায় ইন্দ্রিয় লালসার প্রতি উন্মুখ' হয়েছিল। সম্ভবতঃ 'মুসলমানী কেচ্ছার কলুষ' সমাজের এই বিকৃতিতে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে রচিত 'কালিকা মঙ্গল' শ্রেণীর কাব্যগুলিতে কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনার সঙ্গে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমকাহিনী সংযুক্ত হয়ে অশ্লীলতার উপাদান জুগিয়েছে। শায়েস্তা খাঁর শাসনকালে রচিত কৃষ্ণরামের 'কালিকা মঙ্গলে' অশ্লীলতা দোষ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। গ্রা[illegible] রচিত রামেশ্বরের 'ভদ্রকাব্য' এই দোষ থেকে মুক্ত নয়। নাগরিক পরিবেশে রচিত ভারতচন্দ্রের কাব্যে—বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর 'বিপরীত বিহার' প্রভৃতি অংশে—এই দোষ অতি বিকৃত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। শ্যামাভক্ত রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর'ও ভদ্ররুচিবিগর্হিত অশ্লীলতায় কলঙ্কিত হয়েছে।

সাহিত্যে শ্লীলতা এবং অশ্লীলতার সীমারেখা সম্বন্ধে বিতর্ক চলছে। কিন্তু প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে শিল্পসৃষ্টির মানদণ্ডেই এই সীমারেখা নির্ধারণ করা উচিত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: 'এই অশ্লীল দেহসম্ভোগের চিত্রকে যতদূর কাব্যগুণোপেত করা যায়, ইহার স্থূল ও রুচিবিগর্হিত বস্তু ও ঘটনাগত উপাদানসমূহকে যতদূর বস্তুর অতীত একটি ভাবরসে পরিণত করা সম্ভব, ভারতচন্দ্র সেই দুরূহ কার্যে চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।' এই সংযত প্রশংসাকে যথার্থ মূল্যায়ন রূপে গ্রহণ করা কঠিন। 'বিপরীত বিহার' অংশে 'ঘটনাগত উপাদানসমূহকে বস্তুর অতীত একটি ভাবরসে পরিণত করার' কোন চেষ্টাই করা হয় নি। প্রকৃত পক্ষে এই অংশটি কাব্যের একটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ; এটি না থাকলেও ঘটনা বর্ণনা, চরিত্রসৃষ্টি বা শিল্পকৌশল প্রদর্শনের দিক থেকে কাব্যের কোনরকম অসম্পূর্ণতা ঘটত না। সম্ভোগ বর্ণনাকে কিভাবে শিল্পভূষণে ভূষিত করে তাকে অশ্লীলতার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে 'কাব্যগুণোপেত' করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'।

* * *

রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়েছিল 'শুদ্ধমূল' বৈদ্য বংশে—সম্ভবতঃ ১৭২০-৩০ সালের মধ্যে। তাঁর জন্মস্থান ছিল কুমারহট্ট গ্রাম। তিনি ভারতচন্দ্রের কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে, সম্ভবতঃ ১৭৬০-৭০ সালের মধ্যে, তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' রচিত হয়েছিল।

রামপ্রসাদ বাংলা ফার্সি, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। অল্প বয়সেই তাঁর চিত্তে আধ্যাত্মিক চেতনা অংকুরিত হয়েছিল, কিন্তু দারিদ্র্যের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে তিনি কলকাতায় এসে এক ধনীর গৃহে মুহুরীর কাজ গ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে, তিনি হিসাবের খাতায় ইষ্ট দেবতার নাম লিখতেন। তাঁর ধর্মভীরু প্রভু তাকে চাকুরি থেকে মুক্তি দিয়ে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি দিলেন। তিনি

স্বগ্রামে ফিরে গিয়ে সেখানে পঞ্চমুণ্ডের আসন প্রতিষ্ঠা করে শক্তিসাধনায় এবং শ্যামাসঙ্গীত রচনায় ব্রতী হলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সম্ভবতঃ কুমারহট্ট অঞ্চলে ভ্রমণ উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁকে ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি ও 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেন।

ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ রাজদরবার এবং নাগরিক জীবনের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন না; ভারতচন্দ্রের মত পাণ্ডিত্য, শাণিত বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ন দৃষ্টিও তাঁর ছিল না। গ্রাম্য পরিবেশে, তান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ভক্তি ধর্মকে অবলম্বন করে তাঁর জীবন কেটেছিল। সমাজে প্রচলিত বৈষম্য ও দুর্নীতি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত তিনি সেই কলুষিত জীবনকে সাহিত্যের মাধ্যমে বিদ্রূপ করেন নি। সম্ভবতঃ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই সমাজের উচ্চ স্তরে উন্নীত হবার পথ উন্মুক্ত হবে।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র পরে এবং তাঁর অনুকরণে রচিত। দুই কাব্যের তুলনায় রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তির দুর্বলতা সহজেই ধরা পড়ে। অশ্লীলতার দিক থেকে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় সমান অপরাধী: তিনিও 'বিপরীত বিহারে'র বর্ণনা দিয়েছেন। রামপ্রসাদের কাব্যের প্রধান গুণ 'ঘরোয়া ভাবের প্রকাশ'। এটা নাগরিক সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকার ফল।

'বিদ্যাসুন্দরে' কবির 'যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সিদ্ধভক্ত রামপ্রসাদের নয়।' কেন ভক্ত কবি গতানুগতিক রীতিতে এই কাব্য রচনা করলেন, তার দু' রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যা এই: যখন 'বিদ্যাসুন্দর' রচিত হয়েছিল তখনও 'অধ্যাত্ম-সাধনার স্পর্শ' তাঁহার জীবনে লাগে নাই, তখনও তিনি কালের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ...তাঁহার শৃঙ্গার রসাত্মক বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি সাধকজীবনের পূর্বাবস্থার রচনা বলিয়া ধরাই যুক্তি ও মনোবিজ্ঞান সম্মত।' এই ব্যাখ্যা তাঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীর বিরোধী। যদি অল্প বয়সেই তাঁর আধ্যাত্মিক আকুতি জাগ্রত হয়ে থাকে, যদি তাঁর কলকাতার মনিব তাঁকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে থাকেন, তবে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার পূর্বেই 'অধ্যাত্ম-সাধনার স্পর্শ' তাঁর জীবন-ধারাকে পরিবর্তিত করেছিল। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই: কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক 'মলিন প্রবাহে রামপ্রসাদকে অবগাহন করাইয়া তাঁহার কালী নামাবলীর উজ্জ্বলতা কথঞ্চিৎ ম্লান হইবার হেতু হইয়াছেন।' কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন ১৭৫৯ সালে, তার পরে দশ বৎসরের মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দর' রচিত হয়েছিল। কিন্তু অন্নদাতার নির্দেশে 'শৃঙ্গার রসাত্মক' কাব্য রচনা করতে যাওয়া ভক্ত সাধকের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। এই দুই ব্যাখ্যার সঙ্গতি রাখতে হলে বলতে হয় যে রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম-সাধনা আরম্ভ হয়েছিল তাঁর পরিণত বয়সে। তাঁর আনুমানিক মৃত্যুকাল ১৭৮১ সাল এবং তাঁর নামে

প্রচলিত শাক্ত পদাবলী তাঁর মধ্য বয়সে বা পরিণত বয়সে রচিত হয়েছিল।

সুকুমার সেন বলেছেন : রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত 'গানগুলি—সব অথবা একটিও—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচনা বলিয়া মনে করা যায় না। মনে হয় গানগুলি একাধিক কবির রচনা, এখন একত্র হইয়াছে রামপ্রসাদ সেনের নামে।' একাধিক রামপ্রসাদের অস্তিত্ব ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকেই স্বীকৃত, কিন্তু এই স্বীকৃতি কেবলমাত্র গান রচনা সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হচ্ছে। কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহধন্য কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সাধক ছিলেন না, শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন নি, কেবলমাত্র 'বিদ্যাসুন্দর' লিখেছিলেন—এই অনুমানের সম্ভাব্যতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা বিচার করতে পারেন।

রামপ্রসাদ নবাবী আমলের শেষ কবি। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কবিওয়ালাদের ছড়া, হাফ-আখড়া, দাঁড় আখড়া, তরজা, ঝুমুর, খেমটা প্রভৃতি কুরুচিপূর্ণ গানের প্রচলন হয়েছিল।

* * *

পর্তুগীজ পাদ্রীদের আওতার বাইরে বৈষ্ণব সাধকেরা—সম্ভবতঃ নাথ যোগীদের কড়চার অনুকরণে—ছোট ছোট গদ্য বাক্য রচনা করেছিলেন। রূপ গোস্বামীর রচনা বলে পরিচিত একটি কারিকার ভাষা অতি সরল :

'আগে ভারে সেবা। তার ইঙ্গিতে তৎপর হইয়া কার্য করিবে। আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে।'

সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রচিত 'জ্ঞানাদি সাধনা' নামে সহজিয়া সম্প্রদায়ের একটি গ্রন্থে আছে :

'পরে সেই সাধু কৃপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্য করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে সেই চৈতন্য মন্ত্রের অর্থ জানাইয়া পরে সেই জীব দ্বারাএ দশ ইন্দ্রিয় আদি যুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীকৃষ্ণাদির রূপ আরোপ চিন্তাতে দেখাইয়া পরে সিদ্ধি অভিমান শ্রীকৃষ্ণাদির মুক্তি পৃথক দেখাইয়া প্রেম লক্ষণার সমাধি ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন।'

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে জয়নাথ মুন্সীর কোচবিহারের 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থের ভাষা জটিল :

'শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কিশোরকাল হইবাই পার্শী বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্ন আর খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন বরং পার্শীতে এমন খোষনবিশ লিখক সন্নিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় লোক সকলের এবং পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা পুষ্প তৎস্বরূপ চিত্র করেন অশ্বারোহণে ও গজচালনে অদ্বিতীয়।'

১৭৭৫ সালে লেখা 'ভাষা-পরিচ্ছেদ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে সরল ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে :

'গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলে মুক্তি হয়।'

প্রায় সমসাময়িক 'বৃন্দাবনলীলা' গ্রন্থে প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে :

(শ্রীকৃষ্ণ) 'যে দিবস ধেনু লইয়া এই পর্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে গঙ্গা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন।'

এই সব উদাহরণ[৬] থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের বহু পূর্বেই সাহিত্যপদবাচ্য বাংলা গদ্যের উদ্ভব হয়েছিল।

স্মৃতিশাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থ অষ্টাদশ শতকে মোটামুটি সরল বাংলা গদ্যে অনূদিত হয়েছিল।[৭]

রামমোহন রায় ইংলণ্ডে অবস্থান কালে জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : 'ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম।' তাঁর জীবনীকার নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, (১৭৮৮ বা ১৭৯০ সালে রচিত) এই 'পুস্তক' যে (বাংলা) 'গদ্যগ্রন্থ, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় হইতে পারে না।'[৮] ষোল বৎসর বয়সে রামমোহন সংস্কৃতে, অথবা ফার্সিতে, অথবা আরবীতে ধর্মালোচনা মূলক পুস্তক রচনার উপযোগী ভাষাজ্ঞান অর্জন করেছিলেন, একথা মনে করা যায় না।

জমিসংক্রান্ত দলিল বাংলায় লেখা হত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৪৯ সালে কবি ভারতচন্দ্রকে জমি দান করে যে সনদ দেন তাতে আছে :

'সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনাওরপুর চাকলায় বসতি করিয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেশ গরজমাই উদ্জট বাস্তু ও লায়েক বাগাতি জঙ্গল-ভূমি…বৃত্তি দিলাম বাস্তুতে সপরিবারে বসতি করিয়া বাগাতি জমিতে বাগিচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিজ জোতে ভোগ করহ…।'[৯]

চিঠিপত্রে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ষোড়শ শতকেই প্রচলিত হয়েছিল। ১৫৫৫ সালে কোচবিহারের রাজা আসামের অহোম রাজাকে লিখেছিলেন :

'এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। এখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।'

সপ্তদশ শতকের শেষে (১৬৮২ সালে) লেখা একটি চিঠিতে আছে :

৬। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (মধ্য যুগ), পৃষ্ঠা ৪২৬-২৭।
৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'স্মৃতি কল্পদ্রুম' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের প্রাচীন পুঁথি দেখেছিলেন। (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত', ১১৮-১৯ পৃষ্ঠা।
৮। নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', ৫ এবং ৩১৯ পৃষ্ঠা।
৯। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ', ৪১-৪২ পৃষ্ঠা।

'কএক দিবস হইল তথাকার মঙ্গলাদি পাই নাই। মঙ্গলাদি লিখিয়া আপ্যারিত করিবেন। ...মহাশয় আমার কত্তা আমি ছাওল আমার দোষসকল আপনকার মাপ করিতে হয়।'[১০]

অষ্টাদশ শতকের বহু চিঠি সংগৃহীত হয়েছে।[১১] বাঙালীদের পক্ষে বাংলায় চিঠি লেখা স্বাভাবিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহারাজা নন্দকুমারের দুটি চিঠি (১৭৭১ এবং ১৭৭২ সালে লেখা) এবং কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ও জয়নারায়ণ ঘোষালের লেখা একটি চিঠি (১৭৮৭ সাল) উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারত সরকারের মহাফেজখানায়[১২] রক্ষিত বাংলায় লেখা ১৭৫ খানি চিঠি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রগুলির অধিকাংশই আসাম, মণিপুর, কাছাড়, কোচবিহার ও ভুটান অঞ্চলের শাসকদের এবং তাঁদের কর্মচারীদের লেখা। সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন: 'ভুটান, কুচবিহার, আসাম, মণিপুর ও কাছাড়ের নৃপতি-গণ এই ভাষায়ই (অর্থাৎ বাংলা ভাষায়) পরস্পরের সহিত এবং ইংরাজ সরকারের সহিত পত্রালাপ করিতেন। বাঙ্গালাই যে তখন পূর্বোক্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল আমাদের সংকলিত পত্রগুলি পাঠ করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।' এই পত্রগুলি যখন লেখা হয়েছিল তখন আসাম, মণিপুর, কাছাড় ও ভুটানে ইংরেজদের রাজত্ব দূরে থাকুক, তাদের রাজ-নৈতিক প্রভাবও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং তাদের আশ্রয়ে বাঙালীরা ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করে নিজেদের ভাষা স্থানীয় শাসকদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিল, এমন কথা বলা যায় না। বাংলা ভাষা 'কেবল স্বমহিমায়' সমগ্র পূর্ব ভারতে 'আপনার প্রতিপত্তি বিস্তার' করেছিল।

উনবিংশ শতকে আসামে কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হবার পরে সেখানে স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা প্রচলিত হয়েছিল, এই মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভারত সরকারের মহাফেজখানায় আরাকানী ভাষায় লেখা চিঠিও আছে, কিন্তু অসমীয়া ভাষায় লেখা চিঠি একখানিও নেই।

সুরেন্দ্রনাথ সেনের গ্রন্থে মুদ্রিত চিঠিগুলির ভাষা অতি জটিল, সাহিত্যিক মূল্যহীন বিভিন্ন সূত্র থেকে আহৃত শব্দের বিচিত্র সংমিশ্রণ।

১৭৯৪ সালে আসামের রাজার তিন মন্ত্রী ('শ্রীযুত বুঢ়া গোহাঞি শ্রীবড় গোহাঞি শ্রীবড় পাত্র গোহাঞি') গভর্নর-জেনারেলকে 'সকলরো নিবেদন' জানাচ্ছেন:

১০। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (মধ্য যুগ), ৪২৮ পৃষ্ঠা।

১১। দ্রষ্টব্য: সুরেন্দ্রনাথ সেন, 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন'। পঞ্চানন মণ্ডল, 'চিঠি-পত্রে সমাজচিত্র'। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত, আনিসুজ্জামান কর্তৃক সম্পাদিত 'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি'।

১২। ইংরেজ আমলে 'mperial Record Department নামে পরিচিত, বর্তমান নাম National Archives of India।

'স্বস্তি শ্রীপ্রভাকর কর প্রতাপ ব্যাপ্ত সকল ভূমণ্ডল জাচক মনোরথ পূরক কল্পপাদক মহামহিম গুণ-ধাত্র সুচারু চরিত শ্রীশ্রীগবনের কৌশল জেনারেল বাহাদুর বহুমররারাক্ষেষু প্রীতিপূর্ব্বকা লিপিরিয়ং বিরাজিততরাং ভবভাবুক মনবরত শ্রীশ্রী৺স্থানে সমিহামহে তদত্রাস্মাকং ভাবুকমব্যাহত……'

১৭৯৪ সালে আসামের রাজা 'শ্রীশ্রী৺স্বর্গ' নারায়ণদেব শ্রীমত্ গৌরীনাথ সিংহ' লিখছেন: 'সকল মঙ্গলালয় গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক অশেস গুণালংকৃত গঙ্গাজল নির্ম্মল পবিত্র কলেবর শ্রীযুত কলিকাতার বড় সাহেব সুচারু চরিতেষু': "শ্রীশ্রী৺ ঈশ্বর ঈশ্বরির স্থানে সদা সর্ব্বদা তোমার কুশল বাঞ্ছিতেছি… ৺কুম্পানির সিফাই এখানে না থাকিলে রাজ্য রখ্যা পায় না…যাতায়াতে কুশল লিখিয়া প্যাইত করিবেন।'

১৭৯৮ সালে মণিপুরের রাজা 'অনুপেক্ষনীয়' ভাগ্যচন্দ্র সিংহ 'মহামহিম শ্রীযুৎ লার্ড মারনিংটন গবনর জানরেল বাহাদুর দোর্দণ্ড প্রতাপেষু' 'বিনয়পূর্ব্বক সেলাম নিবেদন' জানাচ্ছেন: 'আমার মুক্তিয়ার উকিল… মজকুরকে সরফরাজ করিয়া ত্বরায় বিদায় হুকুম হইলে বহুত মেহেরবানগী লাভ সাহেবের দৌলত জেয়াদার খএরাফিয়ত লিখিয়া খুসী করিতে হুকম হইবেক।'

১৭৭৯ সালে ভুটানের রাজার উকিল করার' লিখে দিচ্ছেন: 'দেবরাজ হিন্দু মোশলমান লোক আশীতে জাইতে তেজারতী করিতে কোন আটক করিবেন না তাহারা চন্দন নিল গুগুল সাবব পান সুপারি নিতে পারিবেক না…।'

১৮১৫ সালে এক চিঠিতে ভুটানের রাজা রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখছেন: 'আপনের ২ আসাড়ের পত্রচিন্য দোরোখা বানাত ৫ পাচ জামা ও দুরবিন ১ একটা সহিত আপনের তরফ উকিল শ্রীরামমোহন রাএ ও শ্রীকৃষ্ণকান্ত বসুর মাঃ পাইয়া বহুত খুসি হইলাও…।' চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে রায়কে ফেরৎ পাঠানো হল. তাঁর 'জবানিতে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাতো হবেন।' এই চিঠি আশ্বিন মাসে লেখা, রংপুরে সরকারী সেরেস্তায় নথিভুক্ত হয়েছিল ১৮১৫ সালের ১২ নভেম্বর। সুতরাং রামমোহন রায় ১৮১৪ সালের কয়েকমাস (আষাঢ় থেকে আশ্বিন) ভুটানে ছিলেন। তিনি হয়তো ১৮১৫ সালের শেষ দিকে কলকাতায় এসে এখানে বাস করতে আরম্ভ করেন, তার আগে নয়।

২। সমাজ

নবাবী আমলে ধর্মকেন্দ্রিক সমাজে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নি। হিন্দু সমাজে স্মৃতিশাস্ত্রের শাসন এবং পূর্বপ্রচলিত রীতির আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। মুসলমান সমাজ পীর, মোল্লা এবং মৌলবীদের নির্দেশে

পরিচালিত হত। দুটি সমাজই নিজ নিজ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকত, বৃত্তের সর্বজনস্বীকৃত সীমারেখা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। ফার্সি ভাষা শিক্ষা, রাজকার্য উপলক্ষে মেলামেশা, কোন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দর্শক রূপে যোগদান প্রভৃতি কারণে পোষাকে ও কথাবার্তায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কিছু মুসলমানী ভাব প্রবেশ করেছিল। কিন্তু বিবাহ এবং খাদ্যগ্রহণ সম্বন্ধে পূর্বপুরুষের রীতির বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমও অকল্পনীয় ছিল।

বর্ণাশ্রম শাসিত হিন্দু সমাজ বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব—এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক মতভেদের ইঙ্গিত আছে, বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাও আছে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' শিবনিন্দার জন্য বিষ্ণুভক্ত ব্যাসকে বিষ্ণু নিজেই তিরস্কার করেছেন ঃ

যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।

... ...

শিবের যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবের যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট ॥

'শিবায়নে'র কবি রামেশ্বর বলেছেন, 'হরিভক্তি দেও রামেশ্বরে'। শ্যামা মাকে সম্বোধন করে রামপ্রসাদ বলেছেন ঃ

কালী, হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।

আর এক গানে তিনি বলেছেন ঃ

অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্ম স্বরূপিণী।

হিন্দু ধর্মের উপর মুসলমানদের 'দৌরাত্ম্য' সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু রামেশ্বর রাম ও রহিমের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পেয়েছেন ঃ মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম'। রামেশ্বর লিখেছেন 'সত্যপীরের কথা', ভারতচন্দ্র লিখেছেন 'সত্যপীরের পাঁচালী'। সত্যপীরের পূজো হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত'—এই মত আচার্য রমেশ চন্দ্র মজুমদার অগ্রাহ্য বলে মন্তব্য করেছেন।[১৩]

বিভিন্ন দেবদেবী যে একই গুণাতীত মহা শক্তির প্রকাশ, এই বিশ্বাস অষ্টাদশ শতকের পৌত্তলিক হিন্দু সমাজেও লুপ্ত হয় নি। রামপ্রসাদের কালী 'প্রণব-রূপিণী', 'উৎপত্তি-প্রলয় স্থিতি ত্রিধাকারিণী', সগুণা নির্গুণা

১৩। 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (মধ্য যুগ), ৩৩০-৩১ পৃষ্ঠা।

স্থূলো, সূক্ষ্মা, মূলো, হীনমূলো।' আর এক গানে ভাবোন্মত্ত কবি বলেছেন : 'তারা আমার নিরাকারা'।[১৪]

উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন রামমোহন রায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকেও অদ্বৈত তত্ত্ব বাংলায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকও তাঁর আরাধ্য দেবতাকে পরমব্রহ্ম রূপে আবাহন করতেন। ১৭৫৪ সালে বীরভূম জেলার এক শিবমন্দিরে উৎসর্গলিপিতে শিবকে 'ব্রহ্মণে পরমাত্মনে' বলে তাঁর কাছে মোক্ষ প্রার্থনা করা হয়েছে। বর্ধমান জেলায় কালনায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক গোপাল মন্দিরে দেবমূর্তিকে 'পরব্রহ্ম' রূপে আরাধনা করা হয়েছে (১৭৬৬)। নদীয়া জেলায় আমঘাটায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৭৬৬) হরিহর মন্দিরকে উৎসর্গ করা হয়েছে 'অদ্বৈত ব্রহ্মরূপম্'-এর উদ্দেশ্যে।[১৫] সাধনার এই উচ্চ স্তরে উত্তরণের পরিচয় সাহিত্যেও পাওয়া যায়। কালীসাধক রামপ্রসাদ বলেছেন : 'জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না।' তাঁর কাছে কালীই ব্রহ্ম। তিনি 'ব্রহ্মময়ী-সুত' মানুষকে মা ভৈঃ বাণী শুনিয়েছেন :

ও মন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী,
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ?

কিন্তু এসব বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে সেকালের শিক্ষিত সমাজে অদ্বৈতবাদের প্রসার প্রমাণিত হয় না। সাকার সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১৬] শিক্ষিত সমাজে পৌত্তলিকতার প্রভাবে ভাটা পড়ে নি। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বই লেখার অপরাধে রামমোহনকে কৈশোরে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। কবি রামেশ্বর বলেছেন :

ত্রিভুবনে যেখানে যে আছে দেবী দেবা।
সংক্ষেপে সবার পায় শত শত সেবা।
বন্দিব গন্ধর্ব সর্ব গায়েনের পায়।
গীতবাদ্য সে রাগরাগিণী সমুদায়॥
দৈত্য দানা প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ।
ডাকিন্যাদি সকলে আমার দণ্ডবত॥

শাস্ত্রের অনুশাসন উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী জাতি এবং তথাকথিত অস্পৃশ্য হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন

১৪। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, দেবতার ধ্যানে তাঁর যে মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায় সেটা মানুষের কল্পনা নয়, স্বয়ং ব্রহ্ম উপাসকের উপকারের জন্য নিজের ঐ রূপ কল্পনা করেছেন। 'উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণোঃ রূপকল্পনা।' গীতার সপ্তম অধ্যায় (২১ শ্লোক) এবং নবম অধ্যায় (২৬ শ্লোক) দ্রষ্টব্য।

১৫। দ্রষ্টব্য : A. K. Bhattacharya, *A Corpus of Dedicatory Inscriptions from Temples of West Bengal.*

১৬। নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', ১১৮-২০ পৃষ্ঠা।

লৌকিক দেবদেবীর পূজো প্রচলিত ছিল এবং তাদের সামাজিক রীতিনীতি আচার-ব্যবহার রঘুনন্দনের বিধানের আওতার বাইরে ছিল।

অষ্টাদশ শতকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সুন্নীদের সংখ্যা ছিল বেশি, কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর পরবর্তী নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিয়াদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলমান সমাজে কোন উচ্চ শ্রেণীর সাধকের আবির্ভাব হয় নি। সাধারণ পীর, ফকির, মৌলবী ও মোল্লাদের নেতৃত্বে গোঁড়ামি দৃঢ়মূল হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে রামমোহন রায় 'তহফাতুল মওয়াহিদ্দীন' নামক ফার্সি ভাষায় লিখিত গ্রন্থে ইসলাম ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। নবাবদের বৃত্তিভোগী কোন মৌলবী এ রকম কাজে হাত দেন নি।

*   *   *

অষ্টাদশ শতকের হিন্দু মহিলাদের মধ্যে রাণী ভবানী বাঙালীর ঐতিহ্যে সম্মানের আসন অধিকার করেছেন। তিনি ধর্মপ্রাণা ও দানশীলা ছিলেন। বিশাল জমিদারী পরিচালনার কাজে তাঁকে নানারকম বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

বর্ধমানের মহারাজা কীর্তি চাঁদের মা বিষ্ণুকুমারী ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের গড় ধ্বংস করেন এবং নিজে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে যাবতীয় ধনরত্ন অধিকার করেন।

মহিলা জমিদার জয়দুর্গা চৌধুরানী রংপুরে দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন।

এগুলি মহিলা সমাজের অসহায় অবস্থার ব্যতিক্রম মাত্র। গভর্নর ভেরেলস্ট লিখেছেন: 'স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয়েই তাদের প্রভুদের ইচ্ছার অনুগত ('wholly subject to the will of their masters')। মনুর বচন—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—সমাজ নিয়ন্ত্রণ করত।

যে সমাজে পুরুষের শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ছিল সেখানে স্ত্রীলোকের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা আশা করা যায় না। ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ বিদ্যাকে শিক্ষিতা মহিলা রূপে উপস্থিত করেছেন। রাণী ভবানী সুশিক্ষিতা ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণের স্ত্রীরা পড়তে পারতেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে অধিকার অর্জন করে হটী বিদ্যালঙ্কার কাশীতে বাস করতেন। মহিলা কবি আনন্দময়ী বিদুষী ছিলেন। তিনি বিবাহের উৎসব বর্ণনায় লিখেছেন:

> হের চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
> সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ॥
> কতি প্রৌঢ়ারূপা, ওরূপে মজন্তি।
> হসন্তি, সখলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি ॥

... ...

দেখি চন্দ্রভালে, কত চিত্তহারা।
নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা ॥

দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন: 'রমণী কবির দৃষ্টি শব্দালঙ্কারের প্রতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।'

বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, শৈশবে মেয়েদের বিয়ে হয় এবং ২৫ বৎসর বয়সেই তাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে।[১৭]

ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা এবং বর-পণ গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল। কুলীনেরা অর্থ লোভে বহু স্ত্রী গ্রহণ করত, কিন্তু তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করত না। কুলীনের পক্ষে কুলীনে কন্যা দান করা সামাজিক হিসাবে বাধ্যতামূলক ছিল। অকুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীনে কন্যাদান করে নিজ পরিবারের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করত।

কন্যা বিক্রয়ের প্রথাও প্রচলিত ছিল। রামমোহন রায়ের সময়ে নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ('the Brahmins of less respectable caste') এবং উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থেরা ('the Kayasthas of high caste') অর্থলোভে বৃদ্ধ, রুগ্ন, অঙ্গহীন ব্যক্তির সঙ্গে কন্যা ও ভগ্নীর বিবাহ দিত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর জমিদারীতে এই কুপ্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন।[১৮]

সতীদাহ প্রথার প্রচলন সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কাব্যে এবং বিদেশী লেখকদের বইতে উল্লেখ আছে। জনৈক বিদেশী লেখক বলেছেন, এই প্রথার প্রচলন সীমাবদ্ধ ছিল ('was far from common') এবং কেবলমাত্র খ্যাতিমান পরিবারেই ('illustrious families') বিধবারা স্বামীর অনুগমন করত। কবি আনন্দময়ী সহমরণে দেহত্যাগ করেছিলেন।

হিন্দু আইন স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার স্বীকার করত না, ফলে বিধবাকে সম্পূর্ণভাবে পুত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। রামমোহন রায় লিখেছিলেন:

'দায়াধিকার সম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবস্থা বঙ্গদেশে সহমরণ ও বহুবিবাহের আধিক্যের একটি কারণ। ভারতবর্ষের অপরাপর স্থান অপেক্ষা বঙ্গভূমিতে সহমরণের সংখ্যা অধিক। কেবল ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বাল্যসংস্কার এই আধিক্যের

১৭। 'They are married in their infancy and consummate at 14 on the male side, and 10 or 11 on the female, and it is common to see a woman of 12 with a child in her arms···at 18 their beauty is on the decline, and at 25 they are strongly marked with age'. Scrafton, *Reflections on the Government of Indostan*, ১০-১১ পৃষ্ঠা।

১৮। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', ৩০৫ পৃষ্ঠা।

কারণ নহে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিত্ত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বিধবাগণকে কি প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয় তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদিগের জীবনের প্রতি মমতা হ্রাস হইয়া যায়; সুতরাং ইহকালের দারুণ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরকালে স্বর্গসুখ ভোগের আশায় অনেকে সহমৃতা হইতে সহজে সম্মতি প্রদান করে। দায়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থা বহুবিবাহের আধিক্যের কারণ কেন? যদি পুরুষ জানিত যে তাহার বিবাহিত পত্নীকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হইবে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধিক সংখ্যায় বিবাহ করিতে সংকুচিত হইত। যতই বিবাহ করি না কেন, কোন স্ত্রীই বিত্তের অংশভাগিণী হইবে না, এমন কি, তাহার ভরণপোষণের ভার পর্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে না, এরূপ জানিলে লোকের বহু বিবাহ প্রবৃত্তি প্রবল হইবারই কথা।'[১৯]

সতীদাহ নিবারণ এবং বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য অষ্টাদশ শতকে কোন প্রচেষ্টা হয় নি। রাণী ভবানী তাঁর বিধবা কন্যার দুঃখ কিঞ্চিৎ লাঘব করার উদ্দেশ্যে একাদশীর কঠোরতা হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতদের আপত্তিতে তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। রাজা রাজবল্লভ তাঁর নাবালিকা বিধবা কন্যার বিয়ের পক্ষে পণ্ডিত সমাজের একাংশের সম্মতি লাভ করেছিলেন, কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা এই প্রচেষ্টায় বাধা দিলেন। শাস্ত্রানুসারে বিধবা বিবাহ যুক্তিযুক্ত কিনা, এ বিষয়ে রামমোহন রায়ের সন্দেহ ছিল। তিনি কখনও বিধবা বিবাহের সমর্থন সূচক মন্তব্য প্রকাশ করেন নি।[২০]

কৃষ্ণচন্দ্র রক্ষণশীল সমাজের শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কার্তিকেয় চন্দ্র রায় 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' বইতে লিখেছেন:

'কৃষ্ণচন্দ্র স্বদেশের কোন কলুষিত ব্যবহার পরিশুদ্ধ করণে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার সময়ে এ প্রদেশে যেরূপ সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, আর তৎকালীন হিন্দু সমাজের উপর তাঁহার যে প্রকার প্রভুত্ব ছিল, বোধ হয়, তিনি যত্নশীল হইলে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবহার মূলক অনেক বিগর্হিত রীতি নিরসন ও হিতজনক রীতি সংস্থাপনে কৃতকার্য হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া বরং যাহাতে ঐ পূর্ব কুরীতি বলবতী থাকে, তৎপ্রতিই সর্বদা যত্ন করিয়াছেন, এবং অন্য কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি স্বদেশের কোন দূষিত ও অহিত ব্যবহার নিরাকরণে যত্নবান হইলে, তাঁহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছেন, একাদশী তিথিতে দুঃখিনী বিধবাদের পক্ষে উপবাসের অনুকূল বিধান, তাহাদের অশেষ ক্লেশকর বৈধব্য যন্ত্রণা বিমোচন অথবা সহমরণ, বহু বিবাহ ও বাল্য

১৯। তদেব, ৩০৪-৫ পৃষ্ঠা (গ্রন্থকার কর্তৃক রামমোহনের মতের সার সংকলন)।
২০। তদেব, ৩০৯ পৃষ্ঠা।

পরিণয় প্রথা অপনয়ন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল এই তিথিতে, এই মাসে, এই বারে এই দ্রব্য ভক্ষণে নিষেধ ইত্যাদি যৎসামান্য বিষয়েই ব্যাপৃত থাকিতেন।'

রামমোহন রায়ের পরিণত বয়সে লিখিত সহমরণ বিষয়ক বইতে বাংলার নারীর দুরবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা' অষ্টাদশ শতকের মহিলা সমাজ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য :

'দেখ, কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা (বাংলার স্ত্রীলোকেরা) কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশ পনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাঁহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন; তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন তাঁহাদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময়ে পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু, স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থানমার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্রমার্জ্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন; এই নিমিত্ত বিষয় ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী, শ্বাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, যাঁহাদের ধনবত্তা নাই, তাঁহাদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘোষী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম, তাহাও করেন; মধ্যে মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী

দরিদ্র যে পর্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়। এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে। আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে। অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যথাপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনর্ব্বার প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্ব্বজাত ক্রোধ নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ……'

৩। সংস্কৃতি

বখতিয়ার খলজীর সময় থেকে বাংলায় দুটি পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতির স্রোত দুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। তারা কখনও সম্মিলিত হয়ে সঙ্গম সৃষ্টি করে নি। এই দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছিন্নতা চরম পরিণতি লাভ করল ১৯৪৭ সালে।

হিন্দু সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্য। মুসলমান সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল আরবী ভাষায় লেখা ধর্মগ্রন্থ এবং ফার্সি ভাষায় লেখা কাব্য। হিন্দুকে জীবিকা অর্জনের জন্য ফার্সি শিখতে হত, মুসলমানের পক্ষে সংস্কৃত শেখার কোন প্রয়োজন ছিল না। ধর্মের মূল তত্ত্ব জানবার জন্য যে আগ্রহ রামমোহন রায়কে আরবী ও ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত 'জবরদস্ত মৌলবী') করেছিল, সংস্কৃত শেখার জন্য সে রকম আগ্রহ কোন মুসলমানের ছিল না। ইসলাম সকল সত্যের আকর, অন্য সকল ধর্মই মিথ্যা—এই ধারণা মুসলমান সমাজে বদ্ধমূল ছিল। এই ধারণা থেকে সরে যাবার চেষ্টা ভারতীয় ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আকবর এবং দারা ছাড়া কেউ করে নি। সুতরাং দুই সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকৃত 'মিশ্র সংস্কৃতি'র ('composite culture' উদ্ভব সম্ভব ছিল না।

অষ্টাদশ শতকে বাংলায় মুসলমানদের কোন প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না, বাংলায় কোন খ্যাতনামা মুসলমান ধর্মতত্ত্ববিদের জন্ম হয় নি। রামমোহন রায় অল্প বয়সে আরবী ও ফার্সি শিক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে বা ঢাকায় যান নি, তাঁকে যেতে হয়েছিল পাটনায়। মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল উত্তর ভারতে

—পাটনা থেকে দিল্লী পর্যন্ত প্রসারিত অঞ্চলে। পাদশাহী শাসনের বিলোপ হলেও বাংলায় মুসলমান সমাজে উত্তর ভারতের ধর্মীয় প্রভাব ক্ষুন্ন হয় নি।

অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ছিলেন দিল্লী নিবাসী শাহ ওয়ালিউল্লা (১৭০৩-৬৪)।[২১] ইকবাল তাঁকে "ইসলামের শেষ শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদ' ('last great theologian of Islam') আখ্যা দিয়েছেন। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেছেন, ওয়ালিউল্লা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে এই উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হওয়া পছন্দ করতেন না; তাঁর ইচ্ছা ছিল যে তারা ভারতের বাইরে অবস্থিত মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করবে এবং ইসলাম তাদের প্রেরণা এবং আদর্শের উৎস থাকবে।[২২] মোটকথা, মুসলমানেরা ভারতবর্ষে বাস করেও তাদের মন এই দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে। ওয়ালিউল্লার 'মাদ্রাসা-ই-রহিমীয়া'তে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা সমাগত হত। তাদের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ত। মারাঠাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য তিনি বিদেশী আক্রমণকারী আহম্মদ শাহ আবদালিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, কারণ 'কাফেরে'র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলাম বিপন্ন হবে। তাঁর শিক্ষা ওহাবীরা গ্রহণ করেছিল এবং পূর্ব বাংলার ফরাজীদের প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তী কালের খিলাফত আন্দোলন অনেকাংশে তাঁর প্রভাবের ফল।

অষ্টাদশ শতকে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি সমন্বয়ের যে সব উদাহরণ দেওয়া হয় তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অতি সামান্য। দুই সম্প্রদায় দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করলে ছোটখাট বিষয়ে একে অন্যের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু তার ফলে কোন সংস্কৃতির রূপান্তর বা উভয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে না। হিন্দুরা পীর-ফকীরকে শ্রদ্ধা করত তাঁদের তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার জন্য, কিন্তু তাঁদের স্পৃষ্ট অন্ন বা পানীয় গ্রহণ করত না। প্রবাদ আছে, মীরজাফরের মৃত্যুশয্যায় তাঁকে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করানো হয়েছিল—সম্ভবতঃ তাঁর বিশ্বাসভাজন নন্দকুমারের পরামর্শে। এটা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রীর যে কোন উপায়ে বেঁচে থাকার জন্য শেষ চেষ্টা, হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রমাণ নয়। হিন্দুরা মহরমের শোভাযাত্রায় যোগ দিত, মুসলমানেরা হোলি খেলত—কারণ আমোদ-উৎসবে যোগ দেওয়া সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। 'আমীর হামজা' এবং

২১। দ্রষ্টব্য: A. C Banerjee, *Two Nations*, ৪৪-৫২ পৃষ্ঠা। S. A. A. Rizvi প্রণীত *Shah Wali Allah and His Times* বইতে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

২২। 'Waliullah did not want the Muslims to become part of the general milieu of the sub-continent; he wanted them to keep alive their relations with the rest of the Muslim world so that the springs of their inspiration and ideal might ever remain located in Islam…'.

'ইউসুফ জোলেখা'র কবি গরীবউল্লা আসরে সমবেত সকল হিন্দু এবং মুসলমানের জন্য আল্লার 'দোয়া' প্রার্থনা করেছেন। গ্রামে যখন গানের আসর বসে তখন সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ সেখানে সমবেত হয় এবং কবি সাধারণ রীতি অনুসারে সকলের জন্য দৈব কৃপা প্রার্থনা করেন।

হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে, বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে, আইনে, সাহিত্যে, দর্শনে মুসলমানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। জাতিভেদহীন মুসলমান সমাজের প্রভাবে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা ভেঙে পড়ে নি, বরঞ্চ পূর্বাপেক্ষা বেশি কঠোর হয়েছিল। মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস, সমাজ-ব্যবস্থা, আইন প্রভৃতি হিন্দুর প্রভাবে পরিবর্তিত হয় নি।

হিন্দু ধর্ম ইসলামকে গ্রাস করতে পারে নি, তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ভারতচন্দ্র 'যাবনী মিশাল' ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু 'যবন'-পৃষ্ট অন্ন বা জল কখনই গ্রহণ করতেন না। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মানসিংহের যে কাল্পনিক কথোপকথন তিনি রচনা করেছেন তাতে সমসাময়িক শিক্ষিত হিন্দুদের আশংকা ব্যক্ত হয়েছে। হিন্দুদের 'আখেরে' কি হবে, এই দুশ্চিন্তায় পীড়িত বাদশাহ তাদের কলমা পড়াবার 'বাসনা' ব্যক্ত করেছেন! নবাবী আমলে এরূপ 'বাসনা' পূরণের কোন প্রমাণিত দৃষ্টান্ত নেই; কিন্তু হিন্দুদের মনে যে পূর্ববর্তী কালের বিভীষিকার ছায়া লুপ্ত হয় নি সে কথা কবি স্পষ্ট ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।[২৩]

* * *

দ্বিধাবিভক্ত সংস্কৃতির উৎস ছিল দ্বিধাবিভক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা। হিন্দুদের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল টোল ও চতুষ্পাঠী। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি এবং ন্যায়। ব্যবহারিক প্রয়োজনে স্মৃতির খুব আদর ছিল, কারণ হিন্দুরা দশ কর্ম বিধানের জন্য স্মৃতির পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হত। স্মৃতির ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণেরা সমাজকে শাসন করতেন। অলংকার, ছন্দঃ, বেদান্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রও পড়ানো হত।

বৈদিক সাহিত্যের চর্চার সূত্রপাত করেন রামমোহন রায়। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখেছিলেনঃ 'বঙ্গদেশে বেদের লোপই হইয়া গিয়াছে। টোলে টোলে ন্যায় শাস্ত্র পড়া হয়; অনেক ন্যায়বাগীশ স্মার্ত্তবাগীশ

২৩। সম্প্রতি একজন ইতিহাসলেখক বলেছেন, মুর্শিদকুলি খাঁ 'মুর্শিদাবাদের আশে পাশের হিন্দু মন্দির ভেঙে কাটোরায় নিজের সমাধি ও মসজিদ বানিয়েছিলেন, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অফিসার, মুরাদ ফরাস কিছু বাড়াবাড়ি করেছিলেন বলে মনে হয়।' (সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, 'প্রাক্-পলাশী বাংলা', ৮১, ১৬২ পৃষ্ঠা)। মুরাদ ফরাসকে কি কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল? রাজধানীর সংলগ্ন অঞ্চলে তার 'বাড়াবাড়ি' কি 'ব্যক্তিগতভাবে খুবই উদার প্রকৃতির মানুষ' যে নবাব তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি?

সেখান হইতে বাহির হন; কিন্তু সেখানে বেদের নাম গন্ধ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণের ধর্ম যে বেদ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, তাহা এদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; কেবল বেদ-বিরহিত নামমাত্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণ সকল রহিয়া গিয়াছেন। দুই একজন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিন্ন, কেহ তাঁহাদের নিত্যকর্ম সন্ধ্যা-বন্দনার অর্থ পর্যন্ত জানেন না।[২৪] অষ্টাদশ শতকে যদি বেদ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত থাকত তবে দেবেন্দ্র নাথের যৌবনকালে তাঁর এরূপ দুঃখ প্রকাশের প্রয়োজন হত না।

সংস্কৃত কাব্যে রাজশক্তি এবং ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল যুগ্ম শক্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে: 'ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থম্'। রাজা ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করবেন, ব্রাহ্মণ তাঁকে সমাজ-শাসনে সাহায্য করবেন। মুসলমান রাজত্ব কালে ব্রাহ্মণদের পক্ষে রাজানুগ্রহ লাভ সম্ভব ছিল না, কিন্তু বিত্তশালী হিন্দু জমিদারেরা প্রাচীন ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। পশ্চিম বাংলায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং পূর্ব বাংলায় রাজা রাজবল্লভ পণ্ডিতদের এবং সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ এবং তিলকচাঁদ, বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজা গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহ, নাটোরের রাণী ভবানী—এঁদের কাছেও পণ্ডিতেরা যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করতেন।

সংস্কৃতচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল গঙ্গার পূর্ব কূলে কৃষ্ণচন্দ্রের নদীয়া, 'বারাণসী সমতুল' গঙ্গার পশ্চিম কূলে বর্ধমান, এবং পূর্ব বাংলায় রাজবল্লভের রাজনগর (ঢাকা)। রামপ্রসাদ লিখেছেন, বর্ধমানে সংস্কৃত পড়ার জন্য দ্রাবিড়, উৎকল, মিথিলা ও কাশী থেকে ছাত্রদের সমাগম হত। ১৮১৮ সালে লেখা এক খ্রীস্টান মিশনারীর বিবরণে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র রূপে গঙ্গার পূর্ব কূলে ভাটপাড়া, কুমারহট্ট, জয়নগর ও মজিলপুর এবং গঙ্গার পশ্চিম কূলে বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, বালী ও আন্দুল—এই কয়টি স্থানের উল্লেখ আছে।

১৮২৩ সালে রামমোহন রায় বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে লিখেছিলেন: গতানুগতিক প্রথায় ব্যাকরণ, বেদান্ত, ন্যায় প্রভৃতি পড়ে বাঙালী কেবল 'কাল্পনিক পাণ্ডিত্য' ('imaginary learning') অর্জন করতে পারবে, গণিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারবে না।[২৫]

২৪। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী' (সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত), ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা।

২৫। '…no improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of…Sanscrit grammar…Neither can much improvement arise from…speculations…which are the themes suggested by Vedanta…The student of the Nyaya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are divided…'

অষ্টাদশ শতকে এমন কথা কেউ বলে নি, বলা সম্ভবও ছিল না, কারণ সংস্কৃতের মাধ্যমে গণিত ও বিজ্ঞান চর্চা বহুদিন পূর্বে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রামমোহন নিজে আরবী, ফার্সি ও সংস্কৃতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে পরে ইংরেজী শিখেছিলেন।

হিন্দু মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন অত্যন্ত সীমিত ছিল, তবে কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। রাঢ় দেশের কুলীন বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যা হটী বিদ্যালংকার ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্য ন্যায়ে পারদর্শিতা অর্জন করে কাশীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ১৮১০ সালে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। আনন্দময়ীর প্রতিভা কেবল কাব্যের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল না। রাজা রাজবল্লভ বৈদ্যদের যজ্ঞোপবীত ধারণ উপলক্ষে এক বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন; অথর্ব বেদের ব্যবস্থা অনুসারে আনন্দময়ী তার বেদি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। অব্রাহ্মণ বংশীয়া রূপমঞ্জরী ব্যাকরণ, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি হটু বিদ্যালংকার নামে পরিচিতা ছিলেন।

ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত পড়ার মত মুসলমানেরা আরবী ও ফার্সি পড়তেন। ইসলামী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের উপর তাঁদের খ্যাতি নির্ভর করত। অনেকে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করতেন। নবাবদের কৃপাধন্য অনেক মুসলমান পণ্ডিতের নাম সমসাময়িক মুসলমান লেখকদের বইতে পাওয়া যায়।

হিন্দুদের মধ্যে অনেকে বিদ্যার প্রসারের জন্য, অথবা সরকারী চাকুরির লোভে, ফার্সি পড়তেন। কিন্তু কোন মুসলমান সংস্কৃত পড়েছেন বলে জানা যায় না।

হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষা হত গ্রামের পাঠশালায় ও মক্তবে। যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরবী, ফার্সি ও বাংলা শেখানো হত তার নাম ছিল 'তোলবাখানা'। প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল চিঠিপত্র ও সহজ বই পড়া, চিঠি লেখা এবং দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অংক কষা। শুভংকরের ছড়া কণ্ঠস্থ করে মুখে মুখে অংক করার সুবিধা হত।

*　　*　　*

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার বলেছেন, অষ্টাদশ শতকে কলকাতা ছিল 'ভুঁইফোঁড় বা upstart (শহর), কোন ঐতিহ্য ছিল না এর পিছনে'। এখানে 'সাংস্কৃতিক tradition গড়ে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল।'[২৬] কথাটা ঠিক, কারণ প্রায় আট দশক (১৬৯০—১৭৬৫) কলকাতা ছিল এক বিদেশী জাতির বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে দেশীয় মানুষদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী-

২৬। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য', ২৪ পৃষ্ঠা।

গুণী তাঁরা আসতেন না; আসত তারা, যারা গ্রাম্য সমাজের বন্ধন ছিন্ন করে ভাগ্যান্বেষী হয়ে অজানা পরিবেশে বাস করার জন্য সাহস সঞ্চয় করতে পারত। 'স্বভাব-ধূর্ত ব্রিটিশ বেনিয়া' এবং অর্থলোভী ছিন্নমূল বাঙালী কলকাতায় নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বেনিয়ার রাজদণ্ড গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাব বদলে গেল, শাসন ও শোষণের বাইরে যে সংস্কৃতির জগৎ সেদিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত হল। বেনিয়ার শাসনকে সংযত করবার জন্য স্থাপিত হল সুপ্রীম কোর্ট; সেখানে অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হলেন স্যার উইলিয়ম জোন্স্ (Sir William Jones)। রাজনৈতিক শক্তির নতুন কেন্দ্র কলকাতা এক নতুন সংস্কৃতির কেন্দ্র হল। দিল্লী, লক্ষ্মৌ, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ মোগল যুগের অতীত স্মৃতি সম্বল করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। 'ভুঁইফোঁড়' শহর কলকাতা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল।

মানসিক বিপ্লবের সূচনা হল মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের ফলে। 'মানুষ এতকাল অন্ধের মতো অন্যের কথা শুনে চলে আসছিল, এখন সে পাঁচ জনের কথা বুঝতে শিখল পাঁচ রকমের বই পড়ে।' জ্ঞানের ভাণ্ডার পণ্ডিতের পর্ণ কুটিরে লুকিয়ে রইল না, হাটে বাজারে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ভারতে মুদ্রাযন্ত্র এনেছিল বিদেশীরা। ১৫৫৬ সালে গোয়ায় পর্তুগীজেরা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছিল। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে মালাবারে তামিল ভাষায় খ্রীস্টধর্ম সংক্রান্ত বই ছাপা হয়েছিল। প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটেরা বা প্রাদেশিক সুবাদারেরা এসব সামান্য ব্যাপারের অর্থ নিয়ে চিন্তা করেন নি। ১৭৭২ সালে মাদ্রাজে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ ১৭৭৮ সালে হুগলীতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানে হ্যালহেডের (Halhed) বাংলা ব্যাকরণ ছাপা হয়েছিল। পরে কলকাতায় সরকারী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় এবং কোম্পানীর তিন জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী দ্বারা ইংরেজীতে লেখা আইনের বাংলা অনুবাদ করানো ও ছাপানো হয়। ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewanec Adalat নামক আইনের অনুবাদ। হেষ্টিংসের নির্দেশে জোনাথন ডান্‌কান (Jonathan Duncan) সুপ্রীম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে (Sir Elijah Impey) কর্তৃক সংকলিত সংহিতার (Code) বাংলা অনুবাদ করেন।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিবর্তনে ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের অনুবাদে সাহিত্যরস থাকতে পারে না, কিন্তু সরলতা আছে।

'সদর দেওয়ানি আদালতে যদি কোন আপিলের বিষয়তে এমত জানা যায় যে মফঃস্বল আদালতে সে বিষয়ের সামুদায়িক বিচার হয় নাহি কিম্বা

আরও কোন কারণ জন্য সদর দেওয়ানি আদালতে যদ্যাপি উচিত বুঝেন তবে নূতন সাক্ষী যে আবশ্যক হয় তাহা লইয়া আপিলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন···।'

পরে রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' প্রকাশের ফলে বাংলা গদ্য কেবলমাত্র কাজের ভাষা না হয়ে সাহিত্যের ভাষা রূপে দ্রুত বিকশিত হল।

ভারতের প্রাচীন দর্শন ও সাহিত্য প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন স্যার উইলিয়ম জোন্স্। তিনি কলকাতায় 'এসিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন করেন ১৭৮৪ সালে। ওয়ারেন হেস্টিংস এই গুণীজনসভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গীতার ইংরেজী অনুবাদ তাঁর আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল, আবার মুসলমানদের প্রাচীন ভাষা শিক্ষাদানের জন্য কলকাতা মাদ্রাসাও তিনিই স্থাপন করেছিলেন। বেনিয়া সরকারের কয়েকজন কর্মচারী হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাচীন সংস্কৃতি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে জগৎসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। শাসন ও শোষণের বাইরে ইংরেজের দৃষ্টি বহু দূরে প্রসারিত হয়েছিল। বহুশতাব্দীব্যাপী মুসলমান শাসনকালে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরুদ্ধারের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা হয় নি। জোন্স কয়েক বৎসরের মধ্যে যা' করেছিলেন ছয় শত বৎসরের মধ্যে কোন মুসলমান পণ্ডিত তা' করার কথা চিন্তা করেন নি।

একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক যার নাম দিয়েছেন 'British Orientalism'[২৭] তার ফল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বলেছেন: 'ভারতের অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ইংরেজেরা যা' করেছিল তা' কোন ভারতীয় করতে পারত না। তাদের কাজের ফলে হিন্দুদের কল্পনা উদ্দীপিত হয়েছিল, তারা নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল।' এই সচেতনতার ফল ঊনবিংশ শতকে বাঙালী হিন্দুর নবজাগরণ (Renaissance)—ধর্মচিন্তায়, সমাজ-সংস্কারে, সাহিত্যে, রাজনৈতিক কর্মে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ। বাঙালী মুসলমান মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার আবেষ্টনী অতিক্রম করতে পারল না।

* * *

আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, ১৭৫৭ সালে বাংলায় মুসলমান-শাসনের অবসান হল, বাঙালী মধ্য যুগের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রিটিশ সভ্যতার প্রভাবে সমগ্র ভারতকে নতুন পথের সন্ধান দিল, নতুন আলোকে আলোকিত করল। এই নয়া বাংলা থেকে ভাষা ও সাহিত্যের নতুন রূপ, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ধর্মীয় আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাচীন গ্রীসে পেরিক্লিসের যুগের এথেন্স ছিল গ্রীক জগতের শিক্ষাকেন্দ্র। ইংরেজের শাসনকালে বাংলা ভারতে সেই স্থান

২৭। দ্রষ্টব্য: David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*.

অধিকার করেছিল।[২৮]

ব্রিটিশ-শাসনের এই প্রশস্তি আজকালকার ইতিহাস লেখকদের কাছে অগ্রাহ্য। তাঁদের কাছে ব্রিটিশ-শাসনের মূল কথা লুণ্ঠন, শোষণ ও নিপীড়ন। বাংলাকে নতুন ভারতের ধাত্রী রূপে গণ্য করতে অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরা এখন প্রস্তুত নন। জ্ঞানবৃদ্ধ ঐতিহাসিক ব্রিটিশ সভ্যতার ঔজ্জ্বল্যে অভিভূত হয়ে অনৈতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন কিনা, তার প্রকৃত বিচার হবে আরও অনেক পরে—যখন মানুষ সাময়িক সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে অতীতকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারবে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালী প্রতিভার যে বিকাশ ঘটেছিল তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু ছয় শত বৎসরের মুসলমান-শাসনকালে ঘটে নি।

রামমোহন রায় পরিণত বয়সে মুসলমান শাসনের সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের তুলনা করেছিলেন। নবাবী আমল সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু সেই আমলের পরিবেশে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল এবং তাঁর বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিশ্চয়ই তিনি সেকালের কথা শুনে-ছিলেন। ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি নিজে কিছুকাল ইংরেজের শাসনযন্ত্রের অংশ ছিলেন।

তিনি বলেছেন, মোগল আমলে দেওয়ানী এবং সামরিক বিভাগে হিন্দুদের রাজনৈতিক অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল[২৯]; কিন্তু মোগল সরকার ছিল স্বেচ্ছাচারী সরকার, এজন্য হিন্দুদের ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার এবং জীবন ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত অধিকার অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হত। ইংরেজ-শাসনে জীবন ও সম্পত্তি অনেক পরিমাণে নিরাপদ হয়েছে, বিচারালয়সমূহে আগের চেয়ে বেশি সুবিচার পাওয়া যায়, এবং ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ভোগ সম্ভব হয়েছে। 'আইনের শাসনে'র (Rule of Law) উপর রামমোহন বিশেষ জোর দিয়ে-ছিলেন। তাঁর মতে ইংরেজ সরকারকে যথেচ্ছাচারী সরকার বলা যায় না, কারণ এই সরকার সকল কাজ করেন আইন অনুসারে। মোগল আমলে

২৮। "...under the impact of the British civilization it (Bengal) became a path-finder and a light-bringer to the rest of India. If Periclean Athens was the school of Hellas, 'the eye of Greece, mother of arts and eloquence, that was Bengal to the rest of India, but with a borrowed light...New lierary types, reform of the language, social reconstruction, political aspirations, religious movements...originated in Bengal, passed like ripples in a central eddy across provincial barriers to the furthest corners of India". (*History of Bengal*, Vol. II. ৪৯৪ পৃষ্ঠা)।

২৯। নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', ৫৪৫-৪৭ পৃষ্ঠা। এই মন্তব্য আংশিক সত্য মাত্র।

যুদ্ধে লোকক্ষয় হত ; ইংরেজ আমলে শান্তি সুরক্ষিত হচ্ছে, ফলে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক অর্থ ইংলণ্ডে ব্যয় হয় ; মোগল আমলে এভাবে অর্থহানি হত না, দেশের অর্থ দেশেই থাকত।

রাজনৈতিক দিক থেকে ইংরেজ শাসনের সুফল (রামমোহনের মতে) সমগ্র ভারত 'এক রাজ্যশাসনের অধীনে' আনয়ন। 'ইহা দ্বারা ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তা বৃদ্ধি পাইবে।' হিন্দু রাজত্বকালে বা মুসলমান রাজত্বকালে 'ইহা প্রায় ছিলই না।'

পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ফলে ভারতবাসী ইউরোপের জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও শিল্প, রাজনৈতিক উন্নতি, সামাজিক ও নৈতিক জ্ঞান, বাণিজ্য ও বিভিন্ন কলকারখানা নির্মাণের কৌশল প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছে। 'এমন কি, স্বদেশানুরাগ এবং স্বদেশহিতৈষণা (ভারতবাসী) ইউরোপীয়দের নিকট শিক্ষা করিতেছে' এবং এই শিক্ষার ফলে 'ভারতে বহু শতাব্দী পরে স্বদেশানুরাগ পুনরুদ্দীপিত হইতেছে।' রামমোহনের মতে, মুসলমান-শাসনকালে 'স্বদেশানুরাগ' ছিল না।

রামমোহন ইংরেজ-শাসনের সমর্থক ছিলেন, অতএব তাঁকে অন্ততঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে হবে—এরকম মত সম্প্রতি প্রচারিত হচ্ছে। এই মতের যাথার্থ্য স্বীকার করলে ঊনিশ শতকের প্রত্যেকটি জাতীয়তাবাদী নেতাকে আসামীর কাঠগড়ায় টেনে নিতে হয়। সেকালের কংগ্রেস নেতারা কখনও ইংরেজ রাজত্বের অবসান দাবি করেন নি। মহাত্মা গান্ধী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেজন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন, ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেন নি, ১৯২৯ সালে 'পূর্ণ স্বরাজ' সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করলেও ১৯৪২ সালের আগে কখনও স্পষ্টভাবে ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বলেন নি। ঐতিহাসিক ঘটনা এবং নেতৃবৃন্দের নীতি ও চরিত্র বিচার করতে গেলে তাঁদের যুগের সামগ্রিক ছবি মনে রাখতে হবে।

রামমোহনের মত বিজ্ঞ, চিন্তাশীল, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল ব্যক্তি ইংরেজ-শাসনের অভিজ্ঞতা লাভের পর মুসলমান-শাসন সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা মধ্য যুগের ইতিহাস আলোচনার উপসংহার রূপে গ্রহণ করা যায়।

পরিশিষ্ট

বাংলার ব্রাহ্মণ

প্রাচীন প্রবাদে বাংলা 'পাণ্ডববর্জিত দেশ' অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রের বাইরে অবস্থিত প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে কুখ্যাতি লাভ করেছিল। মনুসংহিতায় (দশম অধ্যায়, ৪৩-৪৪ শ্লোক) বলা হয়েছে, পৌণ্ড্রকেরা ধর্মশাস্ত্রবিহিত আচার পরিত্যাগ করে শূদ্রের পর্যায়ে অবনত হয়েছে।

গুপ্ত যুগের কয়েকটি শিলালিপি পর্যালোচনা করলে মনে হয়, সেকালে উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ সমাজের যে প্রভাব ছিল তা' উত্তর বাংলায় ছিল না। গুপ্ত রাজগণ ভূমি দান করে বাংলায় ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন, এমন প্রমাণ তাঁদের শিলালিপিতে নেই।

গুপ্ত যুগের পরবর্তী কালে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, ঐ দুই অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপিতে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভরদ্বাজ, কৌণ্ডিন্য, কাশ্যপ, লৌহিত্য এবং অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে আদিশূর যে সব ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ থেকে এনেছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন পাঁচ জন; তাঁদের গোত্র ছিল শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ। রিজলী (Risley) বাংলার ব্রাহ্মণদের বারোটি গোত্রের তালিকা দিয়েছেন: ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, সাবর্ণ, গৌতম, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, জাতুকর্ণ, কাণ্বায়ন, সৌনক। কৌণ্ডিন্য, লৌহিত্য এবং অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণদের কি হল তা' জানা যায় না। তবে উড়িষ্যায় এখনও লৌহিত্য এবং অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণ আছেন এবং উত্তর প্রদেশে আছেন অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণ। এই সব গোত্র-তালিকার তুলনা করলে মনে হয় যে ভরদ্বাজ এবং কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাই বাংলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীনতম।

পাল যুগের পূর্বে বাংলার ব্রাহ্মণ-সমাজে ধর্মীয় আচার পালনে শৈথিল্য ছিল। ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণের বৃত্তি (যেমন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি) গ্রহণ করতেন এবং অব্রাহ্মণ পত্নী গ্রহণ করতেন। মিশ্র বিবাহের ফলে উদ্ভূত সন্তানদের 'পারশব', 'করণ' প্রভৃতি মিশ্রজাতিবাচক নাম দেওয়া হত।

বৌদ্ধ পালরাজগণের আমলে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ সমাজে আচারের শৈথিল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরে সেন বংশীয় রাজাদের আমলে ধর্মশাস্ত্রবিহিত সমাজ-ব্যবস্থা সংগঠিত করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার ফলে হিন্দু সমাজ নতুন রূপ গ্রহণ করার পূর্বেই তুর্কী আক্রমণে এবং ক্রমে বাংলার বিভিন্ন

অঞ্চলে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনে বিপর্যয় ঘটল। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালে বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হল।

বিপর্যয়ের যুগে হিন্দু সমাজ প্রাক্-মুসলমান যুগের রাজনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক বিন্যাস সম্বন্ধে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ জ্ঞান রক্ষা করতে পারে নি। নতুন শাসকদের দৌরাত্ম্যে বহু প্রাচীন পুঁথি বিনষ্ট হয়েছিল। নতুন অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত থাকায় প্রাচীন ঘটনা সম্বন্ধে স্মৃতিতে ছেদ পড়েছিল। 'রাজাবলী' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে বাংলার রাজগণের পরিচয় প্রসঙ্গে শশাংক, ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতির নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বল্লাল সেনকে দিল্লীর রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১] পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কুলশাস্ত্রগুলিতে প্রাক্-মুসলমান যুগের ইতিহাস ও সমাজ-বিন্যাস সম্বন্ধে অনুরূপ অমূলক কিংবদন্তী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[২]

কুলশাস্ত্রগুলি রচনা করা হয়েছিল কেন? আচার্য রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেনঃ 'মুসলমান যুগে বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মুখে উচ্চতর কোন জাতীয় জীবনের আদর্শ বা উদ্দেশ্য না থাকায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও তৎ-সম্পর্কিত বিচার-বিতর্কই জাতীয় জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।' এই অনুমান অযথার্থ নয়। রাজা গণেশের প্রয়াস হিন্দু সমাজের কোন বৃহৎ অংশের সমর্থন লাভ করেছিল, এমন প্রমাণ নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাঙালী সমাজে ভাবের বন্যা প্রবাহিত করেছিলেন, কিন্তু তার ফলে সামগ্রিক ভাবে সমাজে ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় হিন্দুর অবস্থার উন্নতি হয় নি।

কুলশাস্ত্রগুলিকে কোনক্রমেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু প্রাক্-মুসলমান যুগে সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, আদিশূরের পূর্বেও বাংলায় ব্রাহ্মণের বাস ছিল, একথা কুলশাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে, এবং তাঁদের 'সপ্তশতী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁরা বৈদিক আচার পালন করতেন না এবং শূদ্রের যজন-যাজন করতেন। 'সাতশতী দ্বিজগণে পটু শূদ্রের যাজনে। নাহি জানে বেদ অনুষ্ঠান'। এই বিবৃতি হিন্দু আমলের শিলালিপির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরে কনোজ থেকে আগত সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সাতশতী ব্রাহ্মণদের বিবাহ-সম্পর্ক ঘটেঃ কুলশাস্ত্রের এই বক্তব্য সহজেই গ্রহণ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় ব্রাহ্মণ সমাজে বৈদিক আচার অবহেলিত ছিল, এই মূল কথাটি শিলালিপিতে এবং কুলশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই কথাটিই আদিশূর সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রে বিবৃত কিংবদন্তীর ভিত্তি। আদিশূর নামে রাজা ছিলেন কিনা, থাকলেও তাঁর রাজত্বকাল কখন, তিনি কনোজ থেকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ

১। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' (১৩৪৬)।
২। রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র' দ্রষ্টব্য।

এনেছিলেন কিনা—এসব প্রশ্নের সুমীমাংসা হয় নি। কিন্তু অধিকাংশ কুলশাস্ত্রের মতে তিনি কোন বিশেষ বৈদিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্যই কনোজ থেকে ব্রাহ্মণ এনেছিলেন, কারণ বাংলায় এই কাজের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন না ('বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণীম্')।

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন সময়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলায় ব্রাহ্মণ আনা হয়েছিল, বিভিন্ন কুলশাস্ত্রের এই বক্তব্য উপেক্ষা করা যায় না। বাঙালী বৈদিক ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্য এই যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা উৎকল, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলায় এসেছিলেন। 'আর্যাবর্তে মুসলমানদিগের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইলে সেখানে বেদাদি শাস্ত্র চর্চার ক্রমশঃ হ্রাস হইল, কিন্তু দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চা থাকায় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে সাদরে স্বদেশে বাস করাইলেন'। হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বৈদিকেরা বলেন, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন কনোজ থেকে—গৌড়াধিপতি শ্যামল বর্মার আমন্ত্রণে। কারণ, রাজার যজ্ঞ করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গৌড় ছিল নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের দেশ। আদিশূরের মত শ্যামল বর্মাও ইতিহাসে অজ্ঞাত। 'গ্রহবিপ্র' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পূর্বপুরুষেরা শাকদ্বীপ থেকে এসেছিলেন, কোন কোন কুলশাস্ত্রে একথা বলা হয়েছে। বোধহয় গ্রহচালনা এবং গ্রহদান গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁদের খ্যাতি ছিল বলেই তাঁদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সম্ভবতঃ ভৌগোলিক কারণেই ব্রাহ্মণ সমাজে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, এই দুটি শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছিল। আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ রাঢ় অঞ্চলে এবং কেহ কেহ বরেন্দ্র অঞ্চলে বাস করতে থাকেন। কালক্রমে দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ বাসস্থানের দূরত্বজনিত যাতায়াতের অসুবিধা এবং সামাজিক আচারের আঞ্চলিক পার্থক্যই ইহার কারণ।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথার প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে, আজও একথা বলা যায় না। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের তুলনায় তার দাপট কম ছিল।

কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক কে? কোন সময়ে কি কারণে এই প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল? বাংলার হিন্দুদের ইতিহাসে এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কিন্তু এর কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। অধিকাংশ কুলশাস্ত্রের মতে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক বল্লাল সেন। বাঙালী সমাজে এই মতই গৃহীত হয়েছে; কিন্তু কোন কোন কুলশাস্ত্রের মতে এই গৌরব বা অগৌরবের অধিকারী রাজা ক্ষিতিশূর (আদিশূরের বংশধর)। বল্লাল সেন বা ক্ষিতিশূর কি কারণে একটি অতি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কুলশাস্ত্রগুলিতে নেই। পরে একটা প্রবাদ প্রচলিত হয়েছিল যে নয়টি

বিশিষ্ট গুণের (আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি—অথবা আবৃত্তি, তপস্যা, দান) অধিকারী ব্রাহ্মণদিগকে প্রথমে কুলীন রূপে স্বকৃতি দেওয়া হত। ষোড়শ শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র এই রীতির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। আচার্য রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন: 'বর্তমান কালে গভর্ণমেণ্ট যেমন মহামহোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি দান করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে সম্মানিত করেন, বল্লালও কৌলীন্য প্রথা দ্বারা তদতিরিক্ত কিছুই করেন নাই।' তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে বিশিষ্ট গুণীজনকে সম্মান প্রদর্শন করা অস্বাভাবিক ছিল না।

কুলশাস্ত্রের মতে, লক্ষ্মণ সেন কয়েকটি নিয়ম প্রবর্তন করে কুলীনদিগকে একটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তিনি নির্দেশ দিলেন: (১) কুলীন কন্যার যে পরিবারে বিয়ে হবে সেই পরিবার থেকেই তার পিতৃবংশকে কন্যা গ্রহণ করতে হবে (বংশ পরিবর্ত)। (২) কুলীনগণের মধ্যে কে কিরূপ উচ্চনীচ কুলের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছে তা' নির্ণয় করে তাঁদের পদমর্যাদার সমতা নির্ণয় করা হবে (সমীকরণ)। এই মত যদি মেনে নেওয়া হয় তবে বলতে হবে যে লক্ষ্মণ সেনের সময়েই কৌলীন্য ব্যক্তিগত মর্যাদার গণ্ডি ছাড়িয়ে বংশানুক্রমিক হয়ে পড়েছিল। এই পরিবর্তনের কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ পাওয়া যায় না।

সম্ভবতঃ মুসলমান শাসনকালে কৌলীন্য প্রথার এই নতুন রূপ সুদৃঢ় হয়েছিল। মুসলমান সমাজে পীরের বংশধর 'পীরজাদা' বলে গণ্য হতেন। পাকিস্তানে এক মন্ত্রী ছিলেন পীরজাদা। শেখদের পুত্রেরা 'শেখজাদা' বা 'মখদুমজাদা' বলে গণ্য হতেন। পীরজাদা ও শেখজাদা নিজে পিতার গুণের অধিকারী না হলেও বংশানুক্রমিক মর্যাদা ভোগ করতেন। এই ব্যাপারে শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণদের রাজদরবারে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের যে সুযোগ ছিল মুসলমান আমলে তা' ছিল না। সুতরাং যাঁরা কুলীন বলে হিন্দু সমাজে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাঁরা সেই মর্যাদার গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্য স্বভাবতঃই উৎসুক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ রেষারেষি আরম্ভ হল; এক বংশ আর এক বংশকে ছোট করবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিলেন কুলাচার্য (ঘটক) গোষ্ঠী। তাঁরা কার্যতঃ ব্রাহ্মণ সমাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আত্মসাৎ করলেন।

আচার্য রমেশ চন্দ্র বলেছেন: যখন কৌলীন্য বংশানুক্রমিক হল 'তখন তাৎকালিক কুলাচার্যগণ ইহার উৎপত্তি ও ইতিহাস বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং কতক ঐতিহাসিক উপকরণের অভাবে এবং কতক ব্যক্তিগত স্বার্থের প্ররোচনায় নানারূপ কাল্পনিক ঘটনা ও ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।' কৌলীন্য বংশানুক্রমিক হল কেন, এবং কুলাচার্যদের উদ্ভব হল কেন—এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন নি।

ক্রমে বংশানুক্রমিক কৌলীন্য নানা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ল। যে নয়টি গুণ কৌলীন্যের সূচক ছিল তার বিন্দুমাত্র গুরুত্ব থাকল না।

'আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়।
কুল গুণ মহা গুণ পুরুষক্রমে পায়॥

* * *

অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম।
লোহারে করয়ে সোনা পরশের ধর্ম॥'[৩]

বিভিন্ন দোষে দুষ্ট কুলীন সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে দেবীবর ঘটক 'মেল' প্রথা প্রবর্তন করেন। যে সকল কুলীন পরিবার বহু দোষে দুষ্ট ছিলেন তাঁরা 'নিষ্কুল' (কুলীন সমাজ থেকে বহিষ্কৃত) হলেন। অন্যান্য কুলীন পরিবারকে দোষের গুরুত্ব অনুসারে ৩৬টি ভাগে (মেলে) ভাগ করা হল। প্রত্যেক কুলীনের পুত্রকন্যার বিবাহ তাঁর নিজ মেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল। ফলে বহু ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর অভাব দেখা দিল। অকুলীন পাত্রকে কন্যাদান করা নিষিদ্ধ ছিল; তাতে কৌলীন্য নষ্ট হত। ('কুলীনের কন্যাগত কুল')। 'ইহারই ফলে কুলীন সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ, কন্যার অনূঢ়তা অথবা বৃদ্ধ বয়সে সর্বথা অনুপযুক্ত বরে কন্যা সম্প্রদান প্রভৃতি বহু গর্হিত আচার প্রবেশ করিয়াছিল।'

'দেবীবর যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিয়াছিলেন, বাঙ্গালার কুলীন সম্প্রদায়ের প্রতি ঘরে তাহা অংকুরিত হইয়া বাঙ্গালার আকাশ ও বাতাস কলুষিত করে।' মধ্য যুগের সামাজিক ইতিহাসে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। 'কুলতত্ত্বার্ণব'[৪] নামক গ্রন্থ অনুসারে, এক হিন্দুধর্ম-প্রিয় যবন রাজার নির্দেশে এবং কামরূপের কামাখ্যা দেবীর বরে তিনি ১৪০২ শাকে মেলবন্ধন আরম্ভ করেন। এই যবন রাজা নাকি ব্রাহ্মণদের প্রার্থনায় তাঁকে এই কাজের ভার দিয়েছিলেন। ১৪০২ শাকে গৌড়ে কোন হিন্দুধর্ম-প্রিয় যবন রাজা ছিলেন, একথা ইতিহাস-সম্মত নয়। ব্রাহ্মণেরা সমাজ-সংস্কারের জন্য যবন রাজার দ্বারস্থ হয়েছিলেন, এটাও বিশ্বাস করা কঠিন। যবন রাজা এই কাজের জন্য দেবীবরকে নির্বাচন করলেন কেন, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। অন্য কুলশাস্ত্রে দেখা যায়, এক আত্মীয় তাঁকে সামাজিক দিক থেকে অপমান করায় তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দেবী আদ্যাশক্তির আরাধনা করেন এবং তাঁর বরে বাক্‌সিদ্ধ হয়ে উক্ত আত্মীয়কে

৩। নগেন্দ্র নাথ বসু, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', প্রথম ভাগ, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, প্রথম অংশ, ২৭৫-২৭৫ পৃষ্ঠা।

৪। শ্লোক ৫৮২-৫৯। সর্বানন্দ মিশ্র রচিত এই গ্রন্থটি ১৯২৭ সালে মেদিনীপুর ব্রাহ্মণ সভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। আচার্য রমেশ চন্দ্রের মতে, 'এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।'

'নিস্কুল' করেন। এই শক্তি তিনি কুলীন সমাজ পুনর্গঠনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। এই দুটি কিংবদন্তীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র থাকতে পারে : তান্ত্রিক ধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অনুগ্রহই দেবীবরের শক্তির উৎস। আচার্য রমেশ চন্দ্র বলেছেন : "ইহা অসম্ভব নহে যে তৎকালে প্রচলিত তান্ত্রিক ধর্মের সহিত এই কৌলীন্যের ইতিহাস বিজড়িত। বৌদ্ধ তন্ত্রমতের প্রভাবে বঙ্গদেশে 'কৌল' নামে এক নূতন শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কৌল বা কুলীন নামে অভিহিত হইতেন এবং তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল কুলাগম অথবা কুলশাস্ত্র। বল্লাল সেন যোগিনী ঘট্রে এক বর্ষকাল আরাধনা করিয়া কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা করেন, দেবীবর ঘটক কামরূপে কামাখ্যা দেবীর আরাধনা করিয়া কৌলীন্য মর্যাদা দানের অধিকার লাভ করেন, ইত্যাদি প্রবাদ তন্ত্রবিধির সহিত কৌলীন্যের সম্বন্ধ সমর্থন করে।'

'কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা' করার জন্য বল্লাল সেনকে 'এক বর্ষকাল' দেবীর আরাধনা করতে হয়েছিল, এই 'প্রবাদ' সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। দেবীবর হয়তো শক্তিসাধক ছিলেন ; হয়তো কৌলীন্য প্রথার সংস্কারের ক্ষেত্রে নিজের আধিপত্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য তিনি কামাখ্যা দেবীর বরলাভের গল্প প্রচার করেছিলেন। আবার এটাও সম্ভব যে তান্ত্রিকেরা নিজেদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে তাঁদের আরাধ্যা দেবীর নাম যুক্ত করেছিলেন কোন কোন কুলশাস্ত্র-রচয়িতার মাধ্যমে। কৌল প্রথা কৌলীন্য প্রথার মত বংশানুক্রমিক ছিল না।

'কুলীন' শব্দটি সম্ভবতঃ পাল যুগেও প্রচলিত ছিল। চক্রপাণি দত্ত স্বরচিত 'চিকিৎসা-সংগ্রহ' গ্রন্থে নিজেকে লোধ্রবলী বংশীয় কুলীন রূপে বর্ণনা করেছেন। ঐ গ্রন্থের টীকাকার শিবদাস সেন ষোড়শ শতাব্দীতে লিখেছেন যে চক্রপাণির পিতা গৌড়রাজ নয়পালের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। আচার্য মজুমদার লিখেছেন : 'শিবদাস সেনের উক্তি হইতে অন্ততঃ এটুকু প্রমাণিত হয় যে, বল্লাল সেনই যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক এ কথা ষোড়শ শতাব্দীতে সর্বসাধারণ স্বীকার করিতেন না এবং তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, সেন রাজগণের পূর্ববর্তী পাল রাজগণের সমাজেও কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত ছিল।' এই অনুমানের যাথার্থ্য মেনে নেওয়া কঠিন। চক্রপাণি কি অর্থে 'কুলীন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা' আমরা জানি না। ষোড়শ শতাব্দীর টীকাকার কিভাবে স্থির করলেন যে চক্রপাণির পিতার প্রভু যে গৌড়রাজ তার নাম নয়পাল, তা'ও আমরা জানি না। একজন টীকাকারের একটি সাধারণ উক্তি থেকে এটা মনে করা যায় না যে পালরাজাদের সময়ে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত ছিল—এটাই ছিল 'তখন লোকের বিশ্বাস।'

তুর্কী আক্রমণের পূর্বেই কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তুর্কী শাসনকালেই এই প্রথা শাখা-প্রশাখা বিস্তার

করে জটিল ও নিষ্ঠুর রূপ গ্রহণ করেছিল। এই বিষবৃক্ষ হিন্দুরাই রোপণ করেছিল এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত হিন্দুরাই একে সযত্নে লালনপালন করেছিল। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নারীরা কয়েক শতাব্দী এর বিষাক্ত হাওয়ায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আজ পর্যন্ত কোন বাঙালী ঐতিহাসিক এই ঘোর সামাজিক কলঙ্কের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণাভিত্তিক আলোচনা করেন নি।